সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীফণিভুষণ চক্রবর্তী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ

প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

বর্তমান বর্ষের পত্রিকা-প্রকাশে
পরিষদ-কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ১

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

বাংলা গদ্যরীতির জন্মকথা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য বেশ প্রাচীন হলেও তা মূলত কাব্যসাহিত্য দিয়ে প্রথমে পরিপুষ্ট ছিল। ঠিক বলতে কি, বাংলায় কাব্যসাহিত্য যেমন দ্রুত বিকাশ লাভ করে পরিণত হয়ে উৎকর্ষ-মণ্ডিত হয়েছিল তেমন অন্য সাহিত্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। বাংলার কাব্যসাহিত্য মধ্যযুগের গোড়ার দিকেই বেশ উচ্চমান স্থাপন করেছিল। আমরা জানি চৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সময় পদাবলী-লেখক চণ্ডীদাস বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনা ভাবের ও ভাষার মনোহর সমন্বয়ে এমন উৎকর্ষ লাভ করেছিল যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত তা প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা রাখে।

অবশ্য চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কে, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। অন্তত দুটি চণ্ডীদাসের আমরা পরিচয় পাই। একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, অপর জন হলেন পদাবলীর লেখক চণ্ডীদাস। উভয় গ্রন্থেরই রচনার মান বেশ উচ্চস্তরের। কোনো গবেষকের মতে তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তি, কোনো গবেষকের মতে তাঁরা একই ব্যক্তি। সে যাই হ'ক, এ কথা অনস্বীকার্য যে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই বাংলা কাব্যসাহিত্য বিকাশ লাভ করে বেশ উচ্চমানে উন্নীত হয়েছিল।

তুলনায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। ঠিক বলতে কি, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য বলতে কিছু ছিল না, গদ্যরচনা সীমাবদ্ধ ছিল বৈষয়িক কর্মপ্রসঙ্গে কেবল দলিলপত্রের মধ্যে। তার জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন যে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করে তার আনুকূল্যে।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতে এসে ঘটনাচক্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট অংশের অধীশ্বর হয়ে বসল। এই বিদেশী শক্তির প্রশাসনিক কর্তব্য নিয়মানুবর্তী করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করালেন। ফলে শাসনকার্য পরিচালনের জন্য সপরিষদ এক গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন এবং বিচার-বিষয়ক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এক সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হল। ইংরেজের এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ফলে ইংরেজ মিশনারি এদেশে এসে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এখন উচ্চস্তরের প্রশাসকরা সবাই বিদেশী। অথচ প্রশাসনকার্য ভালভাবে চালাতে শাসিত দেশের মানুষের ভাষার উপর অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য প্রশাসনিক শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় যে ফোর্ট উইলিয়ম নামে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল সেখানে শিক্ষানবিসদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষণের ব্যবস্থা হল।

বিদেশী প্রশাসকের যে অসুবিধা বিদেশী ধর্মযাজকেরও সেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরি যে ব্যাপটিস্ট মিশনের শাখা স্থাপিত করেছিলেন তার কর্মীদেরও বাংলা ভাষা আয়ত্ত করবার প্রয়োজন হল। কিন্তু ভাষা ভাল করে শিখতে হলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের একান্ত প্রয়োজন। অথচ গদ্যসাহিত্য বলে তখন কিছু ছিল না। তার সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে, তা হল গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করা। ইংরেজ সরকার এবং ইংরেজ মিশনারি বলতে গেলে একই সময়ে এইভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরির নির্দেশে তাঁর কর্মচারী রামরাম বসু বাংলা গদ্যে একটি গ্রন্থ রচনার ভার নিলেন। সেই চেষ্টার ফলে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামে তার ইতিহাসে প্রথম গদ্যে রচিত গ্রন্থখানি পেল। ওদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ওপর ভার পড়ল বিদেশী প্রশাসকদের পাঠ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য গদ্যপুস্তক রচনা করবার। তাঁর রচিত প্রথম গদ্যে রচিত গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশ হল ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। তিনি তারপর 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলী' নামে আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সংঘটিত হয় বাংলার নবযুগের নানা ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালী তার প্রচলিত বিগ্রহপূজা-পদ্ধতির ওপর আস্থা হারাল। ইংরেজ মিশনারি বলল তা পৌত্তলিকতার সমস্থানীয়। তারা যে সংস্কৃতির বাহক তা সম্প্রতি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে রেলগাড়ি চালিয়েছে, বাষ্পচালিত জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। কাজেই তাদের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে তাদের মনে হয়েছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। ডেরোজিওর নেতৃত্বে তারা হিন্দুধর্মবিরোধী আন্দোলন শুরু করল। রামমোহনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পৌরাণিক পূজারীতি ভালো লাগেনি। তবে একই কারণে খ্রীস্টধর্মকেও তিনি সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। খ্রীস্টের সঙ্গে ঈশ্বরের পিতৃত্বের সম্বন্ধও তাঁর মতে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে নিরাকার উপাসনারীতির প্রবর্তন করতে উৎসাহী হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রে নিরাকার উপাসনারীতির সমর্থন খুঁজছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়। ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সাকার ব্রহ্মের কোনও উল্লেখ না পেয়ে তিনি এই তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিপাদ্য স্থাপন করেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মে বিগ্রহপূজার রীতি প্রচলিত ছিল না। এই

তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন; নাম দেন বেদান্ত গ্রন্থ। সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, ব্রহ্মসূত্রের পাঁচশটি সূত্রের মধ্যে কোথাও কোনো ঈশ্বরের অবতারের বা বিগ্রহের বা বিশেষ দেবতার উল্লেখ নাই; তা হতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, বেদান্তে বিগ্রহপূজার সমর্থন ছিল না।

এই গ্রন্থখানি দুইভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিক হতে তাতে ব্রাহ্মধর্মের বীজকে আমরা আবিষ্কার করি। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের সহিত এইভাবে সংযুক্ত হয়ে তা ব্রাহ্মধর্মের জাতীয় রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখে। দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম দর্শনের মত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় গদ্যসাহিত্য প্রথম সফলভাবে তাতে ব্যবহার হয়েছিল। দ্বিতীয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে নিশ্চিত তা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটি ঘটে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে।

কিন্তু বাংলা গদ্যরীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটতে আরও সময় লেগেছিল। তখনও তা মনন-ভিত্তিক সাহিত্য বা রসসাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হিসাবে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করেনি। সেই পূর্ণতা দান করবার উপযুক্ত গুণী মানুষের অপেক্ষায় বাঙালীর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মত প্রাচীন রীতিতে শিক্ষিত মানুষের সে যোগ্যতা ছিল না। অপর পক্ষে হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নূতন তরুণদেরও তা ক্ষমতার অতীত ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চোখ-ঝলসানো রূপ তাদের জাতীয় সাহিত্য-সম্পদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তারা বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল।

যিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেবেন তাঁর একাধারে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের উপর গভীর ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন তেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অনন্যসাধারণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতে হবে যাতে তার সাহিত্যিক গুণগুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর এমন অধিকার থাকবে যাতে তার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই জাতীয় ভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ দুর্লভ বস্তু এবং সেই কারণেই এমন অনন্যসাধারণ সাহিত্য-সেবীর জন্য বাঙালীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল।

যাঁর ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর সুগভীর এবং ব্যাপক ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত-মণ্ডলী 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার সহিত যে সংস্কৃতের নাড়ির যোগ আছে নজর করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারের প্রাচুর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা গদ্যরীতিকে শক্তিমতী করবার সহজ উপায় হল সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দভাণ্ডার হতে অকুণ্ঠভাবে শব্দ চয়ন করে বাংলায় ব্যবহার করা। কেবল একটি বিষয় সাবধান হতে হবে যে, তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বাংলা ভাষার

নিজস্ব রূপটি না বিলোপ হয়। বিদ্যাসাগর এই পথেই বাংলা গদ্যরীতির পরিণত রূপট সৃষ্টি করেছিলেন।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যটি প্রমাণ করা সহজ হবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাচীন নমুনাগুলির সঙ্গে যদি বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত রীতির তুলনা করি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা রামরাম বসু রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হতে একটি অংশ উদ্ধৃত করতে পারি :

"যে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বংগ ও বিহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওকাত হইলে ব্যাজ হইল এ কারণে হোমাঙু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাদের মত আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ঝকরা লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুতাজাতের তহসিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল।"

ভাষার জড়তা এখানে প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে মার্জনীয় হলেও লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত নজর করা যেতে পারে এখানে বর্তমানে অপ্রচলিত অনেক শব্দের ব্যবহার আছে। তার কারণ সে যুগে আরবি এবং ফারসি আদালতের ভাষা হওয়ায় এই দুই ভাষা হতে অনেক শব্দের বাংলা ভাষায় তখন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

এখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রচিত 'হিতোপদেশ' হতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"প্রাজ্ঞলোক অজর এবং অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক। আর সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতু বিদ্যার সর্বকালে চৌরাদি দ্বারা অপূরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।"

রামরাম বসুর রচনার সহিত তুলনা করলে দেখা যাবে এখানে আরবি ও ফারসি শব্দ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে এবং তার স্থানে অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের আমদানি করা হয়েছে। ফলে সংস্কৃত শব্দের চাপে বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এবার আমরা রামমোহন রচিত 'বেদান্ত গ্রন্থ' হতে একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করতে পারি :

"কিঞ্চিত মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণ বিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাচ সূত্রের কোন স্থানে সে দেবতার সূত্রে মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত। কিন্তু এই সকল সূত্র ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।"

গুরুত্ব বিষয় নিয়ে মননশীল রচনায় প্রথম নিদর্শন হিসাবে এই রীতির অনেক গুণ নিঃসন্দেহ আছে ; তবু বলতে হয় এই গদ্যরীতি এমন পরিণতি লাভ করেনি যাকে অবলম্বন করে মনের ভাব সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ নিতে পারে। ভাষা এখনও জড়তা-মুক্ত হয়নি।

এই উদ্ধৃতিগুলি সম্বন্ধে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অর্থকে সুস্পষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন যতিচিহ্ন দ্বারা যে শব্দসমষ্টিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবার ব্যবস্থা আছে তা উপরের কোনো রচনাতেই লক্ষিত হয় না। তার কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র ছেদচিহ্নটির ব্যবহার ছিল। কাব্য রচনায় পয়ার ছন্দে শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটি সূচিত করতে দুটি ছেদও ব্যবহার হত। কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতি-

চিহ্ন ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রহণ করে বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে লেখ্যভাষা বোঝার যে সুবিধা আছে তা স্বীকৃত। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যরচনায় প্রথম প্রবর্তিত করেন। তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে এই বিভিন্ন যতিচিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই তার পূর্ববর্তী রচনায় এগুলি পাওয়া যায় না।

এইবার বিদ্যাসাগর রচিত 'সীতার বনবাস' গ্রন্থ হতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"রজনী অবসন্ন হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

এই রীতিতে সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার হলেও তার বাংলারূপ খর্ব হয়নি। এখানে ভাষায় আদৌ জড়তা নেই, তা স্বচ্ছ এবং ভাবের শক্তিমান বাহন হিসাবে কাজ করতে সক্ষম। এই ভাবেই বাংলা গদ্যসাহিত্য বিদ্যাসাগরের হাতে বিকাশের পথে পরিণত রূপটি পায়।

এরপর লিখিত বাংলা গদ্যরীতির রূপের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। শিক্ষিত মহলে কথিত ভাষায় ক্রিয়াপদে বিভিন্ন বিভক্তিতে দীর্ঘ রূপগুলি সংকুচিত হয়ে গেছে। তার ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরী, লিখিত ভাষায় দীর্ঘ রূপগুলি বর্জন করে কথ্য ভাষার সহিত তার সামঞ্জস্য এনেছেন। লেখক হিসাবে তাঁর নিজস্ব নাম 'বীরবল' ছিল বলে এই রীতিকে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত রীতি হতে পৃথক করবার জন্য 'বীরবলী রীতি' বলা হয়। এই বাহ্যিক গৌণ রূপের পরিবর্তন হলেও বিদ্যাসাগর প্রদত্ত মূল রূপটি অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। এমন কি বর্তমান কালেও অনেক খ্যাতিমান লেখক বিদ্যাসাগরী রীতিতেই রচনা করে থাকেন। শরৎচন্দ্র তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের সাধনাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনার পথ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত গদ্যরীতিকে অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে একটি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বীকৃতি লিখিত আকারে রেখে দিয়ে গেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোজ্ঞ। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

কোনো এক আলোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যরীতিকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেই তিনি এবং তাঁর সমকালীন সাহিত্য-সেবীরা সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনি যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তার তাঁরা তত্ত্বাবধান করছেন।১

মনে হয় বাংলা গদ্যরীতির বিকাশের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ যেমন সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন এমন সুন্দরভাবে বোধ হয় আর কেহ বোঝাতে পারেননি। সুতরাং তাঁর সেই ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে :

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যকলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সম্পাদন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।" ২

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', ৬ষ্ঠ অধ্যায়
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্রপূজা' : বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ-লক্ষণ

['সন্ধ্যাসংগীত' ও কাদম্বরী-চিন্তা]

ভূদেব চৌধুরী

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাবলীতেই আপন প্রতিভা উন্মেষের প্রথম দিগন্ত নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্ব-ভাবে জাগরণের সে ইতিহাস বিবৃত করে বলেছেন, "এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূর দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ঘরের ছাদগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এই রূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য-রচনার যে সংস্কারের মধ্যে ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।" ১

বহুবচন এখানে যদি কেবল 'গৌরবার্থে' নাও হয়, তাহলে অন্তর্বদ্ধ কবি-ব্যক্তিত্বের পক্ষে হৃদয়াবেগ প্রচ্ছাদনের এ এক স্নিগ্ধ কলাকৌশল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্য সংস্কারের প্রায় একমেবাদ্বিতীয় প্রত্যক্ষ পরিচালিকা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী দেবী, কবির 'নতুন বৌঠান'। 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার কাল থেকে (১২৮৬-৮৮ বঙ্গাব্দ) তাঁর নিয়ন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমশঃ নেপথ্যলীন হয়ে ধীরে ধীরে অবচেতনা-নিমগ্ন অদৃশ্য প্রেরণারূপে রহস্য-প্রচ্ছাদিত হয়েছে। অন্যপক্ষে 'কড়ি ও কোমল' -পর্যায়ে তাঁর আকস্মিক লোকান্তর (১২৯১ বঙ্গাব্দ) সত্ত্বেও সেই প্রেরণা-রূপের অমোঘতা প্রায় কখনোই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি; বরং বিচিত্র কবি-মানসিকতার পাত্র থেকে পাত্রান্তরে পরিবর্তিত, মন্থিত হয়ে গাঢ়বদ্ধ ক্রমিক পরিণতির অভিমুখী হয়েছে। এই তাৎপর্যে রবীন্দ্র-কবিতা-ভাবনা উন্মোচনের প্রাথমিক লগ্নে কবি-চিত্তে সেই রহস্য-মহিমামন্নীর আবস্থানিক মূল্য আবিষ্কারও কাব্য-রসসন্ধানীর পক্ষে এক অনিবার্য পূর্বশর্ত হয়ে দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব-জীবন পরিবেশ-বঞ্চিত চিত্তলাঞ্ছনে স্বভাবমগ্ন হয়েছিল কবির জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে।২ সে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন প্রবণতা; কিন্তু কবি-বাসনার নিভৃতিতে আরো এক অভিনব অনুভবের মর্মক্ষোভ ও অবসাদ বিলগ্ন হয়েছিল। 'মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপি পরিচয়' নির্দেশ উপলক্ষে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তার তথ্যনির্ভর বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন ৩—নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদ্যাচর্চা করে সাফল্যলাভ বালক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পরিবারের প্রত্যাশাকে তিনি দিনে দিনেই ক্ষুব্ধ করে তুলছিলেন এদিক থেকে; অন্যপক্ষে একনিষ্ঠ কাব্য-সাধনা সম্পর্কে তাঁর সহজাত নীরব অন্তঃস্বপ্ন পারিবারিক-জনের অনুভূতিগোচরও হতে পারছিল না। অথচ প্রচলিত জীবনযাত্রায় লোকসম্ভব

সকল সম্ভাবনা-রিক্ত হয়ে ঐ একমাত্র যোগ্যতাকেই কবি দৃঢ় বলে আঁকড়ে ধরছিলেন ক্রমশঃ—নিজের কাছে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে রাখার প্রায় একমাত্র অবলম্বনরূপে। আত্ম-মূল্যের অসংশয়িত অনুভব, এবং বহিঃপরিবেশে তার বিস্তার সাধন সুস্থ মানবিক অস্তিত্বের এক অনিবার্য মানস পূর্বশর্ত। এদিক থেকে স্বীকৃতি-বঞ্চিত বয়ঃসন্ধি-লগ্ন কবির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের চেষ্টা কত কুণ্ঠিত অথচ অন্তর্লুব্ধ ছিল, এবং ক্ষীণতম প্রাপ্তিতেও তা কত সঞ্জীবিত হয়ে উঠত, 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র মত স্মৃতি-চারণাতে তার স্বীকারোক্তি কারুণ্যপীড়িত হয়ে আছে। আন্না তড়খড় [বিলাতযাত্রাপূর্ব প্রথম পর্যায়ে ইনি কিছুকাল কবির শিক্ষা-নির্দেশিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন] প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—"পুথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধা পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লিখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন।" ৪ আন্নার 'আদর' কবি ভূরি পরিমাণে পেয়েছিলেন; সে সব কথা আছে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে; আর বলেছিলেন শ্রীদিলীপকুমার রায়কে। ৫ কবির বয়স তখন সতেরো পেরিয়েছে। তারপরেও তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবন-চেতনা সমবয়স্কা নারীর 'আদর'-পুষ্ট হয়েছিল বিলাতে স্কট্-কন্যাদের নিবিড় সান্নিধ্যে।

কিন্তু কবি-চিত্তে মানস বিপর্যয়ের প্রাথমিক চরমলগ্ন তার আগেই সফলতার সঙ্গে অতিক্রান্ত হতে পেরেছিল,—যথাকালে কবি-জীবনে যার একমাত্র আলম্বন ছিলেন দেবী কাদম্বরী। নিছক কবির,—সর্বকর্মে অপারগ, কল্পনাবিলাসী, ভাবুক কবির মূল্যও যে কারো মনে প্রশ্নাতীত স্বীকৃতি-মহিমায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, আজন্ম যন্ত্রণার্ত জীবন-অভিজ্ঞতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্বস্তিকর সত্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন স্বল্পাধিক বয়স্কা এই ভ্রাতৃবধূর হৃদয়-গভীরে। কবিতা রচনাও যে একটা 'কাজ', এবং বস্তুতঃ এক অসাধ্য-সাধন, এই দৃঢ় প্রত্যয়মুগ্ধতা কাদম্বরীর সমগ্র সত্তায় বিকিরিত হয়েছিল। বিহারীলাল ছিলেন তাঁর স্বপ্নের কবি,—যাঁর কলকাকলিপূর্ণ কবিতাশিল্পের ভাব-ভাষা মহাকাব্য-প্রবণতার সেই যুগে অভিনব হলেও পুরোপুরি নিরঙ্কুশ ছিল না। একান্ত সমবয়স্ক কাছের মানুষ মুখচোরা দেবরটির মধ্যে সেই অপূর্ব প্রতিভার সহজ স্ফুরণ-সম্ভাবনা এই বালিকা-বয়সিনীকে কেবল মুগ্ধ নয়, কৌতুকাবিষ্টও করেছিল। তখন থেকেই এই কবি-কোরকের বিকাশ সাধনে আত্মনিমগ্ন হলেন তিনি।

একেবারে প্রথম পর্যায়ে কাদম্বরীর স্বভাব-মুগ্ধতা প্রচ্ছন্ন বৈরূপ্যের ছদ্মবেশেও রবীন্দ্র-কবিকর্মে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অক্ষয় চৌধুরীর মত বিদগ্ধজনও যখন কিশোর কবির সপ্রশংস পৃষ্ঠপোষণরত, তখনও, কবি বলেছেন, "বৌঠাকরুণের ব্যবহার ছিল ঠিক উল্টো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখ্‌তে পারব না"।৭ নতুন লিখিয়ের উৎসাহ কিন্তু তাতে কমে নি, বরং আপাতবিমুখ ঐ প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতার দীপ্ত ছত্রাতপতলেই নিজের সারস্বত সাধনার আসন বিছিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে ব্যাকুলতর হয়েছে। 'শৈশব

সংগীত'-এর 'উপহার'-এ স্বীকৃতি রয়েছে : "বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।" কিংবা, 'ছবি ও গান,-এর উৎসর্গপত্রে : "যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" এবং আরো কত স্ফুট-অস্ফুট স্বীকারোক্তি রয়েছে সমসাময়িক এবং পরবর্তী জীবনের গদ্য-পদ্য রচনায় ছড়িয়ে। বস্তুতঃ বিহারী চক্রবর্তীর মত লিখিয়ে হবার আগ্রহও শুরুতে এই একই সূত্রে নেশার মত পেয়ে বসেছিল।

তাহলেও রবীন্দ্র-জীবনে কাদম্বরীর যথাযথ ভূমিকা কেবল কাব্য-কবিতার কল্পলোকেই নয়, ব্যক্তি-জীবনের জটিলতম গ্রন্থিবিন্দুতে। যথার্থতঃ রবীন্দ্রনাথের বৃহদায়তন কাব্যসৃষ্টি বহুলাংশে তাঁর প্রকাশকুণ্ঠ স্পর্শাতুর ব্যক্তিজীবনানুভবেরই শিল্প-প্রতিফলন।[৮] এদিক থেকে রবীন্দ্র-ব্যক্তিজীবন-প্রচ্ছদে কাদম্বরী দেবী প্রথম স্ফুটতম নারীস্নেহ, যার স্বচ্ছ অতলতায় যথা-ইচ্ছা অবগাহন করে আজন্ম উপেক্ষিত মনস্কের যথার্থ-অযথার্থ সকল অন্তর্দাহের নির্বাপণ ঘটেছিল, ব্যথিত চৈতন্যে যুগপৎ উৎসারিত হয়েছিল আত্ম উন্মোচনের অনির্বাচ্য উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথ আপন মানসিকতার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো বাতাসে তাহার যেমন দরকার, এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না। মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের কিছু না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এই প্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছট্‌ফট্‌ করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজ প্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া যায়। আমারও সেই দশা ঘটিল।"[৯]

সেই কাঙালপনার ক্ষুব্ধ মরুভূমিতে মরূদ্যানের প্রথম প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন অপরিচিতা 'নববধূ'। তাঁকে উপলক্ষ করে কিশোর-মনের আত্ম উন্মোচনের উৎকণ্ঠা ও অবরোধ-বিচঞ্চল মুহূর্তের তথ্য-বই বিচিত্র উপাদান প্রকীর্ণ রয়েছে 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'র পৃষ্ঠায়। অবশেষে "হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে যেমন সাবেক বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘট্‌ল। ...বৌঠাকরুণের জায়গা হল বাড়ি-ভেতরের ছাদের লাগাও ঘরে।" তেতালার সেই ছাদে বৌদির প্রথম সান্নিধ্য-নিবিড়তার কবোষ্ণ অনুভব স্মরণ করে কবি লিখেছেন, "এইবার আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর এক পালা —এল মানুষের সঙ্গ, এল মানুষের স্নেহ।"[১০]

বস্তুতঃ কাদম্বরী দেবীর অস্তিত্ব-অনুভবকে আশ্রয় করে আজন্ম মানুষের স্পর্শ-রিক্ত রবীন্দ্র-জীবনে এল প্রথম ভালবাসা, অবদমন-পীড়িত মানসিকতার পক্ষে আত্মমোচনের যা একমাত্র প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি; আর প্রকাশই কবির ধর্ম—সহজ আত্মপ্রকাশ। সেই সহজাত প্রেরণা-বলেই নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখতে পারার মর্মমন্থন ছিল কবি-কিশোরের নিত্য সহচর। কাদম্বরীর সাহচর্যে চিত্ততলে প্রথমাবিষ্কৃত

নারীস্নেহের হাত ধরে স্বভাবগত অন্তর্বদ্ধতার নির্মোক-মুক্ত হয়ে এলেন কবি,—আনুকূল্য-প্রসন্ন তাঁরই হৃদয়ের স্বচ্ছতায় দেখতে পেলেন আপন আন্তরধর্মের যথার্থ প্রতিরূপ। সেই প্রথম অনুভূতির দিনেই এ ভালবাসাকে চিনে নিতে ভুল হয়নি কবির,—"আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন, তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শভাব জাগিতেছে তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন।···ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা।"১১

রবীন্দ্র-জীবনে কাদম্বরী প্রথমে এসেছিলেন অবদমিত মর্মাহত বাসনার স্ফুরিত মূর্তিরূপে। ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তি-বাসনা ভাবনা ও ভাবুকতায় যত সংহত পরিণত হয়েছে, কবি-চিত্তে কাদম্বরীর বাস্তব অস্তিত্বও ততই মানস প্রতিমা (emotional image) রূপে ক্রমশঃ পরিস্রুত হয়ে চলেছে, দেহ-বিন্যস্ত সত্তার সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে ক্রমেই বিকশিত হয়ে উঠেছে হৃদয়ের সেই 'আদর্শ ভাবে'র দ্যোতনা, যার মূলে রয়েছে 'ভাল ভালবাসিবার' আগ্রহ। বস্তুতঃ ভালবাসা মাত্রই আত্মদর্শনের দর্পণ, আর ভালবাসার আলম্বন দর্পণে প্রতিবিম্বিত সেই ছায়ামূর্তিটি, যার সর্বাঙ্গে নিমগ্নতম ব্যক্তি-বাসনার অস্ফুট অরূপ অন্তর-রহস্য রূপ-সংহত হয়ে ধরা পড়ে। তাহলেও ভালবাসা চিরদিন কেবল স্বচ্ছ দর্পণ-খণ্ডই ; অন্যপক্ষে চিত্তভূমির বিবর্তন ও পরিণতি সূত্রে দর্পণ-প্রতিবিম্বের, তথা প্রণয়াস্পদের আয়তন ও প্রকৃতিগত প্রসার-পরিণতি অনিবার্যভাবেই ঘটে চলে। রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসেও কাদম্বরী-ভাবুকতায় সেই বিবর্তন-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বহুবার, যার প্রথম উন্মোচন-সূত্রটি 'সন্ধ্যাসংগীত'-লীন কবি-মনোভাবনার পূর্বাপর ধারায় ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিন্যস্ত।

একেবারে প্রথম পর্যায়ের কবিতা-কর্মে কাদম্বরী দেবীর বাস্তবিক অস্তিত্বের আয়তন বহুস্থলেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত। এতাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীনতম রবীন্দ্র-রচনা-নিদর্শন 'মালতী পুথি'তে 'কবিকাহিনী'র প্রাথমিক পাণ্ডুলিপির শেষে পরপর গোটা-তিন খণ্ড-কবিতাংশ অন্ততঃ পাওয়া যায়, আপাত-উপেক্ষিত কিশোর মনের অভিমান যাতে বয়ঃসন্ধিসুলভ তীব্রতায় আক্ষিপ্ত। আর সে অভিমান-বিক্ষোভের উৎস যে কৈশোর-সহচারিণী কাদম্বরী, তাতেও সন্দেহের কারণ থাকে না :

"ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর
কারো কাছে বর্ষিব না অশ্রু বারিধার।
মানুষ পরের দুখে, করে শুধু উপহাস
জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বার
যাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হোলে
যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার
তারাই ২ যদি এত গো নিষ্ঠুর হোল
তবে আমি হতভাগ্য কি করিব আর।

* * *

যার তরে কেঁদে মরি সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।”[১২]

'ছেলেবেলা' এবং 'জীবনস্মৃতি'র সংকেতসূত্র ধরে এই আবেগ ও মর্মযন্ত্রণার ব্যক্তিক উৎসটি আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। পরবর্তী কবিতায় এসম্পর্কে ভাষা-রূপায়ণ আরো স্পষ্ট :

“যারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন
সেই এ হৃদয় করিয়াছে চূরমার।”[১৩]

কিন্তু এ-সব লেখা কবিতা নয়, পদ্যের আকারে একান্ত বদ্ধ ব্যক্তিমনের স্বগত-উচ্ছ্বাস, যেমন গদ্যে আছে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ'র 'সমাপন' নামক রচনার অবশেষে।[১৪] এই সব ব্যক্তিক অনুভব ও আস্বাদনকে সর্বায়ত 'প্রতিমা' (universal image) রূপে কবিতাবদ্ধ করতে চাওয়ার প্রয়াস রয়েছে সমকালীন গাথা-কাব্যসমূহে, 'বনফুল' (১২৮২) এবং বিশেষ করে 'কবিকাহিনী'তে (১২৮৪) আত্মবিম্বনের এই আগ্রহ কবি-কল্পনায় পরিস্ফুট হতে দেখি। 'মালতী পুথি'র একেবারে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় পাওয়া কবিতাগুচ্ছে কবির ব্যক্তিক বেদনাকে উপাখ্যান কবিতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্বজনীন শিল্পরূপ রচনার প্রয়াস-চিহ্ন আরো স্পষ্ট, অর্থাৎ তৎকালীন মানসিকতার tool mark তাতে স্বচ্ছতম। প্রথম কবিতায় আছে “হৃদয়-বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর, গর্ব্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল, কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম” এবং “ভদ্রতার কাষ্ঠহাসি”তে পীড়িত কিশোর-চিত্তের উপেক্ষিত-মনস্কতার ক্ষোভ, পরবর্তী কবিতাংশে বন্দনা করা হয়েছে, “এমন হৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে” চিত্ত-মুক্তির পরমাশ্রয় “প্রেমের প্রতিমা”কে যার নাম অমিয়া। এই নামকরণেও অপরিণত মনস্ক প্রতীকায়নের ব্যঞ্জনা হয়ত অনচ্ছ নয়, যাকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন,

“পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গো গলিয়া।
কেহই আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া!
জননী, ভগ্নীর মত বেসেছিলে ভাল
সে কি আর এ জনমে পারিব ভুলিতে।”[১৫]

এখানেই কাদম্বরী-রূপিণী প্রেম-আলম্বনের ওপরে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে আবাল্যপোষিত নিমগ্ন-বাসনার স্পষ্ট প্রক্ষেপণ ঘটেছে। 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'তে কবির উপনয়নকালে হবিষ্যান্ন-বিধায়িনী কিংবা মাতৃবিয়োগলগ্নে পরম-পরিপালিকারূপে তাঁর যে ছবি আঁকা হয়েছে, তাতে বুঝি, 'জননী', 'ভগ্নী' কিংবা 'বন্ধু'র ভূমিকাতেই রবীন্দ্র-প্রেমানুভবের দর্পণে তাঁর প্রথমতম আবস্থানিক প্রতিবিম্বন। 'রুদ্রচণ্ড' কাব্যনাট্যে (১৮৮১) চাঁদ-কবিও অমিয়াকে 'ভগ্নী'র দৃষ্টিতেই দেখেছিল। ধীরে ধীরে সেই ভাবপ্রতিমা “সংসারের ধ্রুবতারা”[১৬] হতে 'জীবনের ধ্রুবতারা'তে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। 'ভগ্ন-হৃদয়ে'র উৎসর্গপত্রে এই ব্যক্তিক অনুভবকেই কত স্বল্পায়াসে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, কবির চেতনা-মগ্ন অরূপ-বাসনা প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত আলম্বন-মূর্তির একান্তবদ্ধতামুক্ত হয়ে রূপাতিক্রান্ত সর্বায়তির পথে ক্রমশঃ অভিমুখী হয়ে চলেছে। এই উপলব্ধিই ব্যক্তিক সম্পর্ক-অভিজ্ঞতার সম্বন্ধমোচিত হচ্ছে

হতে পরিণামে কবি-কল্পনার সর্বাত্মক ভাবব্যঞ্জনায় সুরভিত হয়ে উঠেছে। সেই সীমান্ত অতিক্রমণ প্রচেষ্টার প্রথম পূর্ণতা 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে। এই তাৎপর্যেও, কেবল রবীন্দ্ররচনার ইতিহাসে নয়, তাঁর ব্যক্তি-ভাবুকতার নিভৃতিতেও 'সন্ধ্যাসংগীত' অন্ধ আত্মসর্বস্বতা-মুক্ত স্বচ্ছতায় প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম দিগন্ত।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র শেষ কবিতাটি 'উপহার'; আর প্রথম সন্নিবিষ্ট কবিতার নাম 'সন্ধ্যা'। 'গ্রন্থ-পরিচয়' প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, মূলগ্রন্থ সমাপ্তির পরে কাব্য-ভূমিকারূপে দুটি কবিতাই 'উপহার' নামে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে যোজিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বর্তমান 'উপহার' অভিধাযুক্ত কবিতাটি ছিল দ্বিতীয়তর; প্রভাতকুমার বলেছেন এটিকেই "এই গ্রন্থের উপহার বা উৎসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।" তাহলেও তাঁর বক্তব্য—"কাহাকে উপহার তাহা কবি বলেন নাই, আমরাও অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত গড়িতে চাহি না।"[১৬] তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, কবিতাটির প্রথম তিন স্তবকে ব্যক্তি-কবির অনুভবে কাদম্বরী দেবীর ব্যক্তিত্ব-বদ্ধ অস্তিত্বের প্রেরণারূপই বরং স্পষ্ট-ব্যঞ্জিত হয়েছে:

"ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
* * *
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।"

কিন্তু চতুর্থ স্তবকেই এই প্রত্যক্ষ প্রেরণাময়ীর ভাবানুভব কাব্য-লক্ষ্মীর নৈর্ব্যক্তিক রূপকল্পে ক্রমশঃ পরিস্রুত হয়ে এসেছে:

"কখনো গাও নি তুমি কেবল নীরব রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছি প্রাণ।"

পরিস্রুতির এই ক্রমিক সূত্রে পঞ্চম স্তবকটি রীতিমত 'invocation to Muse' হয়ে উঠেছে:

"বলো দেখি কতদিন আসনি এ শূন্যপ্রাণে।
বলো দেখি কতদিন চাওনি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কতদিন শোননি আমার গান—
তবে সখী গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।"

বলাকার 'ছবি' কবিতার কথা মনে পড়ে। এ আকুলতা যাঁকে উদ্দেশ করে, আসলে

তিনি 'কবির অন্তরে কবি'। এই কবিতার সূত্রেই আরো বহু পরবর্তী কালের পরিণত ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনি যেন :

"ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছো মোরে তুমি
বিচিত্রা হে, 'বিচিত্রা।" ['বিচিত্রা' : 'পরিশেষ' কাব্য]

কিংবা এ-যেন 'অশেষ' ['কল্পনা' কাব্য], এমন কি 'চিত্রা'র 'অন্তর্যামী'রও পূর্বপদসম্পাত! এই কবিতারই শেষ-পূর্ব স্তবকের ব্যাকুল জিজ্ঞাসুতায় 'অশেষ' কবিতার বিপরীত প্রশ্নটিই বুঝি পরিস্ফুট :

"যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে ?
তার সাথে মিলিছে না স্বর ?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান—
তাই সখী, রয়েছে কি দূরে ?"

প্রবন্ধের একেবারে প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে ধৃত কবি-কণ্ঠের স্বীকৃতি আর এই অধীর জিজ্ঞাসাকে একসূত্রে বাঁধতে পারলে 'উপহার' কবিতার উদ্দিষ্টাকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়; কবির অনুভাবকতা বশে সেই ব্যক্তিত্বময়ীই ভাবস্বরূপিণী হয়ে উঠেছেন কবিতা-দেহে। প্রচলিত সমালোচনার ভাষায় বলতে হয়—কবির 'জীবন-লক্ষ্মী' 'কাব্য-লক্ষ্মী'তে রূপান্তরিতা হয়েছেন। বস্তুতঃ এই অনপেক্ষিত ভাব-পরিস্রবণেই রবীন্দ্র-কবিতার কাদম্বরী দেবীর স্থায়ী শিল্পাবেদন, কিংবা শিল্প-প্রেরণাও।

কৃষ্ণ কৃপালনী গভীর দৃঢ়তায় বলেছেন, কোনো একটিমাত্র অভিধায় বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বভাব নির্দেশ করতে হলে বলতে হয়,—"...he was first and last, and above all else, a lover. He loved—whether one woman or many, or a mere image which he never found, whether God or man, whether nature or humanity."[১৭] অর্থাৎ রবীন্দ্র-মানসিকতার মৌল প্রবণতা প্রেমাগ্রহ; নানা বয়স ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবসূত্রে সেই স্বভাবধর্মের আলম্বন হয়ে দেখা দিয়েছে কখনো নারী, কখনো প্রকৃতি, কখনো 'মানবতা,' এবং কখনো ঈশ্বরও। স্বরূপে কিন্তু এঁরা কেউই স্বতন্ত্র নয়; বস্তুতঃ নানা সময় ও প্রতিবেশের প্রভাবে কবির "হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ-ভাব জাগিতেছে তাহারই প্রতিমা" এরা। হৃদয়-ভাবময়ী এই প্রতিমা যেখানে কেবল নারীরূপে প্রতীকায়িত সেখানেও কখনো কৈশোর-কামনার আলম্বন 'জননী', 'ভগ্নী' কিংবা 'বন্ধু', কখনো বা যৌবনোত্তাল আকাঙ্ক্ষার পরমাশ্রয় 'বাসনা-বাসিনী'—পরিণত মানসিকতায় জীবনসঙ্গিনী, 'অন্তর্যামী' কিংবা 'জীবনদেবতা' রূপে, অথবা প্রৌঢ়ী সীমান্তে 'লীলাসঙ্গিনী' মূর্তিতেও এই চিত্ত-প্রতিমারই প্রতীকোদ্ভাস। এক বিশেষ তাৎপর্যে রবীন্দ্র-রচনা তাঁর অন্তর্বদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন বেদনা আর ব্যক্তিক বাসনারই শিল্পরূপ। অন্যপক্ষে কবি-ব্যক্তির

নিমগ্ন-চেতনায় আত্ম-সন্দর্শন ও উজ্জীবনের প্রথম পরম-উৎস 'প্রেম-কেন্দ্রটি কাদম্বরী-রূপিণী নারীস্নেহের দাক্ষিণ্য-সিঞ্চিত। অবচেতনালীন এই ধ্রুব অনুভবই প্রেমভাবুকতামুখ্য রবীন্দ্র-কবিতার বহু স্থলে বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

তাছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে, কিংবা অন্য যে-কোনো উপলক্ষেই, রবীন্দ্রকাব্যে idea-র সীমান্ত লঙ্ঘন করে বাস্তবিকতার হস্তাবলিপ্ত জগতে অতিমাত্রায় পশ্চাদপসরণ করতে গেলে কাব্যের সত্যকেই নয় কেবল, কবি-জীবনের যথার্থ তাৎপর্যকেও হারাতে হয় বহুলাংশে। ব্যক্তির একক সম্বলকে ভাবপরিস্রুত সর্বায়তি দানেই রবীন্দ্র-কবিমানসিকতার প্রায় একমাত্র প্রসার; এরই নাম বিশেষজ্ঞের ভাষায় কবির 'অরূপচিন্তন' কিংবা 'বিশ্বানুভূতি'। রবীন্দ্রনাথের পরিবর্জিত প্রাথমিক রচনার ইতিহাসে অন্তঃ-পীড়িত ব্যক্তি-কবির আত্মনির্মোচন-প্রয়াসের ব্যথিত কাব্যচিত্রটি প্রায় স্বয়ংস্ফুট[১৭]; চিত্রীর চিত্ত সেখানে কাদম্বরী-স্নেহে প্রত্যক্ষ-পুষ্ট। 'সন্ধ্যাসংগীতে' ক্ষণিক 'অন্তর্ধান পটে' তাঁর 'চিরন্তন রূপটি' কবি-চেতনায় স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের পরিচালিকাশক্তিকে কবির আত্মীকৃত ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত করতে পারার প্রথম প্রয়াস স্পষ্ট সূচিত হয়েছে, এই তাৎপর্যেও 'সন্ধ্যাসংগীতে' রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার প্রথম স্বী-করণের নিশ্চিত স্বাক্ষর।

নির্দেশপঞ্জী

১. 'জীবনস্মৃতি'।

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—'রবীন্দ্রসৃষ্টির উৎস সন্ধানে : দেশ-কাল-পাত্র' (প্রবন্ধ) : 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' (১৩৭৪, বৈশাখ সংখ্যা)।

৩. 'মালতী পুথির পাণ্ডুলিপি পরিচয়' প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' (১)।

৪. 'ছেলেবেলা'।

৫. দ্রষ্টব্য : দিলীপকুমার রায় প্রণীত 'তীর্থঙ্কর'।

৬. তদেব। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'দুদিন' কবিতাটিও সেই স্মৃতিভারে সন্নত।

৭. 'ছেলেবেলা'।

৮. দ্রষ্টব্য : ভূদেব চৌধুরী—'রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র : রবীন্দ্রযুগের রূপরেখা'। ('রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৭৩)।

৯. 'জীবনস্মৃতি'।

১০. 'ছেলেবেলা'।

১১. 'আদর্শপ্রেম' ('বিবিধ প্রসঙ্গ' : রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১)

১২. দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ড, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত (পৃ. ৯৭)।

১৩. দ্রষ্টব্য : তদেব (পৃ. তদেব)।

১৪. দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ প্রসঙ্গ' : রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১)।

১৫. 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' (১ম) ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত (পৃ, ২৩)।

১৬. 'রবীন্দ্র জীবনী' (১ম), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৭. Rabindra Nath Tagore : A Biography, by Krishna Kripalani.

সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা

গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গুর্মুখ রায়ের সত্বাধীনে এবং গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় তাঁরই রচিত পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' মঞ্চস্থ (৬ শ্রাবণ, ১২৯০ সাল, ১৮৮৩ খ্রী) করে সেই আদি স্টার থিয়েটারের শুভ-যাত্রা আরম্ভ হল। এই পর্বে তাঁর নাটকের সঙ্গীতপরিচালক ও সুরসংযোজকরূপে প্রথমে নিযুক্ত হলেন বেণী ওস্তাদ নামে সুপরিচিত বেণীমাধব অধিকারী। (কারণ পূর্ববর্তী সঙ্গীতপরিচালক রামতারণ সান্যালকে ন্যাশনাল থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ জহুরী—মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল্‌বাবু), কেদারনাথ চৌধুরী, ধর্মদাস সুর, বনবিহারিণী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর মঞ্চে নিযুক্ত রেখে দেন)।

সঙ্গীতজ্ঞ পিতা নিমাই অধিকারী এবং ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণীমাধব অধিকারী কলকাতার সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে প্রখ্যাতনামা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (তখনো নরেন্দ্রনাথ দত্ত) এবং তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা, পরবর্তীকালের সঙ্গীতগুণী অমৃতলাল দত্তের (ওরফে হাবু দত্ত) প্রধান সঙ্গীতগুরু বেণীমাধব অধিকারী।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের গানগুলির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত নাট্যশালায় বেণীমাধব প্রথম গুণপনার পরিচয় দিলেন। এই নাটকের পাঁচখানি গানই রাগে তালে গঠিত, তার একটি ধ্রুপদাঙ্গের। বেণী ওস্তাদ-রচিত সুমধুর সুরে গানগুলি মঞ্চে গেয়েছিলেন স্বনামধন্যা নটী বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাক্রমে সতী, প্রসূতি, তপস্বিনী ও নারদের ভূমিকায়। অন্যান্য চরিত্রে গিরিশচন্দ্র (দক্ষ), অমৃতলাল মিত্র (মহাদেব), অমৃতলাল বসু (দধীচি), নীলমাধব চক্রবর্তী (ব্রহ্মা), অঘোর-নাথ পাঠক (নন্দী), গঙ্গামণি (ভৃগুপত্নী) প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের গানগুলিও শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেছিল।

অসাধারণ মঞ্চসফল 'দক্ষযজ্ঞ' প্রথম অভিনয়ের তিন সপ্তাহ পরে স্টারে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'ধ্রুবচরিত্র' অভিনীত হল ১২৯০ সালের ২৭ শ্রাবণ (১৮৮৩ খ্রী)। 'ধ্রুবচরিত্রে'র জন্যে ২৫টি গান রচনা করেন গিরিশচন্দ্র এবং সেই গীতাবলী রাগে তালে সম্পূর্ণ করেন বেণী ওস্তাদ। শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও গানগুলি নাটকটির প্রধান আকর্ষণ হল। বেশির ভাগ গাইলেন ধ্রুবরূপিণী ভূষণকুমারী এবং সুনীতির ভূমিকায় কাদম্বিনী। দুজনেই তাঁরা সুকণ্ঠ গায়িকা। ধ্রুবের চরিত্রে ভূষণকুমারীর সুন্দর অভিনয় ও প্রাণস্পর্শী গান দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিশেষ তাঁর 'ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলেনা, ফুলে পূজা হবে তা তো ভোলেনা' গানখানি। বিখ্যাত 'সাধারণী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের

সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার গানটির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। 'ধ্রুবচরিত্র'ও সেকালের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক।

'ধ্রুবচরিত্র' উদ্বোধনের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নলদময়ন্তী' মঞ্চস্থ হল স্টারে (৭ পৌষ, ১২৯০)। এবারেও গিরিশচন্দ্রের গানগুলির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক বেণীমাধব অধিকারী। নৃত্যপরিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নাট্যমঞ্চে পূর্বপ্রচলিত নৃত্যধারা পরিমার্জিত করে নৃত্যবিষয়ে নতুনত্বের সন্ধান দেন। বেণী ওস্তাদের সুররচনাও লাভ করে জনসমাদর। অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বসু (বিদূষক), নীলমাধব চক্রবর্তী (পুষ্কর), বিনোদিনী (দময়ন্তী), ক্ষেত্রমণি (রাণী, ব্রাহ্মণী, জনৈকা বৃদ্ধা) প্রভৃতির অভিনয়ে এবং বেণী ওস্তাদের সুর ও কাশীনাথের নৃত্যপরিকল্পনায় 'নলদময়ন্তী' অসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছিল। রাগে তালে সুগঠিত মোট ৬খানি গানের মধ্যে একক সঙ্গীত পরিবেশন করতেন বিখ্যাত গায়িকা-অভিনেত্রী ভূষণকুমারী ('সুনন্দা'র ভূমিকায়)। বাকি গানগুলি সঙ্গীগণের সমবেতকণ্ঠে গীত হত।

পর পর গিরিশচন্দ্রের তিনখানি নাটকের ব্যবসায়িক সাফল্যে স্টার থিয়েটার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই সময়েই অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে নাট্যমঞ্চের স্বত্ব ও সংস্রব ত্যাগ করতে চাইলেন গুর্মুখ রায়। তখন গিরিশচন্দ্রের উদ্‌যোগে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন। এই নতুন ব্যবস্থাপনার পরবর্তী স্টারের নাটক, গিরিশচন্দ্রের আর একখানি পৌরাণিক 'কমলে কামিনী'র প্রথম অভিনয় হল ১৭ই চৈত্র, ১২৯০ সালে। শ্রীমন্তের ভূমিকায় বিখ্যাত গায়িকা অভিনেত্রী বনবিহারিণী মঞ্চাবতরণ করলেন; তাঁকে এর মধ্যে প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার থেকে আনা হয়েছিল। 'কমলে কামিনী'র এক প্রধান আকর্ষণ ছিল বনবিহারিণীর কণ্ঠে মধুর ভক্তিভাবের গানগুলি। নাটকটিতে গিরিশচন্দ্র স্বরচিত ১৭খানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। রাগে ও তালে সুসংবদ্ধ সেই গীতাবলীর মধ্যে ১০টি গাইতেন শ্রীমন্তবেশিনী বনবিহারিণী। অন্যান্য গানগুলি বিনোদিনী (খুল্লনা), অঘোরনাথ পাঠক (নারদ) প্রভৃতি শোনাতেন।

তারপর ৫ বৈশাখ, ১২৯১, গিরিশচন্দ্রের দুই অঙ্কের 'বৃষকেতু', গীতিনাট্য 'হীরার ফুল' ('অপ্সরা-গীতিহার' নামে উল্লেখিত) এবং অমৃতলাল বসু প্রণীত প্রহসন 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' একসঙ্গে মঞ্চস্থ হল স্টারে। তার মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ্য 'হীরার ফুল' গীতিনাট্য। এক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্রের গানের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব অধিকারী। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (মদন), অঘোরনাথ পাঠক (দৈত্য), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (অরুণ), বিনোদিনী (শশীকলা), ভূষণকুমারী (রতি) প্রভৃতি মোট ৯খানি রাগে তালে গঠিত গান গেয়েছিলেন। গীতিনাট্যটির নৃত্যপরিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। গানগুলি একটু হাল্‌কা চালের এবং লোকের মুখে মুখে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

স্টারে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎসচিন্তা' (প্রথম অভিনয় ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১)। নৃত্যসমেত ২২খানি রাগে তালে অনুষ্ঠিত গানের বেশির ভাগ পরিবেশন করেন লক্ষ্মীদেবীর

ভূমিকায় গঙ্গামণি (গঙ্গাবাঈ নামে প্রসিদ্ধা গায়িকা)। গানগুলি নাটকের সম্পদ ছিল এবং বহু বছর পরে মিনার্ভা থিয়েটারে পুনরভিনয়ে সুধাকণ্ঠী সুশীলাবালা এই সব গান শুনিয়ে গঙ্গামণির মতন দর্শকদের মুগ্ধ করতেন।

তার প্রায় দুমাস পরে স্টার এবং গিরিশচন্দ্রের এক বিজয় বৈজয়ন্তী 'চৈতন্যলীলা'র উদ্বোধন হল ১৯ শ্রাবণ, ১২৯১ তারিখে। এই নাটকের সাফল্য এবং বিনোদিনী প্রমুখ অভিনেতৃবর্গের সাড়া-জাগানো অভিনয়ের কথা বলা বাহুল্য। 'চৈতন্যলীলা'র জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তার সাঙ্গীতিক আবেদন। রাগভিত্তিক ২০টি গানের ৭টি বিনোদিনী (চৈতন্য) এবং ৫টি বনবিহারিণী (নিতাই) গেয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভক্তিভাবের রীতিমত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। বনবিহারিণীর 'হা রে রে রে রে ওঠো রে কানাই' গানখানি পথেঘাটে লোকমুখে শোনা যেত সেসময়ে। এইসব গানেরই সুরকার ও শিক্ষক বেণীমাধব অধিকারী। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর যে বৈষ্ণবী ধরনের নৃত্য ভক্তদর্শকের মনে ভাবের জোয়ার আনত সেই নৃত্যও বেণী ওস্তাদ সেকালের মঞ্চে প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন রামাৎ বৈষ্ণব। 'চৈতন্যলীলা'র সঙ্গীতের মধ্যে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই কীর্তনাঙ্গ বিশেষ মর্মস্পর্শী। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (তিনি স্বয়ং এ নাটকে 'প্রতিবাসী' ও 'লোভ' ভূমিকা দুটির অভিনেতা) 'চৈতন্যলীলা'র প্রভাব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চালে পরে লেখেন: "বখাটে নট ও অর্থাটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্মপ্রচার হইল।...নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।"

'চৈতন্যলীলা' প্রথম মঞ্চস্থ হবার প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে স্টারে (৮ অগ্রহায়ণ, ১২৯১) অভিনীত হল একসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপু-রূপী অমৃতলাল বসু এবং প্রহ্লাদ চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় মনোগ্রাহী হলেও নাটকটির সমগ্রভাবে সঙ্গীতাংশ উল্লেখনীয় নয়। এ নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই চৈতন্যলীলায় ভক্তিভাবের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বেঙ্গল থিয়েটার অভিনয় আরম্ভ করে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। সে নাটকে কীর্তনের প্রাচুর্য এবং প্রহ্লাদের ভূমিকায় মধুরকণ্ঠী গায়িকা-অভিনেত্রী কুসুমকুমারীর ভক্তিভাবের গান গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্রে'র চেয়ে বহুগুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ "ভক্তিরসাত্মক চৈতন্যলীলার পর পাছে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' একই রূপ হইয়া যায়, এ নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র ইহাতে অধিক সংকীর্তনাদি না দিয়া ইহাকে অনেকটা পাশ্চাত্যশিক্ষিত দর্শকগণের রুচি-উপযোগী করিয়া রচনা করেন।...প্রহ্লাদ চরিত্র অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারই সাধারণের অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্টার থিয়েটারে 'বিবাহ বিভ্রাটের' সুখ্যাতি কিন্তু অপরিসীম হইয়াছিল।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃ. ৩০৬)।

তারপর স্টারে অভিনীত (১৬ মাঘ, ১২৯৬) গিরিশচন্দ্রের নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। এই

নাটকের অভিনয় ও গান উৎকৃষ্ট হলেও 'চৈতন্যলীলা'র মতন 'নিমাই সন্ন্যাস' সাধারণের সমাদর লাভ করতে পারেনি। গানগুলি বিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল বনবিহারিণী-বিনোদিনী-রামতারণ সান্যাল (ন্যাশনাল থেকে ইতিমধ্যে স্টারে এসেছিলেন) প্রভৃতির কণ্ঠে। 'নিতাই' রূপে বনবিহারিণী যে গানখানি পুরীতে মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করে গাইতেন ('দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ওই!') তা গভীর ভাবোদ্দীপক হত। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অভিনয় দেখবার সময় ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন গানটি শুনে।

এই সময় থেকে গিরিশচন্দ্রের রচিত সঙ্গীতের তথা স্টার মঞ্চের সুরকার ও সঙ্গীত-শিক্ষক সম্ভবত পুনরায় রামতারণ সান্যাল হয়েছিলেন। কারণ নাটকের সংগঠনকারীদের তালিকায় আর বেণীমাধব অধিকারীর নাম দেখতে পাওয়া যায় না এবং রামতারণ সান্যালকে দেখা যায় গানের ভূমিকায়। বেণীমাধব অধিকারীর পরিচালনায় শেষোক্তের গায়করূপে না থাকারই সম্ভাবনা।

'নিমাই সন্ন্যাসে'র তিনমাস পরে গিরিশচন্দ্রের করুণরসাত্মক পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ' স্টারে মঞ্চস্থ হয়। মোট ১৮খানি গানের প্রায় সবই রাগে-তালে গঠিত এবং গেয়েছিলেন বনবিহারিণী (রাধিকা), কুসুমকুমারী (বিশাখা), গঙ্গামণি (যশোদা), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু (শ্রীকৃষ্ণ), রামতারণ সান্যাল (শ্রীদাম) প্রভৃতি। গানগুলিই এ নাটকের এক প্রধান সম্পদ। প্রভাস যাত্রার সময় রাধিকার সখীদের 'চললো বেলা গেল লো, দেখব রাধা শ্যামের বামে' গানখানি এত জনপ্রিয় হয় যে, কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল। অনেক বছর পরে চুণীলাল দেব মিনার্ভায় 'প্রভাস যজ্ঞ' যখন অভিনয় করান (সে সময় তিনকড়ি 'যশোদা', সুশীলাবালা 'যশোদা' হিঙ্গনবালা 'রাধিকা') তখন অসামান্য জনসমাদর লাভ করে নাটকটি এবং তা প্রধানতঃ গানের জন্যে।

স্টারে তার পরবর্তী গিরিশচন্দ্রের নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' (প্রথম অভিনয় ৪ আশ্বিন, ১২৯২)। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনীত এই নাটকে ১১টি রাগে-তালে সমৃদ্ধ গান সন্নিবিষ্ট আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' গানখানি (দেববালা-রূপিণী ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারীর কণ্ঠে)। এই গান স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসজীবনের অব্যবহিত আগে তাঁর গৃহে গভীর রাত্রে গাইতেন এবং পরে বরাহনগর মঠেও নিয়মিত হত, তা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতিশয় প্রিয় ছিল। অভিনয়-কালীন দেববালাদের দ্বারা গীত এই গানখানি নাটকের বৈরাগ্যভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করত অপরূপভাবে।

গিরিশচন্দ্রের পরের নাটকটি আরো প্রসিদ্ধ এবং বাংলার দর্শকসমাজের দীর্ঘকালের জন্যে চিত্তজয়ী—স্টারে প্রথম অভিনীত (২০ আষাঢ়, ১২৯৩) 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'। এমন উচ্চ-ভাবের রচনা এবং উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ধন্য নাটকখানিরও সঙ্গীতাংশ রীতিমত আকর্ষণের বস্তু। ১২খানি রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে বিশেষ করে 'পাগলিনী'র 'ওমা কেমন মা তা কে জানে' (মিশ্র কাফি, একতালা), 'আমার পাগল বাবা' (গৌরী, একতালা), 'সাধে কি

গো শ্মশানবাসিনী' (কানাড়া মিশ্র, একতালা), 'আমায় নিয়ে বেড়াস হাত ধরে' (ছায়ানট, মধ্যমান), 'যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' (মাঝ মিশ্র, পোস্তা) ইত্যাদি বাংলার নাট্যমঞ্চে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। পাগলিনীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়ে যেমন গঙ্গামণি, তেমনি পরে পরে এক এক সময়ে অবতীর্ণা হয়েছেন নরীসুন্দরী, তিনকড়ি, সুশীলাবালা প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠা গায়িকা-অভিনেত্রী।

তারপরে গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' ব্যঙ্গনাটিকা স্টারে মঞ্চস্থ হল। এর ৫ খানি গান গাইতেন রামতারণ সান্যাল, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

স্টারে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক 'রূপসনাতন' (৮জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪)। এই ভক্তিভাবের নাটকটিতে গানের সংখ্যা ১৩টি এবং সেসব গেয়েছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (বল্লভ), অমৃতলাল মিত্র (সনাতন—অমৃতলাল যে গান গাইতেন, এ ভূমিকা তার এক দৃষ্টান্ত), ভূষণকুমারী (চোবে বালক), গঙ্গাবাঈ (করুণা), কিরণবালা (বিশাখা) প্রভৃতি।

'রূপসনাতন' অভিনয়ের পরই নাট্যজগতে আর একটি পালাবদল ঘটে। ধনকুবের মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীলের থিয়েটার ব্যবসায় করবার শখ হলে স্টারের জমি ও মঞ্চগৃহ কিনে নেন এবং স্টারের 'গুড-উইল' নিয়ে এসে কর্তৃপক্ষ হাতিবাগানে জমি ক্রয় করে পত্তন করেন নতুন স্টার থিয়েটার গৃহ। এটিই হাতিবাগান স্টার নামে পরিচিত হয় এবং গোপাললাল শীলের বিডন স্ট্রীটের নাট্যগৃহের নামকরণ হল এমারেল্ড থিয়েটার। কিন্তু নতুন স্টার মঞ্চ হাতিবাগানে সম্পূর্ণ হবার আগেই গোপাললাল শীল গিরিশচন্দ্রের অভাব বোধ করে তাঁকে ২০ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে এমারেল্ডে চুক্তিবদ্ধ করেন। গিরিশচন্দ্র তার থেকে ১৬ হাজার টাকা স্টার কর্তৃপক্ষকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দেন হাতিবাগানের মঞ্চগৃহ সম্পূর্ণ করবার জন্যে।

এমারেল্ডে গিরিশচন্দ্রের দুখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। দুটিই বেশ সমাদৃত—'পূর্ণচন্দ্র' (৫ চৈত্র,১২৯৪) ও 'বিষাদ' (২১ আশ্বিন,১২৯৫)। নাটক দুখানিতে সঙ্গীতের বিশেষ স্থান ছিল এবং প্রথমটির সঙ্গীত-পরিচালক শশিভূষণ কর্মকার ও দ্বিতীয়টির মোহিতমোহন ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (গায়ক-অভিনেতা)। 'পূর্ণচন্দ্রে'র ৮খানি গান গাইতেন কুসুমকুমারী, কিরণশশী প্রভৃতি এবং 'বিষাদে'র ৫খানি গান শোনা যেত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুসুমকুমারীর কণ্ঠে।

এমারেল্ডে উক্ত দুটি নাটক অভিনয়ের মাঝামাঝি সময়ে হাতিবাগানে স্টারে নতুন নাট্যগৃহের উদ্বোধন হয় (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' মঞ্চস্থ করে। 'নসীরাম' লেখকের নাম 'সেবক' বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল, কারণ গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে চুক্তিবদ্ধ থাকায় অন্যত্র নাটক দেবার আইনত অধিকারী ছিলেন না। নতুন স্টারে রামতারণ সান্যাল সঙ্গীতাচার্যরূপে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনিই গিরিশচন্দ্রের এই নাটকের ১৭খানি গানের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক। নসীরামের গীতাবলী নাটকের বিশিষ্ট সম্পদ। গানের জন্যে উল্লেখনীয় কাদম্বিনী (বিরজা), হরিমতী (মাধুরী) এবং বিশেষভাবে গঙ্গামণির

(সোনার ভূমিকায়) নাম। 'নসীরামে' সঙ্গীত সম্বন্ধে অমৃতলাল বসুর মন্তব্য : "এই নাটকের গানগুলির বিশেষত সোনার গানের তুলনা হয় না। গিরিশবাবুর কি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, কি শ্যামাবিষয়ক গান—মহাজন পদাবলীর পরেই উল্লেখযোগ্য।"

ভগবদ্‌ভক্তির নাটক 'নসীরামে'র পর স্টারে অমৃতলালের নাট্যরূপে 'সরলা' ও তাঁরই প্রহসন 'তাজ্জব ব্যাপার' অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র এখানে যোগদান করেন, কারণ গোপাললালের থিয়েটারের শখ মিটে গিয়েছিল। স্টারের জন্যে গিরিশচন্দ্র এবার তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'প্রফুল্ল' রচনা করে দিলেন এবং তা প্রথম মঞ্চস্থ হল ১৬ বৈশাখ, ১২৯৬ সালে। এমন মর্মান্তিক বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকও গিরিশচন্দ্র সঙ্গীতবর্জিত রাখেন নি। প্রসিদ্ধা গায়িকা-অভিনেত্রী বনবিহারিণী একটি উচ্চাঙ্গের গান গেয়েছিলেন 'ইতর স্ত্রীলোকে'র ভূমিকায়। তাছাড়া অঘোরনাথ পাঠকও 'জনৈক লোক' রূপে একখানি উৎকৃষ্ট গান ('মন আমার দিন কাটালি, মন খেয়ালি') শুনিয়েছিলেন।

'প্রফুল্ল'র অসামান্য সাফল্যের পর স্টারে গিরিশচন্দ্রের আর একটি নিপুণ সামাজিক নাটক 'হারানিধি' (২৪ ভাদ্র, ১২৯৬) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের ৫খানি গান গেয়েছিলেন গঙ্গামণি (কাদম্বিনী), দশ বছর বয়সী তারাসুন্দরী (হেমাঙ্গিনী) প্রভৃতি।

'হারানিধি' উদ্বোধনের এক বছর পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড' স্টারে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ৮খানি স্বরচিত গান সন্নিবিষ্ট করেন। তার সবগুলিই ভীলগণ প্রভৃতির সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত। 'চণ্ড'তেই তরুণ দানীবাবু নতুন ও বড় ভূমিকায় রঘুদেব রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করে দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।

'চণ্ডে'র পরে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মলিনা বিকাশ' এবং অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বাবুরাম' একসঙ্গে অভিনীত হয় স্টারে (২৯ ভাদ্র, ১২৯৭)। ১৭খানি রাগভিত্তিক গান 'মলিনা বিকাশে'র প্রধান আকর্ষণ। মলিনারূপিণী নটী মানদাসুন্দরীর গান যেন সুধাবর্ষণ করত, বিকাশ-বেশী গায়িকা-অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তও চমৎকার গাইতেন। সেই সঙ্গে বিলাস ও তরলার ভূমিকায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রবালার যুগ্ম নৃত্যগীত আনন্দের হিল্লোল জাগাত দর্শকদের মনে। গীতিনাট্যটির কয়েকটি গান ('যদি ঐ মনোমোহিনী পাই', 'দেখলে তারে আপনহারা হই,' 'পাখি তোর পেলে মধুর স্বর,' 'মন কেড়ে নে দেখ গো পলায়' ইত্যাদি) সেসময় মুখে মুখে পথেঘাটে শোনা যেত। বাংলার নাট্যশালায় দ্বৈত নৃত্যগীতের প্রথম সূচনা এই 'মলিনা বিকাশে' এবং পরিণতি 'আবু হোসেনে'। 'মলিনা বিকাশে'র নৃত্যগীতপ্রসঙ্গে 'রঙ্গালয়ে নেপেন' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র পরে লিখেছিলেন : "সঙ্গীতাচার্য রামতারণ (সান্যাল) গীতগুলির সুর সংযোজন করেন এবং নৃত্যশিক্ষা প্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়।...Duet-য়ে নৃত্যগীত 'মলিনা বিকাশে'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য।"...

স্টারে তারপর অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের রূপকনাট্য 'মহাপূজা'। মোট ৭টি গানই রাগে গঠিত এবং গাইতেন বনবিহারিণী, নগেন্দ্রবালা, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। বিশেষভাবে

উল্লেখ্য, বাংলার নাট্যশালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অমৃতলাল মিত্র 'মহাপূজা'তে গান গেয়েছিলেন। ভারতসন্তান রূপে তিনি রামতারণ সান্যাল, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ পাঠক প্রভৃতির সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতে যোগ দেন পাদপ্রদীপের সামনে। 'মহাপূজা'র সঙ্গীত-পরিচালক রামতারণ সান্যাল। এই রূপকনাট্যটি রচিত হয়েছিল কলকাতায় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে। 'মহাপূজা' দেখে নাট্যমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন। গিরিশচন্দ্র নটনটীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন সেই উপহার।

এই নাটিকা অভিনয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রকে স্টার থিয়েটার ত্যাগ করতে হয়। তারপর তাঁর নাট্যজীবনে প্রায় দু বছর বিরতি। আবার নতুন করে সে পট উঠল বিডন স্ট্রীটে নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবনির্মিত মিনার্ভা থিয়েটারে। নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র তাঁর নতুন ধারার অনুবাদ-নাটক 'ম্যাকবেথ' নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করলেন (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩)। এই পর্বে সঙ্গীতাচার্য-রূপে দেবকণ্ঠ বাগচী তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং 'ম্যাকবেথ' নাটকের সঙ্গীতপরিচালক-রূপে বাগচী মহাশয়। ডাকিনীদের তিনখানি গানে ('ধলা কালী কটা লালী', 'চল্ যাই চল্ যাই' ও 'তর্ তর্ তর্ তর্') তিনি চিত্তাকর্ষক সুর সংযোজনা করেছিলেন।

'ম্যাকবেথ' দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধনের আটদিন পরে এই মঞ্চে অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টিদৃশ্য-কাব্য 'মুকুল মুঞ্জরা।' জনসমাদৃত এই নাটকে যেমন উপভোগ্য হয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর 'বরুণচাঁদ' রূপে অভিনয় তেমনি 'তারা'র ভূমিকায় শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয় ও গান এবং 'চামেলি'র অংশে হরিসুন্দরীর গান। 'মুকুল মুঞ্জরা'র ৫খানি গানই রাগভিত্তিক এবং সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের মনোরঞ্জন করেছিল। তার মধ্যে বিশেষ কটি অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, যেমন 'কেন ফুল ফোটে কে জানে,' '(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি' ও 'ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায় ?'

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যনিবেদন 'আবু হোসেন' গীতিনাট্য। নাটিকাটির অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ অর্ধেন্দুশেখরের নামভূমিকায় অভিনয় এবং রাগে গঠিত ২৯টি গান। তার মধ্যে 'রোশেনা'-বেশিনী হরিসুন্দরীর গান এবং 'দাই' ও 'মশুর'-রূপে তিনকড়ি ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রাণুবাবু) দ্বৈত নৃত্যগীত অন্যতম বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল। গানগুলির সুরকার ও শিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী এবং নৃত্যপরিচালক রাণুবাবু।

তারপর 'সপ্তমীতে বিসর্জন' নামে গিরিশচন্দ্রের একটি শ্লেষাত্মক পঞ্চরং মিনার্ভায় (২২ আশ্বিন,১৩০০) মঞ্চস্থ হয়। এর ১০টি গানের গায়ক-গায়িকা ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী, ভূষণকুমারী, ভবতারিণী, হরিদাসী প্রভৃতি।

মিনার্ভায় পরবর্তী আকর্ষণ গিরিশচন্দ্রের অন্য এক শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'জনা'। বিচিত্র

রসসমন্বিত এই বিয়োগান্ত নাটকের সঙ্গীতসম্পদও উল্লেখযোগ্য। ১৭খানি গানের (একটি কীর্তন, অবশিষ্ট রাগভিত্তিক) মধ্যে অনেকগুলিই রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন 'ঘরে কি নাইকো নবনী' ইত্যাদি। গানগুলি গেয়েছিলেন হরিদাসী, শরৎকুমারী, অঘোরনাথ পাঠক প্রভৃতি এবং তিনকড়ি, যিনি এক বছর আগে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রাভিনয়ের পর জনার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর গৌরব লাভ করেছিলেন।

'জনা' উদ্বোধনের পরের দিন (১০ পৌষ, ১৩০০) মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং 'বড়দিনের বখশিষ্'। এই গীতিনাটিকার প্রধান আকর্ষণই ছিল ২০ খানি গান এবং তা গেয়েছিলেন রাণুবাবু, অঘোরনাথ পাঠক, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, হরিদাসী, হিঙ্গনবালা, হরিমতী, তিনকড়ি প্রভৃতি।

তার এক বছর পরে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের আর একখানি জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'স্বপ্নের ফুল' মঞ্চস্থ হল। তার রাগে-তালে গঠিত প্রায় ২০খানি গান শোনান তিনকড়ি, হিঙ্গনবালা, কুসুমকুমারী, ভূষণকুমারী প্রভৃতি।

মিনার্ভায় তার পরের অভিনয় গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং 'সভ্যতার পাণ্ডা'। এই সামাজিক শ্লেষাত্মক নাটিকার গানগুলিও উল্লেখযোগ্য এবং গেয়েছিলেন তিনকড়ি, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, তিতুরাম দাস, বামাচরণ সেন এবং আরো অনেকে। গিরিশচন্দ্র রচিত সেই ২০টি গানের মধ্যে ছয় ঋতুর ৬খানি গান এবং তিনকড়ির কণ্ঠে 'আমার হাসি চোখে ফাঁসি ভুবনমোহিনী' বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

তার প্রায় (৫ জ্যৈষ্ঠ,১৩০২) ৫ মাস পরে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত ভক্তিভাবের নাটক 'করমেতি বাঈ' মঞ্চস্থ হয়। তার ২২খানি রাগভিত্তিক গান মঞ্চে শুনিয়েছিলেন তিনকড়ি (নামভূমিকায়), কুসুমকুমারী (শ্রীকৃষ্ণ), ভূষণকুমারী প্রভৃতি। তিনকড়ি গেয়েছিলেন ৭খানি।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যোপহার 'ফণীর মণি'। এই গীতিনাট্য ২২টি গানে সম্পূর্ণ। গানগুলি গেয়েছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায় তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, হরিসুন্দরী, ভূষণকুমারী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এই মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং 'পাঁচ কনে' তার পরে অভিনীত হয়। তার প্রধান আকর্ষণই ছিল সঙ্গীত এবং সেই ১৫খানি বিচিত্র রসের গান গেয়েছিলেন তিনকড়ি, ভূষণকুমারী, হরিসুন্দরী, কুসুমকুমারী হেমন্তকুমারী, হরিমতী প্রভৃতি।

মিনার্ভায় প্রথম পর্বে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করবার সময় দেবেন্দ্রনাথ বসুর যে জনপ্রিয় পঞ্চরং 'বেজায় আওয়াজ' মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার প্রায় সব গানই গিরিশচন্দ্রের রচনা।

চার বছর পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটার নানা কারণে ত্যাগ করেন এবং পুনরায় স্টারে যোগ দেন। এবার এখানে 'নাট্যাচার্য' পদে বৃত হয়ে তাঁর নাট্যনিবেদন মঞ্চস্থ করেন বিখ্যাত 'কালাপাহাড়' (১১ আশ্বিন, ১৩০৩)। এই নাটকের ৬খানি গানের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাবাঈ এবং নরীসুন্দরী (সেকালের অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠা গায়িকা)।

স্টারে তার পর গিরিশচন্দ্রের 'হীরক জুবিলী' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। তার ১৬টি গানের মধ্যে অনেকগুলিই সমবেত সঙ্গীত। একক গানগুলি গেয়েছিলেন গঙ্গাবাঈ, বসন্তকুমারী, নগেন্দ্রবালা, হরিচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী গীতিনাট্য 'পারস্য প্রসূন বা পারিসানা' স্টারে (২৭ ভাদ্র, ১৩০৪) প্রথম মঞ্চস্থ হয়। গীতিনাট্য হিসাবে 'পারস্য প্রসূন' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এত অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ গিরিশচন্দ্রের 'বাসর', 'নন্দদুলাল' ও 'ব্রজবিহার' ভিন্ন তাঁর অন্য কোন গীতিনাটিকায় দেখা যায় না। গিরিশচন্দ্রের গানে রামতারণ সান্যালের সুরসৃষ্টি 'পারস্য প্রসূনে'র সম্পদবিশেষ। নায়িকা পারিসানার ভূমিকায় কোকিলকণ্ঠী নরী-সুন্দরীর গান গীতিনাটিকাটির প্রধান আকর্ষণ ছিল দর্শকদের নিকট। 'পারস্য প্রসূনে'র নৃত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ও নায়ক মুরুদ্দিন-রূপে গান গেয়েছিলেন। মোট ৩০খানি গানের বেশির ভাগেরই শিল্পী ছিলেন নরীসুন্দরী ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্টারের এই পর্বে গিরিশচন্দ্রের শেষ নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় 'মায়াবসান' (৪ পৌষ, ১৩০৪)। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই অভিনব সামাজিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র দুখানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। মঞ্চে সে দুটি পরিবেশন করতেন রঙ্গিনী ও বিন্দুর ভূমিকায় নরীসুন্দরী ও নগেন্দ্রবালা।

'মায়াবসান' অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন। তার কিছুকাল পরে তিনি এমারেল্ড মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দেন নাট্যাচার্যরূপে।

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের প্রথম নতুন নাট্যনিবেদন 'দেলদার' (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) মঞ্চস্থ হয়। এই গীতিনাট্যের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। দেলদারের গানের সংখ্যা অল্প নয়, মোট ২৩খানি এবং তার মধ্যে কয়েকটি রীতিমত সমাদৃত হয়েছিল, যথা পিয়াসা ও স্বপ্নসঙ্গিনীগণের 'কেমন ফুল পরেছে মেদিনী', দেলদার ও স্বপ্ন-সঙ্গিনীগণের 'অভিমান তার সাজে যে রাখতে জানে মান' (হাম্বির, পঞ্চম সওয়ারী) ইত্যাদি। গানগুলি গাইতেন স্বয়ং সঙ্গীতপরিচালক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (নেসা), নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (দেলদার), কুসুমকুমারী (পিয়াসা), ভূষণকুমারী (বীরা) প্রভৃতি।

ক্লাসিকে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নতুন নাটক তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান 'পাণ্ডব গৌরব'। সঙ্গীতগুণী জানকীনাথ বসু (সঙ্গীতজ্ঞ বৈকুণ্ঠনাথ বসুর পুত্র) এই বিখ্যাত নাটকের সঙ্গীতপরিচালক। নটী তিনকড়ি সুভদ্রার ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্যের সঙ্গে জানকীনাথের সঙ্গীতশিক্ষায় উৎকৃষ্ট গানও গেয়েছিলেন। তিনকড়ির কণ্ঠে 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী', কিংবা 'যতনে যে জন' গান সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের পরম উপভোগ্য হয়েছিল। উর্বশী ও উত্তরার চরিত্রে কুসুমকুমারী ও টুকুমণির গানও লাভ করেছিল জনসমাদর। কবি নবীনচন্দ্র সেন সস্ত্রীক এই অভিনয় দেখবার পর অমরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হয়েছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত শুনে আমরা দুজনে কেবল কেঁদেছি। গিরিশের আমরা গোলাম হয়ে রইলাম।"

'পাণ্ডবগৌরব' মঞ্চস্থ হবার পর গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং মিনার্ভা থিয়েটারের তৎকালীন সত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারের আমন্ত্রণে যোগ দেন মিনার্ভায়। এ যাত্রায় মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাট্যাকারে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হল। নাট্যরূপে কয়েকটি স্বরচিত সঙ্গীত যোগ করলেন গিরিশচন্দ্র। শ্রী ও জয়ন্তীর ভূমিকায় যথাক্রমে তিনকড়ি ও সুশীলাবালা সেই গান পরিবেশন করেন। সুধাকণ্ঠী সুশীলাবালার জয়ন্তী চরিত্রে অবতরণ ও গানই নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের ভিত্তি। তাঁর কণ্ঠে গিরিশচন্দ্রের 'উদার অম্বর, শূন্যসাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ'—সে সময়ে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিল।

'সীতারামে'র পরে গিরিশচন্দ্রের 'মনিহরণ' গীতিনাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভায় (৭ শ্রাবণ, ১৩০৭)। এই পৌরাণিক গীতিনাট্য ২৯খানি গানসমৃদ্ধ। দেবকণ্ঠ বাগচীর সঙ্গীত-পরিচালনায় গান গেয়েছিলেন সুশীলাবালা (শ্রীকৃষ্ণ), পান্না (রুক্মিণী), সত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকার (সূর্য), চারুশীলা (কুমার), হিঙ্গনবালা (জাম্বুবতী) প্রভৃতি।

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী গীতিনাটিকা 'নন্দদুলাল'। এইটি তাঁর সর্বাধিক সঙ্গীতসমৃদ্ধ নাট্যনিবেদন। 'নন্দদুলালে'র এই ৩২খানি গান গাইতেন অঘোরনাথ পাঠক, সুশীলাবালা, তিনকড়ি, পান্না, সরোজিনী, বসন্তকুমারী, হরিমতী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি নটনটী। কয়েকটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

'নন্দদুলাল' মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ত্যাগ করে ফিরে আসেন ক্লাসিক থিয়েটারে। এবারে এই মঞ্চে তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী অমৃতলাল দত্তকে (হাবু দত্ত) সুরকার ও সঙ্গীতপরিচালকরূপে লাভ করেন। হাবুদত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা, একই গৃহনিবাসী (প্রথমজীবনে) এবং দুজনেই একসঙ্গে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন বেণীমাধব অধিকারীর অধীনে। হাবু দত্তের তুল্য ক্ল্যারিওনেটবাদক সমসাময়িককালে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গীতগুণের জন্যে এবং স্বামীজীর আত্মীয় বলে তিনি গিরিশচন্দ্রের স্নেহভাজন ছিলেন।

এবার ক্লাসিকে এসে গিরিশচন্দ্র প্রথমে 'অশ্রুধারা' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষ্যে। সেটি ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয় ১৩ মাঘ, ১৩০৭ সালে। তার ৭টি গান অমৃতলাল দত্ত সুর-তালে গঠিত করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন কুসুমকুমারী একক ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি সমবেতকণ্ঠে।

এই মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক 'মনের মতন' তার পরে অভিনীত হয় এবং তার সুরকার-সঙ্গীতশিক্ষক দেবকণ্ঠ বাগচী। ২৪খানি গানসম্বলিত এই মিলনান্ত গীতিনাট্যের গীতিশিল্পী ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, কুসুমকুমারী, কিরণবালা, হরিমতী প্রভৃতি। নৃত্য-পরিচালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

তারপর (১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপে 'কপালকুণ্ডলা' মঞ্চস্থ

হল। তাতে কাপালিকের ভূমিকায় দুখানি ও শ্যামাসুন্দরীর জন্যে একখানি গান রচনা করে দেন এবং তা গেয়েছিলেন যথাক্রমে অঘোরনাথ পাঠক ও রাণীমণি।

এখানে পরবর্তী নাটক গিরিশচন্দ্র কর্তৃক রূপান্তরিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'। এর জন্যেও তিনি কয়েকটি নতুন গান যোগ করে দেন আর গাইতেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, কুসুমকুমারী প্রভৃতি।

তারপরে (১২ আশ্বিন, ১৩০৮) গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক গীতিনাট্য 'অভিশাপ' ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয়। এবারেও সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী। গীতিনাটিকাটির ২০ খানি গান গেয়েছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, তারাসুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি। এই গীতিনাট্যে নৃত্যপরিচালনা তথা নৃত্যশিক্ষাদান একজন নটীর দ্বারা প্রথম সম্ভব হয় এবং বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে সে গৌরব লাভ করেন কুসুমকুমারী। অনেক পরবর্তীকালে স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের যুগে নটী নীহারবালা এবিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের আর একটি (রূপক) গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয় বুয়র-যুদ্ধের ঘটনা কেন্দ্র করে। নাটিকাটির নাম 'শাস্তি' এবং তার সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী। কুসুমকুমারী প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীরা এতে ৫ খানি গান গেয়েছিলেন। এবারেও নৃত্যশিক্ষয়িত্রী কুসুমকুমারী।

গিরিশচন্দ্রের একটি উচ্চভাবের বিচিত্র নাটক 'ভ্রান্তি' তার পরে ক্লাসিকে অভিনীত হল। এই নাটকেরও সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচী এবং নৃত্য-পরিচালিকা কুসুমকুমারী। নাটকের ১৫ খানি গান শুনিয়েছিলেন কুসুমকুমারী, রাণীমণি, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি।

তার পরে গিরিশচন্দ্রের 'আয়না' নামে একটি সামাজিক নকসা ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয়। তার সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক হলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং ৮ খানি গান গাইলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শেষ নতুন নাটক (আওরঙ্গজেবের আমলে 'সৎনামী' সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত) 'সৎনাম' ১৮ বৈশাখ, ১৩১১ সালে অভিনীত হয়। সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী ও শশিভূষণ বিশ্বাস এবং নৃত্যপরিচালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। নাটকের জন্যে গিরিশচন্দ্র ১৪খানি গান রচনা করেছিলেন। মঞ্চে গানগুলি গাইতেন কুসুমকুমারী (বৈষ্ণবী), রাণীমণি (গুলসানা) এবং সমবেত কণ্ঠে আরো অনেকে। বেশির ভাগ গানই ছিল সম্মেলক। নাটকটি সঙ্গীত ও বিচিত্র চরিত্রাবলীর অভিনয়ে সার্থক হবার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু চতুর্থ রাত্রি থেকেই মুসলমান জনতার আপত্তিতে 'সৎনামে'র অভিনয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। তার কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার থেকে পুনরায় যোগদান করেন মিনার্ভায়, সেখানকার পরিচালক চুনীলাল দেবের উদ্যোগে।

এবার মিনার্ভায় তাঁর নতুন গীতিনাট্য 'হরগৌরী' শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রচিত ও মঞ্চস্থ হয় (২০ ফাল্গুন, ১৩১১)। সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত) এবং নৃত্য-পরিচালক সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। গীতিনাটিকাটি ২৮খানি গীতে সমৃদ্ধ। কিরণবালা (মদন), তারাসুন্দরী (গৌরী), সরোজিনী (পৃথিবী), ফিরোজাবালা (রতি),

নগেন্দ্রবালা (মেনকা), মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু-নারদ), ননিলাল বন্দোপাধ্যায় (গণেশ) প্রভৃতি নটনটীরা সঙ্গীতপরিবেশনে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করতেন। গানই 'হরগৌরী'র প্রধান সম্পদ, একথা বলা বাহুল্য। তার মধ্যে মেনকার ভূমিকায় নগেন্দ্রবালার কণ্ঠে 'জামাই নাকি শ্মশানবাসী' এবং 'এসেছিস ত থাকনা উমা' গান দুখানি শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ মনোমুগ্ধকর হয়েছিল।

তারপর গিরিশচন্দ্রের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'বলিদান' মঞ্চস্থ হল (২৬ চৈত্র, ১৩১১) মিনার্ভায়। এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকটির অসাধারণ সাফল্যের কথা সুবিদিত। সেই সঙ্গে স্মরণীয়, নাটকের ৮খানি গানের মধ্যে জোবির ভূমিকায় ৬টি উচ্চশ্রেণীর গান। বলিদানের উচ্চ গ্রামে বাঁধা ট্র্যাজিক সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোকিলকণ্ঠী সুশীলাবালা এই মর্মস্পর্শী গান কখানি গাইতেন। তাঁর অনুপম কণ্ঠে 'উলু নয় রোদনধ্বনি,' 'কলিতে অমর কনের শাশুড়ি,' 'কলঙ্ক যার মাথার মণি', 'কোথা হে মধুসূদন' প্রভৃতি গান বাংলার নাট্যশালায় সঙ্গীতসম্পদরূপে গণনীয়। গানগুলিকে যথোযোগ্য রাগে-তালে গঠিত করেছিলেন রাগসঙ্গীতের প্রসিদ্ধ গুণী বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

বলিদানের পর গিরিশচন্দ্রের আর একখানি যুগান্তকারী নাটক 'সিরাজদ্দৌলা।' এই ঐতিহাসিক নাটকটিও অসাধারণ মঞ্চসফল হয়েছিল। বহু নটাকীয় চরিত্রে পূর্ণ এবং স্মরণীয় অভিনয়-ধন্য সিরাজদ্দৌলাকেও সঙ্গীতবর্জিত রাখেননি গিরিশচন্দ্র। নাটকটির সঙ্গীতবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শশিভূষণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়। ১০ খানি গান রচনা করে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা'য় সংযোগ করেছিলেন। তার মধ্যে নর্তকীগণ, বন্দীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতির সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হত ৬টি গান। লুৎফুন্নিসা-রূপিণী সুশীলাবালা ৪খানি গান শোনাতেন এবং উম্মৎ জহুরার ভূমিকায় সুবাসিনী একটি গান গাইতেন।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যনিবেদন 'বাসর'। এমন বিপুল সংখ্যায় গীত গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নন্দদুলাল' ভিন্ন অন্য কোন গীতি-নাটিকায় সন্নিবিষ্ট করেননি। ৩১ খানি গানে সমৃদ্ধ এই গীতপ্রধান নাটকের সুর সংযোজক ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। নাটকের বেশির ভাগ গান বিম্বাবতীর ভূমিকায় সুশীলাবালা এবং বাদ্যকর-চরিত্রে হরিদাস দত্ত গেয়েছিলেন। কয়েকটি গান গীত হয় সমবেত কণ্ঠে।

'বাসর' গীতিনাট্য প্রথম মঞ্চস্থ হবার দেড়মাস পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' (২৯ মাঘ, ১৩১২) মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রায় ২৮ বছর আগে গ্যাশনাল থিয়েটারের (প্রতাপ-চাঁদ জহুরীর মালিকানার আগে, সাব-লেসী তখন কেদারনাথ চৌধুরী) জন্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র। সেকালে তাঁর নেতৃত্বে সেই অভিনয়ে বিনোদিনী 'আয়েষা' ও 'তিলোত্তমা' দুটি ভূমিকাতেই অবতীর্ণা হতেন। গিরিশচন্দ্র তখন 'জগৎসিংহ' এবং মহেন্দ্রলাল বসু 'ওসমান'। সে নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি না থাকায় গিরিশচন্দ্র আবার নতুন করে এখন 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটক রচনা করলেন। কয়েকটি নতুন দৃশ্যের সঙ্গে কয়েকখানি নতুন গানও যোগ করে দিলেন নাটকে। এবার অসাধারণ অভিনয়ের সঙ্গে গানও 'দুর্গেশনন্দিনী'র

আকর্ষণের বস্তু হল। এই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দানীবাবুর 'ওসমান' এবং তারাসুন্দরীর 'আয়েষা' তাঁদের নাট্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'বিদ্যাদিগ্‌গজ', গিরিশচন্দ্রের 'বীরেন্দ্রসিংহ', তিনকড়ির 'বিমলা' এবং তারকনাথ পালিতের 'জগৎসিংহ'ও দর্শকদের প্রশংসাধন্য হয়েছিল। নাটকের গানের জন্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন 'তিলোত্তমা'র (দ্বিতীয় রজনী থেকে) ভূমিকায় সুশীলাবালা এবং 'আয়েষা' চরিত্রে তারাসুন্দরী। আয়েষার 'যার ছবি দিবানিশি' গানখানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

'দুর্গেশনন্দিনী'র চারমাস পরে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের আর একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাসিম'-এর উদ্বোধন হয়। একাদিক্রমে সাত মাস প্রতি শনিবারে মঞ্চস্থ হয়ে নাটকটি 'সিরাজদ্দৌলা'কেও অতিক্রম করে জনপ্রিয়তায়। মিনার্ভা থিয়েটার এ বছরে লক্ষাধিক টাকা 'মীরকাসিমে'র জন্যেই আয় করেছিল বলে প্রকাশ। তারপর ১৯১১-তে গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞায় নাটকটির অভিনয় ও প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। নামভূমিকায় দানীবাবু, মীরজাফর-রূপী গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অসামান্য অভিনয়-গুণের সঙ্গে 'বেগম'-বেশিনী সুশীলাবালা এবং 'তারা' চরিত্রে তিনকড়ির গানও দর্শকদের পরিতৃপ্ত করত। নাটকে গিরিশচন্দ্রের সব গানগুলির সুরকার-সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তারাপদ রায়।

'মীরকাসিমে'র পর মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের নতুন নাট্যনিবেদন (মলেয়ার অবলম্বনে) 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসন (১৭ পৌষ, ১৩১৩) মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়াংশে অর্দ্ধেন্দুশেখর ও দানীবাবুর সঙ্গে সুশীলাবালার গান বিশেষ উল্লেখণীয়। জনসমাদৃত এই নাটিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ সুশীলাবালা অভিনীত 'গরব' ভূমিকাটি। তাঁর অভিনেত্রী জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই চরিত্রের অভিনয়। ৫খানি গানেও তিনি কৃতিত্ব দেখাতেন। নাটকের সাকুল্যে ১৫টি গানের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। একটি ছোট ভূমিকাতেও বাগচী মহাশয় মঞ্চে প্রবেশ করতেন। অন্যান্য গান শোনাতেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ('মাণিক') ও ভূষণকুমারী ('রতন')।

তারপর গিরিশচন্দ্রের অন্য একখানি অসামান্য ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'র মিনার্ভায় উদ্বোধন হল (৩২ শ্রাবণ, ১৩১৪)। মিনার্ভায় প্রথম মঞ্চস্থ হবার তিন সপ্তাহ পরে (এমারেল্ড থিয়েটারে নবপ্রতিষ্ঠিত) কোহিনূর থিয়েটারেও 'ছত্রপতি শিবাজী'র অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। শক্তিশালী নাটকটির একই সঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালায় অভিনীত হওয়ার ফলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় অভিনয়জগতে। তা ছাড়া সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'ছত্রপতি শিবাজী' শুধু বাংলার নাট্যমঞ্চে নয়, বৃহত্তর জাতীয় জীবনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই নাটকটিও বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সঙ্গীতবিষয়ে 'ছত্রপতি শিবাজী'র প্রাসঙ্গিক তথ্য হল—সুরকার-সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী ও তারাপদ রায়; গানের সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও নাটকের ভাবোচিত হয়েছিল।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্য-অর্ঘ: তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 'শাস্তি কি শান্তি' (২২ কার্তিক, ১৩১৫)। দানীবাবুর 'প্রসন্নকুমার' চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় এ নাটকের প্রধান আকর্ষণ। তার পরেই উল্লেখযোগ্য 'হরমণি'র কঠিন ভূমিকায় সুশীলাবালার সুনিপুণ অভিনয় এবং সেইসঙ্গে গানও। নাটকের মোট ৭খানি গানের মধ্যে ৪টি গান সুশীলাবালা গাইতেন, বাকি গান সমবেত কণ্ঠে গীত হত। সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী।

তার পরের বছর গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হল। এই ধর্মমূলক নাটকে তিনি ১৬খানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। গানগুলিতে সুর-সংযোগ করে শিক্ষা দেন দেবকণ্ঠ বাগচী। বেশির ভাগ গানই সম্মেলক। 'মহামায়া'র ভূমিকায় রাজবালা এবং 'কামকলা'-রূপে চারুশীলা যথাক্রমে ৪খানি ও একখানি গান একক গাইতেন। তার মধ্যে মহামায়ার 'পরলে পরে সাধের বাঁধন' গানটি উল্লেখণীয়।

'শঙ্করাচার্য' উদ্বোধনের একবছর পরে গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়। ঐতিহাসিক নাটকে গানের সংখ্যা ১৬টি এবং সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী। অভিনয় সব চেয়ে মর্মস্পর্শী হয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বীতশোক' এবং সুশীলাবালার 'কুনাল'। শেষোক্ত ভূমিকায় সুশীলাবালার গানও উল্লেখ্য। নাটকের অন্যান্য গানগুলি শোনাতেন শশিমুখী ('মহেন্দ্র'), চারুশীলা ('চিত্তহরা'), ফিরোজাবালা ('সঙ্ঘমিত্রা'), নীরদাসুন্দরী ('কাঞ্চনবালা') প্রভৃতি।

'অশোক' মঞ্চস্থ হবার পরের বছরে গিরিশচন্দ্রের শেষ পৌরাণিক নাটক 'তপোবল' মিনার্ভায় (অগ্রহায়ণ ২, ১৩১৮) অভিনীত হয়। নাটকটি বারাণসীতে রচিত এবং এ সময় তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন স্বাস্থ্যলাভের জন্যে। নাটকে তিনি ১৪খানি গান রচনা করে দেন। সুরকার-সঙ্গীতশিক্ষক তখনো দেবকণ্ঠ বাগচী। ইতোমধ্যে সুধাকণ্ঠী গায়িকা নরীসুন্দরী মিনার্ভায় যোগ দিয়েছিলেন ('চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে প্রথম 'ছায়া' চরিত্রে অবতরণ করবার জন্যে)। 'তপোবলে' 'বেদমাতা'র ভূমিকায় তিনি সঙ্গীতের জন্যে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন। অন্যান্য গানগুলি গাইতেন চারুশীলা ('রম্ভা'), সরোজিনী ('মেনকা') মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু—'সদানন্দ'র ভূমিকায়), নীরদাসুন্দরী ('ব্রহ্মণ্যদেব') প্রভৃতি। 'তপোবল'ই গিরিশচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ নাটক। তাঁর মৃত্যুর পরে মঞ্চস্থ 'গৃহলক্ষ্মী' অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল; তাঁর আত্মীয় এবং নাট্যকার দেবেন্দ্রনাথ বসু তার পঞ্চম অঙ্ক লিখে দিয়ে তা সম্পূর্ণ করেছিলেন। 'গৃহলক্ষ্মী'র চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত রচনা করে গিরিশচন্দ্র তাতে গান দিয়েছিলেন ৫খানি। মিনার্ভায় (৫ আশ্বিন, ১৩১৯) প্রথম অভিনীত এই নাটকে সেই গানগুলি শোনান 'কুমুদিনী'র ভূমিকায় চারুশীলা এবং 'ফুলী' চরিত্রে নীরদাসুন্দরী।......

সেকালের নাট্যশালায় গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীতের অবদানের এই হল সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। গুণে ও পরিমাণে, ভাববৈচিত্রে ও নানা রসের আবেদনে তাঁর সঙ্গীতসম্পদ তাঁর নাট্যসৃষ্টির অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। সঙ্গীত বর্জিত হলে তাঁর নাটকের উপভোগ যে ব্যাহত

হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটে পরম আনন্দ ও আকর্ষণের বস্তু ছিল তাঁর গীতাবলী। তাঁর অনেক গানই বহু প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে রচিত গিরিশচন্দ্রের বিপুল সঙ্গীতসম্ভারের মূল্য আর একদিক থেকেও বিবেচ্য। সেকালের নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং গায়কগায়িকা নট-নটীবৃন্দ তাঁর গান অবলম্বনে আপন আপন প্রতিভার ক্ষেত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত সঙ্গীতপ্রচেষ্টা তৎকালীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সঙ্গীতধারার নবজাগৃ পর্বের অংশ হিসাবে গণনীয়। কারণ গিরিশচন্দ্র-রচিত এবং শিক্ষিতপটু সুরকারদে পরিকল্পিত অধিকাংশ গানই ছিল রাগপদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ২

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯১—১৯৫২ খ্রী)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ২
১৩৭৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবজ্যোতি দাশ

বঙ্গদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবজাগরণ ও ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে আরোপ করিয়া বিরলসঙ্গ প্রয়াসে তাহার সার্থক রূপায়ণ নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়তার দাবি করিতে পারে। সাহিত্যের আসরে গুণগ্রাহিতার অভাব নাই, ইতিহাসের গবেষণায় দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠাও দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই অবিরত শ্রম ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ পাঠকের স্মৃতিতে আশানুরূপ দীর্ঘজীবিতা লাভ করেন নাই। তাঁহার প্রচেষ্টায় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে, রাজন্যবর্গের বংশাবলীর পরিবর্তে কৃতকর্মা সাহিত্য-সুরিগণের জীবনবিচারের সূচনা ঘটিয়াছে, বাঙ্গালীর চিন্তাধারার নবোন্মেষ সম্বন্ধে আলোচনার বনিয়াদ দৃঢ়তর হইয়াছে। কিন্তু সুলভ ভাবপ্রবণতার ধারা বর্জন করিয়া সত্যনির্ভর তথ্য-প্রমাণ অনুসরণের কৃতিত্ব সুধিসমাজেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে; তরল কাহিনীর রসাভিলাষী জনচিত্তে ব্রজেন্দ্রনাথের আসন স্থায়ী হয় নাই।

ব্রজেন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৫ আশ্বিন তারিখে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়; এই পুস্তিকায় 'আত্ম-পরিচয়' শিরোনামায় ব্রজেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে নিজের জীবনেতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুর পর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ সুধিবৃন্দ ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের নানা অধ্যায় ও তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সুশীল রায় তাঁহার 'স্মরণীয়' গ্রন্থের (১৩৬৫ ভাদ্র) অন্তর্ভুক্ত 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থের (১৩৬৩ আষাঢ়) অন্তর্গত 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে, শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার 'সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, ১৩৫৯ কার্তিক, পৃ. ৪৭) এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'ব্রজেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, ১৩৫৯ কার্তিক, পৃ. ৩৪-৩৫) ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করেন। তাঁহার জীবনী ও সাহিত্যকর্ম আলোচনায় এগুলির উপর নির্ভর করা হইয়াছে।

জন্ম ও বাল্যজীবন

ব্রজেন্দ্রনাথ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৫ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খ্রী) তারিখে হুগলি শহরের বালি পল্লীর অন্তর্গত কাঠগড়া লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্র তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মাতার নাম হেমাঙ্গিনী দেবী[১]। ব্রজেন্দ্রনাথ (ডাকনাম 'মেনি') মাতাপিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মাত্র ১ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্রের প্রাণবিয়োগ হয়। মাতা ও বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্নেহ ও বাৎসল্যে তাঁহার বাল্যকাল নির্বাহ হইতে থাকে। উত্তরকালীন বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার বাল্যে ব্রজেন্দ্রনাথের অন্যতম ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের শরীর বাল্য ও কৈশোরে বিশেষ সবল ছিল না ; কিছুটা সেজন্য এবং কিছুটা বোধ হয় জননী ও ভগিনীর অতিরিক্ত স্নেহজনিত নিষেধের বাধায় বাল্য ও কৈশোরে তিনি অন্যান্য সাথীদের মত চঞ্চল দৌরাত্ম্য ও শ্রমসাধ্য ক্রীড়ায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে।

শিক্ষা

ব্রজেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর হইতেই সংসারে অর্থের অকুলান ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৃষীকেশ ও মধ্যম ভ্রাতা দেবীচরণের স্কন্ধে সংসারনির্বাহের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁহাদের তৎকালীন উপার্জন পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষা হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বাল্যে প্রথমে হুগলির বড়ালদের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক পাঠের পর তিনি ব্যাণ্ডেল কনভেণ্টের সংলগ্ন ইঙ্গ-বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে বৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত এবং তাহার পরে চুঁচুড়ার ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনে ৪র্থ হইতে ২য় শ্রেণী (পরবর্তী কালের ৭ম হইতে ৯ম শ্রেণী) পর্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পারিবারিক বিত্তহীনতা বিবেচনায় শেষোক্ত বিদ্যালয়ে তাঁহাকে অবৈতনিক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথকে চিরতরে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিরতি ঘটাইতে হয়।

অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং অন্যতমা অগ্রজার স্নেহচ্ছায়ে থাকিয়া ক্যান্‌স্ ফোনেটিক স্কুলে টাইপ করিতে শেখেন। মাতুলপুত্র সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট তিনি সংক্ষিপ্ত লিপি (শর্ট-হ্যাণ্ড) শিক্ষা করেন।

প্রথাগত শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও নানাস্থানে টাইপ ও শর্ট-হ্যাণ্ডের কাজ করিতে করিতে অবসর সময়ে গৃহে ও গ্রন্থশালায় অধ্যয়ন করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ ক্রমে ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেন। যদুনাথ সরকার ও রাজশেখর বসুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তাঁহাদের বহু গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ নিখুঁত প্রুফ-সংশোধনেও দক্ষ হইয়া ওঠেন।[২]

---

১. ব্রজেন্দ্রনাথের মাতার নাম ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৃষীকেশের দৌহিত্র শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের নিকট প্রাপ্ত।

২. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬

চাকরি

মাত্র ১৭ বৎসর বয়স হইতেই মাতৃপিতৃহীন ব্রজেন্দ্রনাথকে স্বীয় ভরণপোষণার্থে চাকরিজীবী হইতে হয়। হুগলি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিবার ৬ মাসের মধ্যেই এবং টাইপ করিবার কার্যে সামান্য দক্ষতা জন্মাইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ কাওয়ান নামক এক ইহুদী ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে সাধারণ একটি পদে নিয়োগ লাভ করেন। অবসর সময়ে টাইপ ও শর্ট-হ্যাণ্ড শিক্ষা চলিতে থাকে। ঐ দুই বিষয়ে পারদর্শিতার দৌলতে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যাণ্ড কোম্পানি, জে. বি. নর্টন অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রভৃতি নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি টাইপিস্ট ও দ্রুতলিপিকের পদে চাকরি করেন। ইতিমধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় সাহিত্যচর্চার পরোক্ষ ফলস্বরূপ এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির প্রথমদিকে তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাদ্বয়ের অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন; এই পদেই তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শেষদিক হইতে তিনি মুখ্যতঃ 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদকের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার 'প্রবাসী'-সম্পর্কিত কাজকর্মও যথেষ্ট ব্যাহত হইয়াছিল।[৩] শেষোক্ত কর্মস্থলেই অন্যতম সহকর্মী সজনীকান্ত দাসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়; অবশ্য প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন চাকরিঘটিত কারণে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল।[৪,৫]

বিবাহ ও সাংসারিক জীবন

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৩ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর ১৯০৯ খ্রী) তারিখে চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার অধিবাসী মহেন্দ্রনাথ হালদারের কন্যা বীণাপাণি দেবীর সহিত ব্রজেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহ উপলক্ষে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রীতিজ্ঞাপক কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

বীণাপাণি দেবী ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত বহু গ্রন্থের স্বত্ব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান করিয়াছিলেন। মূলতঃ তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 'ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল' স্থাপিত হয়; ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেলে নূতন সংস্করণ মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহ করা।

ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নে বীণাপাণি দেবী মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং একাধিকবার তাঁহাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিতে হয়।

৩. 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' (বিবিধ প্রসঙ্গ), প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ১৬

৪. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১-১৩২ এবং ১৫৪

৫. পরিমল গোস্বামী, 'আমি যাঁদের দেখেছি', কলিকাতা ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩৭-২৩৮

ব্রজেন্দ্রনাথের উৎসাহে বীণাপাণি দেবী ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় কর্মজীবনের প্রারম্ভে ৫৩ চুনাপুকুর লেনের মেসে ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া ৪৮।২।২ বলরাম দে স্ট্রীট, ১৩ বেথুন রো, ২২২ আপার সার্কুলার রোড, ২৯ মোহনবাগান রো প্রভৃতি ঠিকানার ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘদিন কাটাইবার পর বেলগাছিয়ায় ৫৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে পত্নীর নামে নবনির্মিত বাসভবনে তিনি শেষজীবন যাপন করেন। চোখে ছানি পড়ায় ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ব্যাহত হয় এবং তাঁহার গবেষণাকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে অস্ত্রোপচারের পর তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান।

ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় মিতব্যয়ী হইলেও গবেষণাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে তাঁহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না; ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিলেও তাঁহার অকাতর দানের পরিমাণ কম নহে।

ব্রজেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যকর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে লঘু সাহিত্যের সুগম পথে। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা 'স্বপ্ন-প্রসঙ্গ' ১৩১৬ বঙ্গাব্দে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের উৎসাহে কবি গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী কর্তৃক সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্যতীত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র ও জলধর সেনও ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহিত্যচর্চায় আবশ্যকমত উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্য দান করিতেন। অমূল্যচরণের প্রেরণা ও দৃষ্টান্তে ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-নির্ভর প্রবন্ধ লিখনে আগ্রহী হন। কিন্তু সত্যকার গবেষণা ও ইতিহাস-রচনার মূলনীতি ও পদ্ধতির শিক্ষা তিনি মুখ্যতঃ ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে যদুনাথ সরকারের নিকটেই লাভ করেন। তাহার পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল ইতিহাসমুখী প্রবন্ধাদি তিনি রচনা করেন সেগুলিতে প্রকৃত ইতিহাসের তথ্যের যাথার্থ্য প্রায়শঃই লঘু কাহিনীর মিশ্রণে ও লোকপ্রচলিত গল্পের প্রাধান্যে লঙ্ঘিত হইয়াছিল এবং ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথাগত শিক্ষার অভাবই এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল।

তাঁহার সাহিত্যজীবনকে চারিটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়—১৩১৬ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৩২১ হইতে ১৩৩৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়, তাহার পর হইতে ১৩৪৬ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায় এবং তাহার পর মৃত্যু পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়, মোটামুটি এরূপ বিচার করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁহার রচনাগুলি কাহিনীপ্রধান এবং বহুক্ষেত্রেই সেগুলি তথ্যনির্ভরতার দাবি করিতে অপারক; গল্প, কবিতা, অনুবাদ প্রভৃতির পাশাপাশি ঐতিহাসিক রচনার লঘু প্রয়াস রম্য রচনার অতিরিক্ত কোনও স্বীকৃতি প্রত্যাশা করিতে পারে না। বিষয়বিশেষে মনঃসংযোগের পরিবর্তে বহু বিষয়ে চঞ্চল পাদচারণা এই পর্যায়ের সাহিত্যরচনার অভিজ্ঞান। এ-সময়ে

তাঁহার মনোযোগ অনেকাংশে ব্রিটিশ-পূর্ব বঙ্গদেশের নবাবী আমলের এবং দিল্লীর বাদশাহী আমলের প্রাসাদ-অন্তঃপুরের লোকরঞ্জক কাহিনীতেই আবদ্ধ। চিত্রাঙ্কনের সারল্য ও গভীরতার ভারবর্জন এ-ধরনের রচনাকে সাময়িক লোকপ্রিয়তার অধিকারী করিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘজীবী সাহিত্যখ্যাতির মর্যাদা মরীচিকার মতই দুর্লভ রহিয়া যায়।

প্রথম পর্যায়ে রচিত 'বাঙ্গলার বেগম' পুস্তকটির আলোচনায় ঐতিহাসিক সারবত্তা সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের বিরূপ মন্তব্যই ব্রজেন্দ্রনাথকে কাহিনীপ্রধান রচনার পরিবর্তে ইতিহাসের তথ্যালোচনায় আগ্রহী করিয়া তোলে। ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে স্বয়ং যদুনাথ সরকারের নির্দেশের অধীনে ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-রচনার তথ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি, সরকারি নথিশালা, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগার প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রামাণ্য ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত ঘটে, সমুদ্রপারের ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষিত মূল পত্রপত্রিকা, দলিল, প্রত্নবস্তু ইত্যাদির আলোকচিত্র, প্রতিলিপি, অনুবাদ প্রভৃতি সংগ্রহের কার্য চলিতে থাকে। ইতিহাস-বর্ণনায় নিজ তথ্যনিরপেক্ষ মতামতের অনুপ্রবেশ নিবারণ এবং প্রমাণপ্রাপ্তিমাত্রে নিজ ভ্রান্ত পূর্বমত প্রত্যাহার বা সংশোধন—বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-আলোচনার এই দুই অপরিহার্য নীতি এ-সময়েই ব্রজেন্দ্রনাথের আয়ত্তে আসে।

বস্তুতঃ তাঁহার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকেই ১৩২২ বঙ্গাব্দে যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেব-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-রচনার প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার নবলব্ধ ধারণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন; প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধটিতে তিনি প্রামাণিক রচনার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও বিচার, যথাসম্ভব সমসাময়িক সূত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, তথ্যের জন্য অনূদিত গ্রন্থ অপেক্ষা মূল গ্রন্থের উপর নির্ভর করার ঔচিত্য, অবিরত ব্যক্তিগত ভ্রমসংশোধনের প্রয়াস, প্রত্যেক তর্কসাপেক্ষ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিস্তারিত ও নির্ভুল প্রমাণপঞ্জী প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[৬] ইহা হইতেই তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্রুত অগ্রগতি উপলব্ধি করা যায়। অচিরেই ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাঙ্গলার বেগম' গ্রন্থটির পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যদুনাথ সরকার লঘু কাহিনীবর্ণনা হইতে তথ্যনির্ভর ইতিহাস-রচনায় উত্তরণের এই সফল প্রয়াসটিকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন; তাঁহার উক্তি হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার মধ্যে প্রভেদ প্রকট হইবে:

> "'বাঙ্গলার বেগমে'র সেই নামই রহিল, কিন্তু পুনর্জন্ম হইয়াছে। এবার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর, লেখক ইতিহাস রচনার ঠিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া, গ্রন্থের বিষয়টি আবার অনুশীলন করিয়াছেন,—প্রত্যেক ঘটনা ও মত সম্বন্ধে বিদ্যমান প্রমাণগুলি পরীক্ষা করিয়া সত্য-নির্ধারণ করিয়া, পুস্তকখানি আগাগোড়া নূতন করিয়া লিখিয়াছেন; সমস্ত পূর্বতন

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঔরঙ্গজেব', ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২২, পৃ. ৭১৪-৭২০

পরিশ্রমের ফল অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন ; —ইহা কম সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। পাদটীকায় বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ-পঞ্জী দেওয়াতে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থকারের উক্তির ভিত্তি পরীক্ষা করা সহজ হইবে।...শত বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি যে সত্যলিপ্সার ক্রমোন্নতি-স্পৃহার এবং নির্ব্বাক শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান ; তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ।"[৭]

নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ এই সময়েই প্রকাশিত হয় (১৩২৪ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে উক্ত সংস্করণে কৃত পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের জন্য গ্রন্থকার নিখিলনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের কিছু কিছু সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এ-ভাবেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়টি গড়িয়া ওঠে। এই পর্যায়েও তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে মোগল-যুগের ইতিহাস আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু প্রথম পর্যায়ের তুলনায় এই পর্যায়ের পুস্তক ও প্রবন্ধে তথ্যের প্রাচুর্য, বিশ্লেষণের সারবত্তা এবং কথিকার স্বল্পতা লক্ষণীয়। অবশ্য মারাঠা-অভ্যুত্থানসহ মোগল-যুগের ইতিহাসের নির্ভুল আলোচনায় যে-সকল প্রামাণ্য নথিপত্র, দলিল ও রাজবার্তা মূল ভাষাতেই পাঠ করিয়া বিচারের প্রয়োজন, সেগুলি পাঠ করিবার মত ভাষাজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনাথের ছিল না ; নূতন করিয়া ফারসী, মারাঠী, উর্দু এবং আরবী ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করাও সময়সাপেক্ষ ছিল। অংশতঃ এইজন্যই বোধ হয় ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার গবেষণা ও রচনার বিষয়বস্তু ও যুগ পরিবর্তন করিয়া ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের আন্দোলনে পথিকৃৎদের জীবন আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন ; সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিকে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গবেষণা ও প্রবন্ধরচনায় তাঁহার এই বিষয়-পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথের মনোযোগ উত্তরোত্তর গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে নিয়োজিত হইতে থাকিলেও এ-সময়ে কিছু কিছু শিশুপাঠ্য ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার কার্যেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দে 'খোকা-খুকু'[৮] নামক শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহু ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। কাহিনীগুলির পরিবেশনে ব্রজেন্দ্রনাথের চিত্তাকর্ষক লিখনভঙ্গী ও ভাষার সরস সাবলীলতা বালক ও কিশোর পাঠককুলের মনোহরণ করিয়াছিল। এ-সকল লঘু সাহিত্য রচনায় তাঁহার লিখনশৈলী ও ভাষার উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল :

> "সুবাদার আমীর খাঁ দেখিলেন গতিক বড় মন্দ। আফঘানরা যে ক্রমেই দলে ভারি হইতেছে ! একবার তো যুদ্ধ করিয়া হার হইয়াছে ; লোকজনও বড় কম সাবাড় হয় নাই। আবার যদি জোট বাঁধিয়া ব্যাটারা হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে, তাহা

৭. যদুনাথ সরকার, 'বাঙ্গলার বেগম', ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭

৮. 'খোকা-খুকু', প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বৈশাখ, সম্পাদক : ১ম বর্ষ—সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ২য় বর্ষ—নিশিকান্ত সেন

হইলে কি হইবে, কে জানে! আমীর খাঁর একজন খুব হুঁশিয়ার চালাক কর্মচারী ছিল; নাম তার—আবতুল্লা। আমীর খাঁ তার সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে বসিয়া গেলেন। অনেক পরামর্শের পর মতলব ঠিক হইলে আবতুল্লা এক মজার কাণ্ড করিলেন; তিনি আফঘানদের এক এক গোষ্ঠীর সর্দ্দারদের তাঁবুতে এক একখানা চিঠি পাঠাইলেন।"[৯]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যলিপ্সার যে ধারাটি ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণামূলক রচনায় অনুসৃত হইয়াছিল তাহার প্রভাব ক্রমশঃ তাঁহার ঐতিহাসিক গল্পগুলিতেও পরিলক্ষিত হইতে থাকে; তথ্যনিষ্ঠা ও রসবোধের সমঞ্জস সমন্বয়ে ক্রমে এই কাহিনীগুলিও প্রকৃত ঘটনার রমণীয় বিবরণে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে প্রকাশিত 'মোগল-পাঠান' নামক গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় যদুনাথ সরকার ইহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন:

"ইতিহাসের কোন সত্যই নষ্ট না ক'রে আর মন-গড়া ঘটনা ও কথাবার্ত্তার বুক্‌নি না দিয়ে, কেমন ক'রে ইতিহাস-বিখ্যাত লোকদের গল্প মিষ্টি ক'রে লেখা যায়, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ 'মোগল-পাঠান' নামের এই গল্প-সংগ্রহে দেখিয়েছেন।"

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শোভাবাজারের রাজবাটির গ্রন্থশালায় 'সমাচারদর্পণ'-এর পুরাতন সংখ্যাগুলি ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে পড়ে। এগুলির পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে সাহিত্য, সমাজজীবন ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ও বিপ্লবের ইতিহাসের উপকরণ ব্রজেন্দ্রনাথ সনাক্ত করেন। মোগল-পাঠানের রাজ-ইতিহাস রচনায় অকারণ কালক্ষেপ না করিয়া পুরাতন সাময়িকপত্রের নীরব অথচ দীর্ঘ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শতাব্দীশেষে এদেশের সামাজিক জীবন, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনাই অতঃপর তাঁহার গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু হইয়া ওঠে। সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতিহাস আলোচনার যে-ধারা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল, এই তৃতীয় পর্যায়ে ইতিহাসের অচিন্তিতপূর্ব অধ্যায়ের তথ্যসংকলনে তাহার সার্থক প্রয়োগ ঘটে। শেষোক্ত পর্যায়ে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পুরাতন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজ, সাময়িকপত্র, নাট্য-আন্দোলন প্রভৃতির ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এ-সময়ের প্রধান চারটি গ্রন্থ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', 'বাংলা সাময়িক-পত্র' এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ইংরেজ-প্রভাবের আদিযুগ হইতে বঙ্গসমাজের বিবর্তনের প্রথম প্রামাণিক বিবরণ। ইহারই পাশাপাশি চলিতে থাকে সাহিত্যসেবীদের জীবনচরিত ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের মাধ্যমে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা। নানা পত্রপত্রিকায় বহু সাহিত্যসেবীর জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তৃতীয় পর্যায়ের শেষভাগে তাঁহার সম্পাদনায় বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সিরিজে প্রকাশিত হইতে থাকে।

সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থরচনায়

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বুদ্ধির বহর', খোকা-খুকু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ৪৯

আরও সংহত হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রধান আগ্রহ ছিল সাহিত্যকারদিগের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে। তাঁহার এই গবেষণার সার্থক পরিণতি 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সিরিজের অন্তর্গত শতাধিক সাহিত্যসেবকের জীবনচরিত ও গ্রন্থপঞ্জী রচনায়।

ব্রজেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের রচনাগুলির বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধারা পর্যালোচনা করিলে তাঁহাকে এক নূতন ইতিহাসচিন্তার পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। এ-প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "ইংরেজী বিদ্যা শিখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে ইতিহাস মানে শুধু রাজা-রাজড়ার কীর্তি বা অকীর্তি, যুদ্ধ আর অসংখ্য সনতারিখ। ব্রজেন্দ্রনাথ এই মোহ কাটিয়ে উঠে স্বজাতির সাহিত্যচেষ্টা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মন দিয়েছিলেন।"[১০]

ব্রজেন্দ্রনাথের প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' এবং 'বাংলা সাময়িক-পত্র' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পুরাতন সংবাদপত্র, সরকারি নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এগুলি রচিত। প্রত্যেক উক্তি বা সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রামাণ্য সূত্র হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিদান তাঁহার এ-সকল রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রমাণনিরপেক্ষ কোনও উক্তি গ্রন্থমধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে নাই, পূর্বপ্রচলিত মত বা লোকবিশ্বাস সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের মানদণ্ডে সূক্ষ্ম বিচারের সম্মুখীন হইয়াছে, মূল সূত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহের ও পরীক্ষার ঐকান্তিক প্রয়াস গ্রন্থের প্রতি ছত্রেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নহে, প্রামাণিক সূত্র হইতে বিস্তারিত উদ্ধৃতিই তাঁহার রচনার গুণ। তাঁহার এই উদ্ধৃতি-প্রধান লিখনশৈলী সাধারণ পাঠকের কাছে হয়তো অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু নানা সূত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সুবিন্যস্ত সংকলনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে যে স্বকীয়তা, যে পরিশীলিত সততা ও যে বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পবোধের পরিচয় আছে, কোনমতেই তাহা অভিজ্ঞ গবেষকের চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাঁহার আলোচনার ধারা পূর্বসূরীদিগের পথকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই, স্বীয় মতামতকেও পাঠকের উপর চাপাইয়া দেয় নাই, বরং প্রমাণসংকলনের মাধ্যমেই প্রকৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তের আত্মপ্রকাশের আয়োজন করিয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বাংলা সাময়িক-পত্র' ও 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সম্বন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন :

> "ধারাবাহিক পঞ্জী নয়—সনতারিখ দলিল-চিঠিপত্রের বিবৃতি নয়—এগুলির মধ্য থেকে তিনি এমনভাবে উপকরণ নির্বাচন করেছেন যে তাদের ভেতর দিয়ে বাংলা দেশের পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।"[১১]

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃতির বাহিরে কেবল ভূমিকাটুকুই ব্রজেন্দ্রনাথের

---

১০. রাজশেখর বসু, 'ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৯

১১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ. ১১৫

লিখিত। এ-ধরনের রচনার আখ্যানমূল্য নিঃসন্দেহে কম, কিন্তু ইহার ধারাবাহিকতা, ইহার বক্তব্যের সারবত্তা ও গুরুত্ব এবং বিন্যাসের স্বকীয়তা, এককথায় ইহার সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। যদুনাথ সরকার এ-সম্বন্ধে আপাতঃবিচারে ভ্রমের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন :

"আর তাহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কাঁচি দিয়া ছাপার পাতা কাটিয়া আঠা দিয়া জোড়া সংকলন-বহি নহে, ইহা একটি জীবন্ত সাহিত্যগ্রন্থ, এক বিচক্ষণ শিল্পীর সৃষ্টি—একথা সাধারণে বুঝে না।"[১২]

ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ গবেষণার গুণগ্রহণে সাধারণের অসামর্থ্যের কথা প্রসঙ্গান্তরে যোগেশচন্দ্র রায়ও বহুপূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন :

"রামমোহন রায়ের চরিত সঙ্কলন করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। যাঁহারা পরে রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লিখিবেন তাঁহারা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট নিশ্চয় ঋণী থাকিবেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার অন্বেষণের মূল্য বুঝিবেন না।"[১৩]

পক্ষান্তরে প্রকৃত গবেষকের কাছে সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার মূল্য আছে। স্বয়ং যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন :

"বঙ্কিমের প্রথম নবেল *Raj Mohan's wife*, রামমোহন রায়ের লিখিত দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে আবেদন, রামমোহনের মুসলমান দাসীপুত্রের ইতিহাস—এসব ব্রজেন্দ্রনাথের আবিষ্কার।"[১৪]

যদুনাথের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে যে-সকল আবিষ্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সাহিত্যসাধকদের সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থের প্রকৃত লেখক যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার- রাধাকান্ত দেব নহেন—এই তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ রাধাকান্তের লিখিত পত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন[১৫]; ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি মৃণালকান্তি ঘোষের নিকট সংরক্ষিত উক্ত বর্ষের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠা হইতে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে চিরবিস্মৃতি হইতে রক্ষা করেন[১৬]; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবাসবাসকালে তাঁহার সাহায্যার্থে যে-অর্থ ঋণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মধুসূদন তাঁহার চক মনকিয়া ও চক গদারডাঙ্গা মহালদ্বয় বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, এই তথ্য বিক্রয়দলিলের সাহায্যে প্রমাণ

১২. যদুনাথ সরকার, 'ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৪-১২৫

১৩. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ৫৩৩

১৪. যদুনাথ সরকার, 'ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৫

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার', ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ১৭-১৮

১৬. 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের একটি কবিতা', প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮, পৃ. ৫৮০-৫৮১

করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মধুসূদনকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ হইতে মুক্ত করেন[১৭]; বাইবেলের প্রথম ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ যে পুরুষরাম নামক ওড়িয়া পণ্ডিতের কৃত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নয়—তাহাও ব্রজেন্দ্রনাথই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।[১৮]

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার অপর এক বৈশিষ্ট্য প্রকৃত তথ্য-প্রকাশে তাঁহার নির্ভীক দ্বিধাহীনতা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়:

"তাঁর মন সংস্কারবিহীন, তাঁর বিচার অপক্ষপাত। প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, সত্যজিজ্ঞাসাই তাঁর কাম্য, তিনি সত্যব্রত।"[১৯]

রামমোহন সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সংগৃহীত তথ্য নির্দ্বিধায় প্রকাশ করায় সমকালীন সাময়িকপত্রে ও সামাজিক আসরে বহু তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় ওঠে, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ গবেষক ও সুধীগণ ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ নিন্দাস্তুতিতে সমান অবিচল থাকিয়া শান্ত আলোচনায় তাহার সম্মুখীন হন।

নিজ পূর্বপ্রকাশিত রচনার বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোনও তথ্যের সন্ধান পাইলে ব্রজেন্দ্রনাথ অবিলম্বে পূর্বের প্রবন্ধ বা গ্রন্থের সংশোধন ও সংযোজন রচনা করিতেন, নিজের ভ্রমস্বীকারে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার বহু প্রবন্ধের এ-প্রকার সংশোধন বা সংযোজন তিনি বহুবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রন্থের নূতন সংস্করণেও নানা তথ্য এভাবে সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্বদিনও 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থটির এ-প্রকার সংশোধনার্থে তিনি কয়েক ছত্র তথ্য সংকলন করেন[২০]; এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র সে-বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনার অপর একটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জীবনীমূলক প্রবন্ধে এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থগুলিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বহু সাহিত্যকারের গ্রন্থপঞ্জী পরিবেশন করিয়াছেন। এ-সকল গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পদ্ধতি পরীক্ষা করিলে পুস্তকতালিকা ও পুস্তকপরিচয় রচনায় তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। কালানুক্রমে সজ্জিত গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থের সঠিক ও সম্পূর্ণ নাম, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আখ্যাপত্রের যথাযথ প্রতিলিপি, প্রকাশস্থল ও প্রকাশক, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয়, পরবর্তী কোনও কোনও সংস্করণের উল্লেখ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালায় গ্রন্থটি রক্ষিত আছে তাহারও নামোল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থের বিবরণ রচিত হইয়াছে, অন্যথায় ঐরূপ পরীক্ষার সুযোগলাভের অভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নির্ভুল গ্রন্থপঞ্জী রচনার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার উল্লেখিত গ্রন্থগুলির

১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধুসূদন দত্ত', ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৮৬-৮৭

১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', ২য় সংস্করণ—৩য় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ১০

১৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৬৮

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শেষ "কপি"', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১১৭-১২১

বিবরণ সবিশেষ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থতালিকার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"৩। সাবিত্রী সত্যবান নাটক। ইং ১৮৫৮। পৃ. ।৵০+৯৮।

Shabitree Shotyobhan Natuck. A Comedy by Kaliprossono Sing *Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural Societies of India, and of the British Indian Association, and President of the Bedoyth Shahine Shobha of Calcutta, etc. etc. etc.* Calcutta. Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah. 1858.

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। শকাব্দা ১৭৮০ বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

ইহাতে 'মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।' "[২১]

অপর একটি দৃষ্টান্ত :

"১৮। প্রার্থনাপত্র। ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪।

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।"[২২]

ইতঃপূর্বে দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থের পরিচিতির বিষয়ে 'নীলদর্পণ'-মামলাখ্যাত পাদরি লং-এর রচিত পুস্তকপঞ্জীই[২৩] একমাত্র ভরসা ছিল, কিন্তু লং-এর পুস্তকপঞ্জী বহুবিষয়ে সম্পূর্ণ বা অভ্রান্ত নহে। গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ লং-এর বহু ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'নববাবুবিলাস' পুস্তকটির প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (অক্টোবর, ১৮২৫) "১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে" প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যানবস্তুর আভাস দিয়া, "The Amusements of the Mod rn Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825" নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। ...পাদরি লঙের তালিকায় মুদ্রিত (*Catalogue*, p. 82) 'নববাবুবিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ নির্ভুল নহে।"[২৪]

অন্য এক প্রসঙ্গেও ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :

---

২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৩৬

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়,' ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ৯৩

২৩. J. Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, Calcutta, 1855.

২৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,' ৪ম সংস্করণ, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬, পৃ. ২৫-২৬ : পাদটীকা

"পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থের রচয়িতা-হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার রচয়িতা ছিলেন—বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ; গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১২৬০ বঙ্গাব্দে "বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাপচন্দ বাহাদুরের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত" হইয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়।" ২৫

এইভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ লং-এর গ্রন্থপঞ্জীর ত্রুটিগুলি আবিষ্কার করিয়া প্রত্যেক সাহিত্য-সাধকের গ্রন্থের যথাসাধ্য বিস্তারিত ও নির্ভুল গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করায় লং-এর কৃত পঞ্জীর অপরিহার্যতার অবসান ঘটিল।

পুস্তকপঞ্জী প্রণয়নে ব্রজেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থাগারিকসুলভ কুশলতা তাঁহার এ-জাতীয় রচনাগুলির তথ্যমান যথেষ্ট বর্ধিত করিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই ১৩৪০-৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থশালাধ্যক্ষ হিসাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের দুর্লভ পুস্তকসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের দৈনিক কার্যধারা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে আহৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই উত্তরকালে গ্রন্থপঞ্জী-প্রণয়নে তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে।

সাহিত্যের আসরে ও ইতিহাসের গবেষণায় ব্রজেন্দ্রনাথ যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্যজগতে তাহাকে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জগদীশ ভট্টাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি তাঁহার সার্থক পরিচিতি :

"সমাজ ও সাহিত্য-ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁকে বলব—বিজ্ঞানী। তথ্যের গবেষণাগারে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারাই তিনি যথার্থ সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া তিনি কথা বলেন নি। ...তাই ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলার জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে 'ব্রজেন্দ্রনাথ' নামের অর্থ হল 'অভ্রান্ত প্রামাণিকতা'।"২৬

এ-বিষয়ে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর অনুরূপ মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য :

"ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবীন সাহিত্য ও নবীন সংস্কৃতির পরিচয় ও ইতিবৃত্ত সংকলনকে তিনি জীবনের মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কার্য করিয়া গিয়াছেন।"২৭

ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলির ভাষা বাহুল্যবর্জিত, বৃথা অলঙ্করণ ও পুনরুক্তির অভাবে সরল, স্বাভাবিক ও ভারহীন। বক্তব্যের সারগর্ভ গাম্ভীর্য বিবেচনায় তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গীর সারল্য নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তুর সহজপাঠ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে, তথ্য ও বিতর্কের গুরুত্ব

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ', ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, মাঘ ১৩৬২, পৃ. ৩০

২৬. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'পুরুষসিংহ ব্রজেন্দ্রনাথ,' শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৮০

২৭. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,' প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ৯৫

অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয় নাই, ভাষার তারল্য ও গতিতে শান্ত বিচারের স্থৈর্য ব্যাহত হয় নাই। ভাষা ব্যবহারে তাঁহার সংযম এবং শব্দচয়নে তাঁহার সতর্কতা সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন :

"কোনও চরিতে একটা উড়া কথা নাই, বাগাড়ম্বর নাই।" [২৮]

সুশীলকুমার দে মন্তব্য করিয়াছেন :

"ব্রজেন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় যেরূপ আড়ম্বরহীন, তাঁহার রচনাও সেইরূপ মিতভাষী।" [২৯]

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার নিদর্শনস্বরূপ দুইটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

"বাংলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিভিন্ন রীতি প্রয়োগের কথা জানিতেন।"[৩০]

"প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না; তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের ইংলণ্ড-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবর্তনের সময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী-জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখন পর্যন্তও বাঙালীরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, নূতন ইউরোপীয় ধরণের কোন আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে।" [৩১]

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার উল্লিখিত গুণাবলী সত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্যকর্মে কয়েকটি সমালোচনার মত বিষয় বর্তমান। প্রথমতঃ অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, টীকাটিপ্পনী, প্রসঙ্গোল্লেখ এবং দীর্ঘ তালিকায় তাঁহার প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ভারাক্রান্ত। কোথাও কোথাও

---

২৮. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ৫৬১

২৯. সুশীলকুমার দে, 'ভূমিকা', বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ।।০

৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়', ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ৭৬

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ৬

যথাসাধ্য তথ্যপরিবেশনের অত্যুৎসাহে প্রতিপাদ্য বস্তু বা বর্ণিত বিষয়ের পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, যোগেশচন্দ্র রায় উল্লেখ করিয়াছেন :

"(বিদ্যাসাগরের) চরিত লিখিতে ব্রজেন্দ্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তদনুপাতে পুস্তকখানি মনোজ্ঞ হয় নাই। এক এক বিষয়ের অন্তর্গত বহু অবান্তরে (details) মানুষটি ঢাকা পড়িয়াছেন।"[৩২]

দীর্ঘ উদ্ধৃতি বা তর্কে রচনার বৈজ্ঞানিকতা বৃদ্ধি পাইলেও বর্ণনার ধারা মধ্যে মধ্যে বিঘ্নিত হইয়াছে, আলোচনা শুষ্ক বোধ হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের বহু রচনায় দীর্ঘ ইংরেজী উদ্ধৃতি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের দুর্বোধ্য না হইলেও অন্ততঃ প্রীতিকর মনে হইবার কথা নয়। মাতৃভাষায় লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বিদেশী ভাষার অংশের সম্মুখীন হইলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের চিন্তাধারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হইতে পারে ; ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তো এই অংশগুলি বাধাস্বরূপ হইবেই। ইংরেজীতে প্রদত্ত তথ্য বা উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ বা বাংলায় তাহাদের সারাংশ প্রদান করিলেই এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করা যাইত। তাহার অভাবে বিদেশী ভাষায় লিখিত উদ্ধৃতিগুলি অনেক সাধারণ পাঠকের নিকটেই লেখকের পাণ্ডিত্যপ্রচার বলিয়া মনে হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ ব্রজেন্দ্রনাথ তথ্যসংকলন করিয়াছেন প্রচুর, কিন্তু তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনায় তাঁহার নিজ মতামত ও সিদ্ধান্তকে অনেক স্থলেই অগোচরে রাখিয়াছেন। সুধিসমাজে ইহার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। যদুনাথ, রাজশেখর, যোগেশ-চন্দ্র প্রমুখ লেখকগণ তাঁহার এই সংযমে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যক্তিসত্তার চিহ্নবিহীন তথ্যপরিবেশনকে ইতিহাস-আলোচনার আদর্শ হিসাবে সাধুবাদ দিয়াছেন ; পক্ষান্তরে সুশীলকুমার দে প্রমুখ সমালোচকগণ ব্রজেন্দ্রনাথের এই রীতির সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহার প্রভাবে তাঁহার রচনার অঙ্গহানির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত তর্কসাপেক্ষ রীতিগুলি ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার তথ্যমূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোনক্রমে ব্যাহত করিয়াছে, একথা স্বীকার করা কঠিন। তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাগুলিতে কালে বহু সংশোধন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উত্তরপুরুষের গবেষণাকার্যের পথিকৃৎরূপে সেগুলির মর্যাদা কোনদিনই মলিন হওয়ার নহে। পক্ষান্তরে সাধারণ পাঠকের অবসরবিনোদনের উপযোগী তারল্য তাঁহার লেখনীতে ভর করিতে পারে নাই ; হয়তো তাঁহার নিজেরও সে-বিষয়ে অনীহা ছিল। গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় সরসতা তাঁহার প্রেয় ছিল না, সারবত্তাই ছিল তাঁহার কাম্য।

৩২. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ৫৩৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিবর্তনের অতীত ইতিহাসকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: প্রথম পর্যায়ে বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে বেঙ্গল লিটারারি অ্যাসোসিয়েশনের রূপান্তরের মাধ্যমে পরিষদের সৃজন,[৩৩] দ্বিতীয় পর্যায়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রমুখ সুধিবৃন্দের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে গৃহনির্মাণ, শাখা-পরিষৎ স্থাপন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের লুপ্ত গ্রন্থোদ্ধার প্রভৃতি কার্যের মাধ্যমে পরিষদের প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের শ্রম ও সেবায় গ্রন্থশালার সম্প্রসারণ, গ্রন্থপ্রকাশনের সার্থক রূপায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার উদ্যোগ ইত্যাদি আয়োজনের দ্বারা পরিষদের ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাবিধান। শেষোক্ত পর্যায়ের অন্যতম নায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষদের প্রধান কর্মী রামকমল সিংহের সান্নিধ্যে আসিয়াই পরিষদের ক্রিয়াকলাপে আগ্রহী হইয়া ওঠেন।[৩৪] পরিষদের ৩১শ বর্ষের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) ব্রজেন্দ্রনাথ ইহার সাধারণ সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ইহার পর দুই দশক ধরিয়া তিনি পরিষদের অক্লান্ত সেবায় রত থাকেন এবং উহার প্রায় প্রাণপুরুষ হইয়া ওঠেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ পর্যায়ক্রমে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৩৩৯, ১৩৪৩-৪৪), গ্রন্থশালাধ্যক্ষ (১৩৪০-৪১, ১৩৫২-৫৫), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৪৫-৪৬), সহ-সম্পাদক (১৩৪১-৪২) এবং সম্পাদক (১৩৪৭-৫১, ১৩৫৬-৫৯) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় তারিখে তিনি পরিষদের আজীবন সদস্যপদেও নির্বাচিত হন। বহু বৎসর তিনি পরিষদের সাহিত্যশাখা, ইতিহাসশাখা, গ্রন্থশালা উপসমিতি, ছাপাখানা উপসমিতি, আয়বৃদ্ধি-ব্যয়সংকোচ সমিতি, কার্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি প্রভৃতির সদস্যরূপে নানা কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়ে প্রয়াসের জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরিষৎ যে শাখা-সমিতি গঠন করেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহারও অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।[৩৫]

পরিষদের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার কাজে ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পরিষৎ-পরিচয়' (কার্তিক ১৩৪৬) এ-বিষয়ে প্রথম সুবিন্যস্ত ও আনুপূর্বিক বিবরণ-গ্রন্থ। বহুপূর্বে প্রকাশিত কতিপয় 'পরিষৎ-পঞ্জিকা'র তুলনায় এই গ্রন্থটির তথ্যসংকলন, পরিবেশন ইত্যাদি যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, সুবোধ্য, সুসজ্জিত এবং বাহুল্যবর্জিত। আরও এক দশক পরে ব্রজেন্দ্রনাথ গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ততর করেন এবং ইহাতে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত হয়।[৩৬]

ব্রজেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রয়াসে পরিষদের গ্রন্থশালায় পুস্তকসংগ্রহ সংখ্যা ও গুরুত্বে

---

৩৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬)', কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ. ৩-৪

৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' : 'আত্ম-পরিচয়', কলিকাতা, ৫ আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ১৪

৩৫. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, ১৩৩৯-৫৯

৩৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬)', কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৫৬

উল্লেখযোগ্য হইয়া ওঠে। লেখক ও প্রকাশকদের নিকট হইতে দানস্বরূপ পুস্তকসংগ্রহের কার্যে তাঁহার প্রশংসার্হ উদ্যম ছিল। এ-প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"আজ যে পরিষদের পুস্তকাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পরই সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা-সহায়ক কেন্দ্র হইয়াছে—শুধু বাঙ্গলা গ্রন্থে নহে, ইংরেজী ও অন্য কোন কোন ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে—তাহা ব্রজেন্দ্রনাথের গৃহিণীপনার ফল।" [৩৭]

নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহও ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষৎ-গ্রন্থশালাতেই দান করিয়া যান। রামকমল সেন লিখিত 'এ ডিক্‌শ্‌নারি ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেংগলি' (১ম খণ্ড, ১৮৩৪ খ্রী), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -বিরচিত 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' (১ম সংস্করণ, ১৯১৩ খ্রী) প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি পরিষদে প্রদান করিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন মুদ্রাও ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক নানা সূত্রে সংগৃহীত ও পরিষৎ-সংগ্রহশালায় উপহৃত হয়।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ হিসাবে প্রথম কার্যভার গ্রহণের অব্যহিত পরেই ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষৎ-গ্রন্থাগারে পূর্ববৎসর পর্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় বাংলা সাময়িকপত্রের একটি তালিকা সংকলন করেন।[৩৮] তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সাময়িকপত্রের শ্রেণী (অর্থাৎ দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি), সম্পাদকের নাম, খণ্ড, ভাগ বা বর্ষ এবং সংখ্যা, প্রকাশকাল, পরিষৎ-গ্রন্থাগারের গ্রন্থপঞ্জী-সংখ্যা প্রভৃতি উল্লেখিত হওয়ায় গ্রন্থাগারের কর্মী ও গবেষক-পাঠকদের অপরিসীম উপকার হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-গ্রন্থাগারের সাধারণ গ্রন্থসংগ্রহ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহগুলির পুস্তকতালিকা সংকলনের ভারও ব্রজেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয় এবং প্রধানতঃ তাঁহারই নির্দেশে এই পুস্তকতালিকার ১ম খণ্ড সংকলিত হয়।[৩৯]

পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা ও সাহিত্যকর্মে সর্বাধিক উপকৃত হয়। তিনি যখন পরিষদে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন তখন দেশে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অবস্থা; পরিষদের আয়ের উৎস ক্ষীণ ও শুষ্কপ্রায়। বিত্তসংকটের সেই দুর্দিনে পরিষদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ইহার গ্রন্থপ্রকাশ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক প্রসারসাধনের মাধ্যমে পরিষদকে দীর্ঘকালের জন্য স্বনির্ভর করিয়া তোলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের পরবর্তী পরিষৎ-সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনষষ্ঠিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ'-এ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"দারুণ আর্থিক অসঙ্গতির সময় তিনি কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া তিনি পরিষদ্‌কে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাবলম্বী করিয়া গিয়াছেন।"[৪০]

---

৩৭. যদুনাথ সরকার. 'ব্রজেন্দ্রনাথ,' শনিবারের চিঠি. অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১

৩৮. 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার : বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তালিকা : (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত),' কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৪০

৩৯. অনঙ্গমোহন সাহা, 'নিবেদন', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় : পুস্তকতালিকা, প্রথম খণ্ড—বাংলা পুস্তক, কলিকাতা, পৌষ ১৩৪৮

৪০. শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনষষ্ঠিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬০ : ২য় সংখ্যা, পৃ. ৯৭

চিন্তাহরণ চক্রবর্তীও ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"বস্তুতঃ তিনি যখন যে পদেই থাকুন না কেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনিই ছিলেন পরিষদের কর্ণধার—সর্ব্বময় কর্ত্তা। পরিষদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিয়া ইহার ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন।"[৪১]

পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের কর্মসূচীর দুইটি ধারা ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও অনুসৃত হয়। একদিকে তিনি প্রধানতঃ পুরাতন সাময়িক-পত্র, সরকারি নথিপত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদির তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করিয়া 'বাংলা সাময়িক-পত্র', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থই রচনা করেন এবং তাহাদের সর্বস্বত্ব তিনি বা তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার সহধর্মিণী পরিষদকে দান করেন। অন্যদিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, দীনবন্ধু মিত্র, রামমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ প্রখ্যাত পূর্বসূরীদিগের রচনাবলী সম্পাদনায় ব্রজেন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন ; এ-সকল রচনাবলীও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই দুই ধারার কার্যসূচীর ফলে একদিকে বঙ্গসাহিত্যের ডালা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সুলভ অর্ঘ্যে পূর্ণ হইয়া ওঠে, যুগসন্ধিক্ষণের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় এবং উল্লেখ্য সাহিত্যসেবী ও তাঁহাদের সাহিত্যকীর্তির প্রামাণ্য বিবরণ সংকলিত হয়, অপরদিকে তেমনি সাধারণ-শিক্ষিত ও মননশীল—উভয় শ্রেণীর পাঠকবর্গেরই প্রয়োজনানুগ সাহিত্য পরিবেশনের মাধ্যমে পরিষদের আর্থিক উপার্জনের একটি স্থায়ী পথ সৃষ্ট হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত গ্রন্থগুলির আবশ্যকমত নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য তাঁহার পত্নী বীণাপাণি দেবী ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল নামে যে তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার মূলধন বৃদ্ধির জন্য ব্রজেন্দ্রনাথের নিজের দানও কম ছিল না ; 'সারদামঙ্গল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'পাঁচকড়ি রচনাবলী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য পরিষদের দেয় দক্ষিণাও ব্রজেন্দ্রনাথ উপরি-উক্ত তহবিলে দান করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র বা অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নলিখিত সংস্থা ও সম্মিলনে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হন :

সংস্থা বা সম্মিলন	অধিবেশনস্থল	অধিবেশনের তারিখ
নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন	কলিকাতা	২১-২৯ ভাদ্র, ১৩৪০
মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজতজয়ন্তী	মেদিনীপুর	১৪-১৬ ফাল্গুন, ১৩৪৪
নবীনচন্দ্র সেন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব	চট্টগ্রাম-নয়াপাড়া	৪-৫ ফাল্গুন, ১৩৫২

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারশিপ সমিতিতেও ব্রজেন্দ্রনাথ একাধিকবার (১৩৪০ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দ) পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ তারিখে ৫ বৎসরের জন্য তিনি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে

৪১. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'ব্রজেন্দ্রনাথ ও বসন্তরঞ্জন', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ : ১ম সংখ্যা, পৃ. ২১

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনেরও সহায়ক সদস্য (অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার) মনোনীত হইয়াছিলেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস ও সুরেন্দ্রনাথ সেনকে লইয়া গঠিত বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়কে ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সামাজিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন তারিখে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক প্রদান করেন; ব্রজেন্দ্রনাথই এই সম্মানের প্রথম প্রাপক। এই উপলক্ষে উপরি-উক্ত দিবসে যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী সমাজের সমস্যা' নামক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ পরিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৯ অগ্রহায়ণ নারায়ণচন্দ্র মৈত্র পদক দানে সম্মানিত করেন।

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবনচরিত ও রচনাবলী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণ ব্রজেন্দ্রনাথকে অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক প্রদান করেন; তিনিই এই পদকের প্রথম প্রাপক।

স্মরণীয় সাহিত্যসেবীদিগের বিস্মৃতপ্রায় জীবনকাহিনী ও সাহিত্যকীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে অধিকতর উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিলের অর্থানুকূল্যে ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ ১০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ অবিলম্বে সেই অর্থ ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিলেই দান করেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ হিসাবে ১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' সম্পাদনার সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে প্রকৃত অধিকারীদের লিখিত মনোজ্ঞ গবেষণা-প্রবন্ধ সংকলন করিয়া পত্রিকাটিতে প্রকাশ করেন; ফলে তাঁহার সম্পাদনাকালে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' গুরুত্ব, প্রামাণিকতা ও তথ্যমানে মননোত্তীর্ণ হয়।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত যে-সকল গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির একটি তালিকা এই প্রবন্ধের অন্তর্গত 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা' শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত হইল।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি এবং তদতিরিক্ত অন্য কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও পরিষদের বিভিন্ন মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ও সেগুলি পাঠের তারিখ নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল:

প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধপাঠের তারিখ
রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী (আলোচনা)	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮
দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস	১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮

প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধপাঠের তারিখ
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	২ মাঘ, ১৩৩৯
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মতারিখ	১৪ আষাঢ়, ১৩৪১
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী-সমাজের সমস্যা	৮ ফাল্গুন, ১৩৪৩
দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার	২৭ আষাঢ়, ১৩৪৪
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	২৫ ভাদ্র, ১৩৪৪
পীতাম্বর মিত্র	২৫ ভাদ্র, ১৩৪৪
জেমস স্টুয়ার্ট	২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪
কালীপ্রসন্ন সিংহ	৫ মাঘ, ১৩৪৪
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	১৪ ভাদ্র, ১৩৪৫
রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
সেকালের সংস্কৃত কলেজ (প্রথমাংশ)	১৯ ফাল্গুন, ১৩৪৬
ঐ (দ্বিতীয়াংশ)	২১ চৈত্র, ১৩৪৬
বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন	২৬ চৈত্র, ১৩৪৬
কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্র দান	১৫ আষাঢ়, ১৩৪৭
সেকালের সংস্কৃত কলেজ	১ ভাদ্র, ১৩৪৭
ঐ	২৭ পৌষ, ১৩৪৭

বস্তুতঃ প্রায় দুই দশক ধরিয়া পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ, প্রবন্ধপাঠ, পত্রিকাপ্রকাশ, আর্থিক ব্যবস্থা, নীতিনির্ধারণ, গ্রন্থসংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখ্য বা গৌণ ভূমিকা অনুভব করা যায়। পরিষদের কার্যে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। মৃত্যুর মাত্র কয়দিন পূর্বে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৫ আশ্বিনের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কাজেই তাঁহার বিরামহীন উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে :

> "ব্রজেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে মাত্র সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়, কিন্তু প্রথম হইতেই প্রত্যহ পরিষৎ-গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিজ বিভাগের কাজ তো করিতই, তদুপরি নানাদিকের দৈনিক ছোট ছোট সমস্যা ও ঝঞ্ঝাট তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া দিত।"[৪২]

সজনীকান্ত দাসকে পরিষদে আনয়নের কৃতিত্বও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। উভয়ের মিলিত চেষ্টায় পরিষদের তৎকালীন কার্যসূচীর প্রসার ও অভিনব পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছিল। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সিরিজের কয়েকটি গ্রন্থ,

৪২. যদুনাথ সরকার, 'ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৭

বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি পুস্তক সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ্ম-সম্পাদনায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নে কিছুদিন সজনীকান্ত পরিষৎ-সভাপতি ও ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষৎ-সম্পাদক ছিলেন এবং স্বভাবতই সে-সময়ে পরিষদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁহাদের দুইজনের উপরেই ন্যস্ত ছিল।

কর্মীকল্যাণ

ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধারণ চাকরিজীবী ছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা ইহুদী তামাক-ব্যবসায়ীর মাসিক ১২ টাকা বেতনভুক টাইপিস্টরূপে, অবসান 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাদ্বয়ের সহ-সম্পাদকরূপে। সাধারণ কর্মীদের ক্লেশ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁহাদের স্বার্থরক্ষায় তাঁহার আগ্রহের অভাব ছিল না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সম্পাদনাকালে তিনিই প্রথম বেতনভোগী কর্মীদের পূজার পার্বণী বা বোনাস দিবার প্রস্তাব করেন; ফলে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন তারিখে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় কর্মীদের অর্ধমাসের বেতন বোনাস হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।[৪৩] তাঁহার সম্পাদনা-কালেই ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে বোনাসের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া একমাসের বেতনের সমতুল্য করা হয়।[৪৪]

পরিষৎ-কর্মীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুযোগও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথেরই অবদান। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ তারিখে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বেতনভুক কর্মীদের জন্য ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন; প্রস্তাবটি সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৪৫] ব্রজেন্দ্রনাথ ও অন্য কতিপয় সদস্যকে লইয়া গঠিত শাখা-সমিতি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিয়মাবলী রচনা ও পরীক্ষা করেন এবং তদনুসারে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়মাবলী চালু করার সিদ্ধান্ত হয়।[৪৬]

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যোগদানের বহু পূর্ব হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পার্শিবাগান লেনে শশিশেখর, রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর বসুর উদ্যোগে সংগঠিত 'উৎকেন্দ্র-সমিতি'র অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ইহার কার্যে ও আসরে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন।

জলধর সেনের অধ্যক্ষতায় 'রবিবাসর' পুনর্গঠিত হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুকাল ইহারও সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদনাকালে 'রবিবাসর'-এর বৈঠকে সাহিত্য,

৪৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ, ১২ আশ্বিন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত

৪৪. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ, ৭ ভাদ্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত

৪৫. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত

৪৬. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ, ৭ ভাদ্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত

ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্মে আগ্রহী হইয়া তিনি 'রবিবাসর' হইতে সরিয়া আসেন।

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ব্রজেন্দ্রনাথকে তাঁহার ইতিহাসবিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধরচনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে অন্যতম সম্মানিক সদস্যরূপে (অনারারি মেম্বার) সাদরে গ্রহণ করে।

সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'র ভার গ্রহণ করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ বহু বৎসর নিয়মিত ভাবে 'শনিবারের চিঠি' কার্যালয়ের সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে ৫ বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ড্‌স্‌ কমিশনের সহায়ক সদস্য (অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার) নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন সভাসমিতিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে (২১ চৈত্র ১৩২১) 'গুলবদন বেগম' নামক প্রবন্ধ-পাঠ, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ড্‌স্‌ কমিশনের মাদ্রাজ অধিবেশনে (জানুয়ারি, ১৯২৪ খ্রী) বেগম সমরু সম্বন্ধে, লাহোর অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯২৫) লুৎফ-উন্নিসা বেগম সম্বন্ধে, রেঙ্গুন অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৭) মীর কাসিমের অন্তিমজীবন সম্বন্ধে, নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৮) চৈৎসিংহ সম্বন্ধে এবং পাটনা অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৩০) গাজীউদ্দিন সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বার্ষিক স্মৃতিসভায় (৬ জুন, ১৯৪৮) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ, 'রবিবাসর'-এর ২য় বর্ষ ১৩শ অধিবেশনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ, 'দীপালি সম্মিলন'-এর ১ম অধিবেশনে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) 'বাদশাহী কথা' নামক প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কোষগ্রন্থ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরিচালনা ও সম্পাদনায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে যে বাংলা কোষগ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার তথ্যসংগ্রহ ও সংকলনের সহিত ব্রজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। উক্ত কোষগ্রন্থ রচনার জন্য যে-সকল বিভাগীয় সঙ্ঘ (বোর্ড) গঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র বিভাগের ব্রজেন্দ্রনাথ অন্যতর সম্পাদক ছিলেন (১৩৪১-৪৮ বঙ্গাব্দ)।[৪৭] অবশ্য এই কোষগ্রন্থের প্রকাশ অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত কিশোরদের কোষগ্রন্থ 'শিশু-ভারতী' প্রণয়নে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'শিশু-ভারতী' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত[৪৮] রামমোহন

৪৭. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সং, 'বঙ্গীয় মহাকোষ', কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১ম ও ২য় খণ্ড

৪৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়' (অমর-জীবন), শিশু-ভারতী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫১-১৭৬০

রায় সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনাথেরই লিখিত। এই সচিত্র নিবন্ধটিতে রামমোহনের পিতৃ-পরিচয় ও প্রথম জীবন, ধর্মমতের বিকাশ ও ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ এবং বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ও 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থগুলি রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দের রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন।

মৃত্যু

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে দুর্গাপূজার পূর্বে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হন। সাময়িকভাবে সুস্থ হইয়া উঠিলেও কলিকাতায় ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসভবনে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন (১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ৩ অক্টোবর) শুক্রবার কোজাগরি পূর্ণিমার পরদিবস রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বদিনও দ্বিপ্রহরে অল্পদিন পূর্বে সংগৃহীত 'সংবাদপ্রভাকর'-এর কয়েকটি নবাবিষ্কৃত সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থটির ১ম ও ২য় খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধনের জন্য কয়েক ছত্র রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই ব্রজেন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা। ছত্রগুলি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[৪৯] 'উষা', 'জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা', 'বিক্রমপুর', 'বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা সাহিত্য-সংগ্রহ', 'বিশ্ববিলোকন', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সমাচার দর্পণ' এবং 'সংবাদ সৌদামিনী'—এই ৮টি সাময়িকপত্র সম্বন্ধে সংশোধন ও সংযোজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ঐ ছত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে লেখা হইয়াছিল :

> "অধ্যবসায়, একান্ত ইচ্ছা ও প্রচুর জ্ঞানপিপাসা লইয়া তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ও সে ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন ভাবে গবেষণা করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বাংলা সাময়িকপত্র, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে।"[৫০]

'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল :

> "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াও অদম্য

৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শেষ "কপি"', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১১৭-১২১

৫০. 'পরলোকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাময়িকী), ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ৪০৩-৪০৪

অধ্যবসায় ও কর্ম্মিষ্ঠতা বলে জীবনে যে এতখানি সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে ব্রজেন্দ্রবাবু মোগলযুগের কোন কোন দিক সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য সুরু করেন।......উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা তাঁহার গবেষণার নিদর্শন।"[৫১]

ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী

ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলা চলে, সে-বিষয়ে বিদগ্ধ সমাজে মতদ্বৈধ দেখা যায়। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদকের জন্য গঠিত বিচারকমণ্ডলী ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়কে ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সমাজেতিহাস গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করেন। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে তখন পর্যন্ত 'বাংলা সাময়িক-পত্র' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' প্রকাশিতই হয় নাই।

ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে রাজশেখর বসু 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থটিকেই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন:

> " 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' 'বাংলা সাময়িক-পত্র' এবং আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।... তাঁর গ্রন্থ স্বতঃপ্রমাণ ঐতিহাসিক প্রদর্শভাণ্ডার।"[৫২]

গ্রন্থটির আলোচনাব্যপদেশে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:

> "যিনি ইতিহাস লিখিবেন, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কথা লিখিতে বা জানিতে চাহিবেন, তাঁহার নিকট 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। এমন সুনির্বাচিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ ইহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় কখনও বাহির হয় নাই।...গ্রন্থখানি এমন সুবিন্যস্ত ও সুখপাঠ্য, কৌতূহলী পাঠক একবার খুলিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না।"[৫৩]

দীনেশচন্দ্র সেনও গ্রন্থটির সম্বন্ধে সাধুবাদ করিয়াছেন:

> "বাঙালীর এক শত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।"[৫৪]

৫১. 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' (বিবিধ প্রসঙ্গ), প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ১৬
৫২. রাজশেখর বসু, 'ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৯
৫৩. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (পুস্তক পত্রিকা), বঙ্গশ্রী, কার্তিক ১৩৪২, পৃ. ৬১৫
৫৪. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বর্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা', বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ৯১

এই প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত গ্রন্থটির বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত যদুনাথ সরকারের সাধুবাদও স্মর্তব্য।[৫৫]

পক্ষান্তরে সুশীলকুমার দে 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত পুস্তিকাগুলিকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

> "বর্তমান গ্রন্থমালা আড়ম্বরবর্জিত, মিতভাষী ও কঠোর তথ্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত।...তাঁহার অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান গ্রন্থমালার সঙ্কল্প ও সিদ্ধি বহুকালের জন্য তাঁহার প্রধান কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।"[৫৬]

ব্রজেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্যও মন্তব্য করিয়াছেন :

> "ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে 'সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা'।"[৫৭]

রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতালোচনার কোনও কোনও বিষয় সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে কোনও কোনও অংশের ভাষা ও তথ্যবিন্যাস সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করিলেও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করিয়াছেন :

> "অল্প পরিসরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মরণীয় সাধকের চরিত ও কৃতি-প্রচার এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।...আমার বিবেচনায় সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।...প্রত্যেক উক্তি উন্মিত হইয়াছে, সন তারিখ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। কত যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই, সংবাদপত্র, সরকারী নথিপত্র, নানা গ্রন্থশালার সূচীপত্র নিরীক্ষণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি কখন স্মরণ করেন, কখন পড়েন, কখন লেখেন?...... তাঁহার সোনার দোয়াত-কলম হউক।"[৫৮]

অন্যদিকে আবার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থটিরও সমাদরের অভাব হয় নাই। যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন :

> "অসংখ্য প্রাচীন কীটদষ্ট সংবাদপত্র, জীবনস্মৃতি, ভ্রমণকাহিনী এমন কি বিজ্ঞাপন—এবং শুধু বাঙ্গলায় নহে ইংরেজী ভাষাতেও,—অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের সহিত ঘাঁটিয়া বাছিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" সংকলন করিয়াছেন। তাঁহার গত দুই-তিন বর্ষে প্রকাশিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"-র মত ইহা অমূল্য; কারণ এই তিনখানি আধার একত্র না করিলে বঙ্গের নবজীবনের (রেনাসাঁজ্-এর) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে ব্রিটিশ যুগের নাটক ও

৫৫. যদুনাথ সরকার, 'ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৪-১২৫

৫৬. সুশীলকুমার দে, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ. ৪২৭

৫৭. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'পুরুষসিংহ ব্রজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৭৯

৫৮. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩১-৫৩৫

নাট্যশালার ধারাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথমশ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।"[৫৯]

গ্রন্থটির আলোচনাপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন:

"...এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব ও একক। ...বইখানি ঐতিহাসিক প্রমাণের ভাণ্ডার-স্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিত্য-সমালোচক ভিন্ন সাধারণ পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট রস পাইবেন—এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়া নিপুণ ইতিহাস-শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমাণগুলি ও তদবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস-কথা আমাদের শুনাইয়াছেন।"[৬০]

মননের মানদণ্ডে উপরি-উক্ত গ্রন্থ তিনটির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণে অল্পাধিক মতবিরোধ থাকিলেও এ-কথা বর্তমানে অবশ্যস্বীকার্য যে গ্রন্থগুলি যথাক্রমে সমাজ, সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অবশ্য তথ্যগত কোনও কোনও ক্রটিবিচ্যুতি ব্রজেন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থে চোখে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত '৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি' প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে পাঁচকড়ির রচনাপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটি রমাপ্রসাদ চন্দের লিখিত; 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' গ্রন্থে (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৮৩, কলিকাতা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ. ৪: পাদটীকা-২) ব্রজেন্দ্রনাথ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের লেখিকা মিসেস মুলেন্সকে চট্টোপাধ্যায়-বংশোদ্ভূতা খ্রীস্টান বঙ্গমহিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ উক্ত মিসেস মুলেন্স বা ম্যালেন্স যে প্রকৃতপক্ষে ইওরোপীয় পাদরি রেভারেণ্ড লাক্রোয়ার কন্যা, এ-তথ্য এবং মিসেস ম্যালেন্সের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বহুকাল পূর্বেই মধুসূদন মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'সুশীলার উপাখ্যান' গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন ('সুশীলার উপাখ্যান', ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জুলাই ১৮৭৫ খ্রী, পৃ. ৯১-৯২: পাদটীকা)।

ক. ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের তালিকা

১. **বাঙ্গলার বেগম**। (ফাল্গুন ১৩১৯)। পৃ. ।০+[৪]+৬৭। সচিত্র।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বাঙ্গলার বেগম/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/অধ্যাপক/শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ/লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।/কলিকাতা/২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্/শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু লুৎফুন্নিসা বেগম, আমিনা বেগম, আলিবর্দ্দী-বেগম, মণিবেগম, ঘসিটি বেগম ও জিন্নতুন্নিসার জীবনকাহিনী।

---

৫৯. যদুনাথ সরকার, 'জাতীয় নাটকের বিকাশ', ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ. ৯৬২

৬০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০ (দ্র. বিজ্ঞাপন অংশ: পৃ. ২, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)

২. **[A History of the] Begams of Bengal**. (জুলাই) ১৯১৫ খ্রী। পৃ. [৬]+৫০।
গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

Begams of Bengal/Translated from the Bengali/of/Brajendranath Banerji/by/Satis Chandra Barman, B. L./and/the author/Calcutta/Mitter & Co./Cornwallis Buildings./1915/Price As. 12.

পুস্তকটি ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাঙ্গলার বেগম' গ্রন্থের সতীশচন্দ্র বর্মণ ও ব্রজেন্দ্রনাথ -কৃত অনুবাদ। ভূমিকা : অক্ষয়কুমার মৈত্র। গ্রন্থের বিষয়বস্তু জিনৎ-উন্নিসা, আলিবর্দীর বেগম, ঘসিটি, আমিনা, লুৎফ-উন্নিসা, রাবিয়া ও মুন্নি বেগমের জীবনেতিহাস। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত।

পুস্তকটি পুনর্লিখিত হইয়া যদুনাথ সরকারের ভূমিকাসহ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা viii+৬৪।

৩. **নূরজহান্**। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৵০+[২]+৮৬। সচিত্র। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত।
পুস্তকটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

নূরজহান্/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত/(শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি-এল্ লিখিত/ভূমিকা সম্বলিত।)/১৩২৩/মূল্য ৸৹ আনা

গ্রন্থের প্রকাশক মিত্র কোম্পানি।

৪. **বেগম সমরু**। শ্রাবণ ১৩২৪। পৃ. ৸৵০+[২]+১২২। সচিত্র।
পুস্তকটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ/বেগম সমরু/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রাবণ-১৩২৪

পুস্তকটির 'নিবেদন' জলধর সেন-কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স।

৫. **মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা**। আষাঢ় ১৩২৬। পৃ. ১/০+২+৪৪। সচিত্র।
আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার,/এম্-এ, পি-আর-এস্, আই-ই-এস্/লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।/১৩২৬/আষাঢ়/মূল্য ॥৵০ আনা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু মোগল শাসনকালে মুসলমান অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষার আলোচনা। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স।

৬. **মোগল-বিদুষী**। (ফাল্গুন ১৩২৬)। পৃ. [৪]+১১৬+[২]। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত।
পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ :

মোগল-বিদুষী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/মোস্লেম্ প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানী/লিমিটেড্/২৮৫।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/মূল্য ১৲ টাকা

পুস্তকের বিষয়বস্তু জেবউন্নিসা ও গুলবদনের জীবনকাহিনী।

৭. **জহান্-আরা।** (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। পৃ. ১০+[২]+৯২। সচিত্র। প্রমাণপঞ্জী-সম্বলিত।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

জহান্-আরা/(ঐতিহাসিক চিত্র) / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দি নরদার্ণ বুক ডিপো,/১৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/মূল্য ১৷০

গ্রন্থের 'ভূমিকা' যদুনাথ সরকারের লিখিত। প্রকাশক টেম্প্ল্ প্রেসের পক্ষে এস. বি. চক্রবর্ত্তী।

"ইহাতে শুধু যে জহান্-আরার দেব-চরিত আছে এমন নহে, পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তিগণও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে জীবনী ও ইতিহাস।" ('ভূমিকা')

৮. **রাজা-বাদশা।** বৈশাখ ১৩২৮।

গ্রন্থের ভূমিকা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত। পুস্তকটি ইতিহাসের গল্পের সংগ্রহ। ২য় সংস্করণ : ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. [৪]+৬২, সচিত্র, প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

৯. **রণ-ডঙ্কা।** ভাদ্র ১৩২৯। পৃ. [২]+৩৯। সচিত্র। ৪টি ঐতিহাসিক গল্পের সংগ্রহ।

পুস্তকের আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

রণ-ডঙ্কা/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স/৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা/১৩২৯—ভাদ্র/মূল্য বারো আনা

১০. **দিল্লীশ্বরী।** বৈশাখ ১৩৩০। পৃ. [২]+১১৮। সচিত্র। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তাশীতিতম গ্রন্থ/ দিল্লীশ্বরী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ / ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা/ বৈশাখ—১৩৩০

বিষয়বস্তু রাজিয়া (পৃষ্ঠা ১-৫০) ও নূরজহানের (পৃষ্ঠা ৫১-১১৩) জীবনকথা।

১১. **কেল্লা-ফতে।** আষাঢ় ১৩৩১। গল্পগ্রন্থ। ২য় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ. ৫৭, সচিত্র, প্রকাশক রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

১২. **Begam Samru.** (সেপ্টেম্বর) ১৯২৫ খ্রী। পৃ. xiii+[২]+২২৮। সচিত্র। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত। বেগম সমরুর জীবনেতিহাস পুস্তকটির বিষয়বস্তু।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ :

Begam Samru/by/Brajendranath Banerji/with a foreword by/ Jadunath Sarkar, M.A., I.E.S./M.C. Sarkar & Sons,/Calcutta/1925

১৩. **Rajah Rammohun Roy's Mission to England.** (মে) ১৯২৬ খ্রী। পৃ. viii+৬৯। সচিত্র।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল :

Rajah Rammohun Roy's/Mission to England/based on un-

published records/by/Brajendranath Banerji/N. M. Raychowdhury & Co./Calcutta/1926

১৪. **Dawn of New India**. (জুলাই) ১৯২৭ খ্রী। পৃ. vii+[১]+১২৬।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

Dawn of New India/by/Brajendranath Banerji/Author of Begam Samru, etc./with a foreword/by/Sir Evan Cotton, Kt., C.I.E./M.C. Sarkar & Sons/Calcutta/1927

পুস্তকটি The Sanyasi rebellion in Bengal, Pandit Jagannath Tarkapanchanan এবং The College of Fort William, এই তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।

১৫. **শিবাজী মহারাজ**। (ফাল্গুন ১৩৩৫)। পৃ. [৬]+৮০। সচিত্র।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

শিবাজী মহারাজ/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স/কলিকাতা

গ্রন্থটি শিবাজীর জীবনের ৪টি কাহিনীর সংকলন। 'পরিচয়' যদুনাথ সরকার কর্তৃক লিখিত।

১৬. **বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ**। (বৈশাখ) ১৩৩৮। পৃ. ২৬+[২]+১২২+[২]। সচিত্র।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত / মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই. ই. / লিখিত ভূমিকা / গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স/ কলিকাতা/১৩৩৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, গ্রন্থাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের আলোচ্য।

১৭. **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**। ৩ খণ্ড। ১ম খণ্ড (১৮১৮-৩০ খ্রী): প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ২+৸৶০+২২৪, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথা/প্রথম খণ্ড/১৮১৮-১৮৩০/ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, কলিকাতা/ ১৩৩৯

গ্রন্থটি ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা হইতে লব্ধ বাঙ্গালী-জীবনসম্বন্ধীয় তথ্যের সংকলন। পরিশিষ্টে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'বঙ্গদূত' পত্রিকার তৎকালীন কয়েকটি খণ্ড হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতি সুবিন্যস্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকা লেখকের লিখিত।

২য় খণ্ড (১৮৩০-৪০ খ্রী): প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ১৷৷০+৫১৫, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথা/দ্বিতীয় খণ্ড/১৮৩০-

১৮৪০/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, কলিকাতা/১৩৪০

গ্রন্থটি ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যসংকলন। পরিশিষ্টে 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

৩য় খণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট): প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪২, পৃ. ॥৶০ + ৪৬৮, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথা/তৃতীয় খণ্ড/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা/আষাঢ় ১৩৪২

গ্রন্থটির ১-১৯০ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ এবং ১৯১-৪৩২ পৃষ্ঠা ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট-স্বরূপ রচিত।

১৮. **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।** জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০। পৃ. ॥০ + ॥০ + ২২৩।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮৩/বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়/প্রণীত/শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ., ডি. লিট্./লিখিত ভূমিকা-সহিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির/কলিকাতা/১৩৪০

হেরাসিম লেবেডেফ কর্তৃক প্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইতে শুরু করিয়া হিন্দু থিয়েটার, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রভৃতি সখের নাট্যশালার বিকাশের মধ্য দিয়া ক্রমে ন্যাশন্যাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার ইত্যাদি সাধারণ রঙ্গালয়ের বিবর্তনের মাধ্যমে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

১৯. **বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তালিকা।** আশ্বিন ১৩৪০। পৃ. ৶০ + ১৯৮।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার/(১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত)/বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তালিকা/আশ্বিন, ১৩৪০

আখ্যাপত্রে সংকলয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁহার স্বাক্ষরিত ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে গ্রন্থখানি তাঁহারই সংকলিত:

"এই তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার গত বৎসর পরিষদের পুস্তকালয়-সমিতি আমার উপর অর্পণ করেন। পরিষদের কর্ম্মচারী শ্রীযুত শশীন্দ্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশের সহকারিতায় কয়েক মাসের পরিশ্রমে আমি বর্ত্তমান তালিকাখানি সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

২০. দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। মাঘ ১৩৪২। পৃ. ॥০+১২৪ +।৵০।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮৬/দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস/প্রথম খণ্ড/১৮১৮-১৮৩৯/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস/২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা/১৩৪২

পুস্তকটির বিষয়বস্তু ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী সাময়িক-পত্রের বিবরণ। ইহার বিষয়বস্তু পরে 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২১. পরিষৎ-পরিচয়। কার্তিক ১৩৪৬। পৃ. ৵০+২০২+৩৬+১৬।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি এইরূপ :

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮৮ / পরিষৎ-পরিচয় / কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/কর্তৃক সঙ্কলিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/কলিকাতা

গ্রন্থটির বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদি হইতে পুস্তকপ্রকাশের কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস।

২২. বাংলা সাময়িক-পত্র। ২ খণ্ড। ১ম খণ্ড : প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ॥•+৩৩৬, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮৬/বাংলা সাময়িক-পত্র / ১৮১৮-১৮৬৭ / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস/২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা/১৩৪৬

প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' অংশে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, অনেক দিন হইতেই তাহার একটি নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার বাসনা ছিল। ১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড' এই নামে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস আমি প্রকাশও করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই পুস্তকান্তর্গত সমুদয় অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

২য় খণ্ড (১৮৬৮-১৯০০ খ্রী): প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৫৮; দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ. ১০৮, প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২৩. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকগুলির প্রথম প্রকাশকাল মাঘ ১৩৪৬—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯। প্রত্যেক গ্রন্থে সাহিত্য-সাধকের জন্ম, ছাত্রজীবন, চাকরি, মৃত্যু, গ্রন্থাবলী, বাংলাসাহিত্যে অবদান প্রভৃতি বিষয় আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে। কোনও কোনও গ্রন্থ সচিত্র। প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত পুস্তকগুলির গ্রন্থ-সংখ্যা ও নাম প্রদত্ত হইল : ১. কালীপ্রসন্ন সিংহ ২. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য ৩. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৪. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. রামনারায়ণ তর্করত্ন ৬. রামরাম বসু ৭. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ৮. গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৯. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ১০. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১২. অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩. জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৪. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ১৬. রাম-মোহন রায় ১৭. গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার ১৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৯. প্যারীচাঁদ মিত্র ২০. দীনবন্ধু মিত্র ২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-প্রণীত) ২৩. মধুসূদন দত্ত ২৪. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ২৫. বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত ২৬. শ্যামাচরণ শর্ম্মসরকার, রামচন্দ্র মিত্র ২৭. নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ ২৮. স্বর্ণকুমারী দেবী ২৯. মীর মশারূরফ হোসেন ৩০. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি ৩১. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৩২. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫. হরিনাথ মজুমদার ৩৬. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ৩৯. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন ৪০. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪১. নবীনচন্দ্র সেন ৪২. গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু ৪৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪৪. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৬. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭. নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর ৪৮. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০. রাজকৃষ্ণ রায় ৫১. মনোমোহন বসু ৫২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৩. হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র ৫৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৬. অক্ষয়কুমার বড়াল ৫৭. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৮. কামিনী রায় ৫৯. মানকুমারী বসু ৬০. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬১. দেবেন্দ্র-নাথ সেন ৬২. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৬৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৬৫. রমেশচন্দ্র দত্ত ৬৬. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭. সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৬৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৭০. রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী ৭১. রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৭৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭৪. গোবিন্দচন্দ্র দাস ৭৫. শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৬. অক্ষয়-চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭. চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু ৭৮. নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৭৯. রজনীকান্ত সেন ৮০. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮১. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায় ৮২. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩. চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত ৮৪. ভুবন-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৮৫. দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, উমেশচন্দ্র

বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৮৬. শিশিরকুমার ঘোষ ৮৭. অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৮. ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট ৮৯. চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা, লিপিতত্ত্ববিশারদ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ৯০. দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর ৯১. গিরিশচন্দ্র বসু ৯৩. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪. প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী।

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের অনুলিপি দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থটির নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', রচয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৯ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০২। গ্রন্থটি সচিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রীসজনীকান্ত দাস/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড/কলিকাতা

২৪. **রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।** ২ পৌষ ১৩৪৯। পৃ. ॥০+৭১+।৵০।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৮৯ / রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত ভূমিকা / সাহিত্য-নিকেতন / পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া/কলিকাতা

পুস্তকের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ও গান, ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২৫. **Bengali Stage : 1795-1873.** (জানুয়ারি) ১৯৪৩ খ্রী। পৃ. viii+[২]+৫৮।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

Bengali Stage/1795-1873./By/Brajendra Nath Banerjee/With a Foreword by/Dr. Suniti Kumar Chatterji, M. A. (Cal.), D. Lit. (London)/Khaira Professor of Indian Linguistics & Phonetics in the/ University of Calcutta/Ranjan Publishing House/25|2 Mohanbagan Row, Calcutta/1943

২৬. **মহারাণা প্রতাপসিংহ।** ৯ মাঘ ১৩৪৯। পৃ. ২২। ইতিহাসের গল্প।

আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

মহারাণা প্রতাপসিংহ/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সাহিত্য-নিকেতন/পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া/কলিকাতা

২৭. **বঙ্গীয় নাট্যশালা : ১৭৯৫-১৮৭৩।** ১ ফাল্গুন ১৩৫০। পৃ. ৭৬। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ-১৫।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বঙ্গীয় নাট্যশালা/১৭৯৫-১৮৭৩/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট/কলিকাতা

লেবেডেফ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা হইতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার পর্যন্ত নাট্যশালার ইতিহাস—সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা এবং কয়েকজন নাট্যকারের নাট্যগ্রন্থের তালিকাসহ।

২৮. **বাংলা সাময়িক সাহিত্য : ১৮১৮-১৮৬৭।** চৈত্র ১৩৫১। পৃ. ৮৬। বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ—৩৩।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

বাংলা সাময়িক সাহিত্য/১৮১৮-১৮৬৭/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয়বস্তু 'দিগদর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) হইতে 'নব পত্রিকা' (নভেম্বর ১৮৬৭) পর্যন্ত সাময়িক-পত্রের বিবরণ।

২৯. **শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।** ফাল্গুন ১৩৫৪। পৃ. ১৲+১৯০। সচিত্র।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি দেওয়া হইল :

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত/বুকল্যাণ্ড লিমিটেড/ পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক/১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

শরৎচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী, গ্রন্থতালিকা, রেঙ্গুনের পত্র ও বিবিধ পত্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

৩০. **কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস।** ১ম খণ্ড : ১৮২৪-১৮৫৮। প্রকাশকাল (আশ্বিন) ১৩৫৫। পৃ. [৬]+৯০। সচিত্র। ভূমিকা : যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের / ইতিহাস / (কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে জয়ন্তী গ্রন্থ)/প্রথম খণ্ড :/১৮২৪-১৮৫৮/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত

৩১. **আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার।** ২৪ মাঘ ১৩৫৫। পৃ. ১২+৩। সচিত্র। (প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ)।

পুস্তকটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নরূপ :

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার/(সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাপঞ্জী ও মানপত্র)/অষ্টসপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক সঙ্কলিত/২৪ মাঘ ১৩৫৫/৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

৩২. **পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬)।** ফাল্গুন ১৩৫৬। পৃ. ৯৬।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

পরিষৎ-পরিচয়/(১৩০০-১৩৫৬) / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড/কলিকাতা

প্রাসঙ্গিক কালে পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

৩৩. **শ্রীসজনীকান্ত দাস**। ৯ ভাদ্র ১৩৫৭। পৃ. ৪২। সচিত্র।

পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ :

শ্রীসজনীকান্ত দাস/পঞ্চাশত্তম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত

সজনীকান্তের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী, সাময়িকপত্র-সম্পাদন, চিত্রনাট্য-প্রণয়ন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশক : শনিরঞ্জন প্রেস।

৩৪. **শরৎ-পরিচয়**। মাঘ ১৩৫৭। পৃ. ১৩০। সচিত্র।

পুস্তকের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

শরৎ-পরিচয়/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস/৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া/কলিকাতা-৩৭

শরৎচন্দ্রের জীবনী, রচনাবলী, পত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশক : রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস।

৩৫. **বঙ্গসাহিত্যে নারী**। মাঘ ১৩৫৭। পৃ. ২৮+[৩]। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৮৩।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

বঙ্গসাহিত্যে নারী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

"গত শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যেসকল মহিলা বিশিষ্টতা অর্জন করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় ও রচনাপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে"।

৩৬. **সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী**। ফাল্গুন ১৩৫৭। পৃ. ৩৪+[৩]। সচিত্র। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৮৪।

আখ্যাপত্র এইরূপ :

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

বিষয়বস্তু মহিলা-পরিচালিত বাংলা পত্রপত্রিকার বিবরণ।

৩৭. **শরৎচন্দ্রের রচনাবলী**। আষাঢ় ১৩৫৮। পৃ. ২+২+৩৭৯।

আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নরূপ :

শরৎচন্দ্রের/রচনাবলী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত/গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্/২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট···কলিকাতা-৬

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও কালানুক্রমিক গ্রন্থতালিকা -সহ।

৩৮. **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)**। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। পৃ. ৮৶০+২৪৬। সচিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষরসম্বলিত। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত।

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস/(সমসাময়িক দৃষ্টিতে)/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রীসজনীকান্ত দাস/রঞ্জন পাবলিশিং হাউস/৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

সমকালীন সাময়িক-পত্র ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা, সমসাময়িক সুধিবৃন্দের স্মৃতিকথা, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা প্রভৃতি আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়ভুক্ত।

৩৯. **মোগল-পাঠান**। আষাঢ় ১৩৫৯। পৃ. ।৵০+[২]+১৩০। সচিত্র।

পুস্তকের আখ্যাপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/মোগল-পাঠান/রঞ্জন পাবলিশিং হাউস/৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

পুস্তকটি পূর্বপ্রকাশিত 'রাজা-বাদশা', 'রণ-ডঙ্কা' ও 'কেল্লা-ফতে' গ্রন্থত্রয়ের সংকলন। ১৫টি ঐতিহাসিক গল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভূমিকা : যদুনাথ সরকার।

খ. ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা

১. **দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা**। ১৩৪৩-৪৬ বঙ্গাব্দ। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থের নূতন সংস্করণ। গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রথম ১১ খানি গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পাদিত : ১. কলিকাতা কমলালয় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ২. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ (রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়) : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৩. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (রামরাম বসু) : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৪. বেদান্ত চন্দ্রিকা (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৫. ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট (তারিণীচরণ মিত্র) : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৬. স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক (গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার) ৭. নববাবুবিলাস (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৮. পাষণ্ডপীড়ন (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন) : ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ৯. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবুদের দুর্গোৎসব : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১০. বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১১. দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য) : ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত মূল লেখকের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

২. **মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী**। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ : বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্ত চন্দ্রিকা, প্রবোধ চন্দ্রিকা, An Apology for the Present System of Hindoo Worship. প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

গ. ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা

১. **বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী**, ৩ খণ্ড। ১৩৪৪-৪৬ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : সাহিত্য : ফাল্গুন ১৩৪৪ ; ২য় খণ্ড : সমাজ : ফাল্গুন ১৩৪৫ ; ৩য় খণ্ড : শিক্ষা ও বিবিধ : চৈত্র ১৩৪৬।

সম্পাদনা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। প্রকাশক : মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি।

২. **বঙ্কিম-রচনাবলী,** ৯ খণ্ড। ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্দ। বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ। প্রত্যেক গ্রন্থে ভূমিকা ও সংস্করণভেদে পাঠভেদ প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা : যদুনাথ সরকার। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩. **আলালের ঘরের দুলাল** (টেকচাঁদ ঠাকুর)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। লেখকের জীবনীসহ ভূমিকাসম্বলিত। সচিত্র। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪. **রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ,** ২ খণ্ড। ১৩৪৭-৪৮ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৫. **মধুসূদন-গ্রন্থাবলী,** ২ খণ্ড। ১৩৪৭-৪৮ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : কাব্য। ২য় খণ্ড : নাটক ও প্রহসন। সংস্করণভেদে পাঠভেদ, দুরূহ শব্দার্থ ও ভূমিকাসহ। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬. **ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী,** ২ খণ্ড। ১৩৪৯-৫০ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : মাঘ ১৩৪৯; ২য় খণ্ড : ভাদ্র ১৩৫০। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৭. **বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা।** ১৩৪৯-৫১ বঙ্গাব্দ। ১. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (চৈত্র ১৩৪৯) ২. বলদেব পালিত (অগ্রহায়ণ ১৩৫০) ৩. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাদ্র ১৩৫১)। প্রকাশক : সাহিত্য-নিকেতন (১ম ও ২য় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (৩য় খণ্ড)।

৮. **দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী,** ২ খণ্ড। ১৩৫০-৫১ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী : (আষাঢ় ১৩৫০—শ্রাবণ ১৩৫১); ২য় খণ্ড : সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা, কমলে কামিনী নাটক, বিবিধ : (অগ্রহায়ণ ১৩৫০—ভাদ্র ১৩৫১)। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৯. **পালামৌ** (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। বৈশাখ ১৩৫১। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১০. **রামমোহন-গ্রন্থাবলী,** ১-৭ খণ্ড। ১৩৫১-৫৯ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, পঞ্চোপনিষৎ : (শ্রাবণ ১৩৫৮); ২য় খণ্ড : শাস্ত্রীয় বিচার : (আষাঢ় ১৩৫৯); ৩য় খণ্ড : সহমরণ : (অগ্রহায়ণ ১৩৫১); ৪র্থ খণ্ড : গায়ত্রী, অনুষ্ঠান ইত্যাদি : (আষাঢ় ১৩৫৯); ৫ম খণ্ড : ব্রাহ্মণ সেবধি, পাদরি-শিষ্য সম্বাদ : (আষাঢ় ১৩৫৯); ৬ষ্ঠ খণ্ড : চারি প্রশ্নের বিচার প্রভৃতি : (ফাল্গুন ১৩৫২); ৭ম খণ্ড : গৌড়ীয় ব্যাকরণ : (আষাঢ় ১৩৫৯)। সম্পাদকীয় টীকাসহ। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১১. **শকুন্তলা** (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। অগ্রহায়ণ ১৩৫২। ভূমিকাসহ। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১২. **দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী** (কবিতা ও গান)। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থাবলীর

অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ : আর্য্যগাথা (১ম ও ২য় ভাগ), আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, গান, The Lyrics of Ind. প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৩. **হুতোম প্যাঁচার নক্শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব** (যথাক্রমে কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ)। বৈশাখ ১৩৫৫। গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৪. **সীতার বনবাস** (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। আশ্বিন ১৩৫৫। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৫. **রামেন্দ্র-রচনাবলী** (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী), ১-৫ খণ্ড। ১৩৫৬-৫৭ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা : (আষাঢ় ১৩৫৬); ২য় খণ্ড : কর্ম্মকথা, চরিতকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ : (আশ্বিন ১৩৫৬); ৩য় খণ্ড : শব্দ-কথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ-কথা : (ফাল্গুন ১৩৫৬); ৪র্থ খণ্ড : নানা কথা, জগৎ-কথা, পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা : (আষাঢ় ১৩৫৭); ৫ম খণ্ড : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ : (মাঘ ১৩৫৭)। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৬. **সারদামঙ্গল** (বিহারিলাল চক্রবর্তী)। ফাল্গুন ১৩৫৬। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৭. **মহিলা** (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)। বৈশাখ ১৩৫৭। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৮. **শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী**। শ্রাবণ ১৩৫৭। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১৯. **স্বর্ণলতা** (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)। কার্তিক ১৩৫৭। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২০. **পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী**, ২ খণ্ড। ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড (ভূমিকাসহ): ফাল্গুন ১৩৫৭; ২য় খণ্ড (জীবনকথাসম্বলিত ভূমিকাসহ): আষাঢ় ১৩৫৮। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২১. **পদ্মিনী উপাখ্যান** (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। আশ্বিন ১৩৫৮। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২২. **সে কাল আর এ কাল** (রাজনারায়ণ বসু)। আশ্বিন ১৩৫৮। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২৩. **বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী** (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯। সচিত্র। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত : চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনা। ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা

বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকপত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা সুসাধ্য নহে এবং এ-সকল রচনার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ায় পৃথক বিস্তারিত তালিকার প্রয়োজনও সীমাবদ্ধ। নিম্নে নানা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনার নিদর্শন হিসাবে কতকগুলির তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল :

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আর্য্যাবর্ত্ত		
আলিবর্দ্দী-বেগম	১৩১৯ ভাদ্র	৩২৫-৩২৯
জিন্নতুন্নিসা বেগম	„ পৌষ	৬৪৬-৬৪৯
বেদাদি গ্রন্থে সূর্য্য	১৩২০ বৈশাখ	২৩-৩১
ঐতিহাসিক চিত্র		
তুর্কজাতির উৎপত্তি	১৩১৬ অগ্রহায়ণ	৩৭১-৩৭৭
চীনের উৎসব	„ ফাল্গুন	৪৯৫-৫০৭
আধুনিক আরবজাতি	„ চৈত্র	৫৪৪-৫৫০
কোরাণ সরিফ	১৩১৭ বৈশাখ	৩০-৩৪
ঐ	„ আষাঢ়	১২১-১৫৩
খোকা-খুকু		
বুদ্ধির বহর (ঐতিহাসিক কাহিনী)	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ	৪৮-৫১
মোগল-পাঠান (ঐ)	„ কার্তিক	২৫২-২৫৬
গরীবের মা-বাপ (ঐ)	„ অগ্রহায়ণ	৩১৬-৩১৮
ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধি (ঐ)	„ চৈত্র	৪৭৩-৪৭৫
শের শার চালাকী (ঐ)	১৩৩১ বৈশাখ	১৩-১৬
নিমকের মান (ঐ)	„ জ্যৈষ্ঠ	৪৬-৪৯
ফকীর না সুলতান ? (ঐ)	„ আষাঢ়	৯৬-৯৮
খোদা দেনেওয়ালা (ঐ)	„ শ্রাবণ	১২৮-১৩০
মান-রক্ষা (ঐ)	„ আশ্বিন	২১৭-২২১
দেশ		
ঈশ্বর গুপ্তের আমলের মহিলা-কবি	১৩৪২, ৭ অগ্রহায়ণ	৬৩-৬৬
ঐ	„ ২৮ „	২৬৫-২৬৬
পঞ্চপুষ্প		
"প্যারীচাঁদ মিত্র" (আলোচনা)	১৩৩৭ মাঘ	৫০৭
সেকালের কথা (প্রাচীনপন্থী)	১৩৩৮ বৈশাখ	৮৯-১০১
ঐ	„ জ্যৈষ্ঠ	২৩১-২৩৮

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	
প্রবাসী		
হিন্দুকুমারীদের গঙ্গাবক্ষে প্রদীপ ভাসান প্রথা (আলোচনা)	১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ	১৭৯
লুৎফ-উন্নিসা বেগম	১৩১৯ পৌষ	২৬৬-২৭১
রাজিয়ার শেষজীবন	১৩২৮ পৌষ	৩৭১-৩৭৫
রামমোহন রায় ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা	১৩৩৬ বৈশাখ	১২-১৮
রামমোহন রায় ও রাজারাম	„ অগ্রহায়ণ	২১৯-২২৯
বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদ-পত্র	„ ফাল্গুন	৬৫৫-৬৫৬
"রামমোহন রায় ও রাজারাম" : প্রত্যুত্তর (আলোচনা)	„ চৈত্র	৮৪৩-৮৪৭
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	১৩৩৭ আষাঢ়	৩৬০-৩৬৫
আমাদের দেশের প্রথম সংবাদপত্র	১৩৩৮ বৈশাখ	২৫-৩১
সমসাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা	„ আষাঢ়	৩১৪-৩২৫
ঐ	„ শ্রাবণ	৪৭৩-৪৮২
কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী (আলোচনা)	„ শ্রাবণ	৪৮৯-৪৯২
'যাত্রা' (আলোচনা)	„ পৌষ	৩৬৯-৩৭০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	„ ফাল্গুন	৬৫৪-৬৫৯
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা	১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ	১৭৮-১৭৯
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (কষ্টিপাথর)	„ জ্যৈষ্ঠ	২৩৮-২৩৯
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা	„ শ্রাবণ	৪৫৪
সেকালের কথা (পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)	১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ	১৭০-১৭৩
ঐ	„ ভাদ্র	৬২৬-৬২৯
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মতারিখ	১৩৪১ শ্রাবণ	৪৭১-৪৭২
বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান	„ কার্তিক	৩৮-৩৯
ভারতের লিপিসমস্যা	„ মাঘ	৫১৫-৫১৮
শেখ বক্সুই কি রাজারাম ? : প্রত্যুত্তর (আলোচনা)	১৩৪২ শ্রাবণ	৫১৫-৫১৬
ইংলণ্ডযাত্রায় রামমোহন রায়ের সহযাত্রী পরিচারকবর্গ (আলোচনা)	„ আশ্বিন	৮২৮
রামমোহন ও রাজারাম [উত্তর]	„ মাঘ	৫৪১-৫৪৯
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ	১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ	১৫৯-১৬৬
ঐ	„ আষাঢ়	৩১৮-৩৩১
"কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়" (আলোচনা)	„ আষাঢ়	৪১৪-৪১৫
স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা	১৩৪৫ অগ্রহায়ণ	২৩০-২৩৩
নবাবিষ্কৃত রামমোহন রায়-প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'	১৩৪৬ ফাল্গুন	৬৪৩-৬৪৫

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র	১৩৫৫ অগ্রহায়ণ	১৩৪-১৩৭
লিপিতত্ত্ববিৎ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	„ মাঘ	৩৬৪-৩৬৬
সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা	১৩৫৬ বৈশাখ	২৯-৩২
বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র	„ আষাঢ়	২১৮
"সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল" (আলোচনা)	১৩৫৭ শ্রাবণ	৩৭৩
"সাহিত্যে নারী : স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি" (সমালোচনা)	„ আশ্বিন	৫৬৬
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	„ কার্তিক	৫৬-৫৮
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	„ অগ্রহায়ণ	১৭১-১৭৬
সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন	১৩৫৮ বৈশাখ	৩২-৩৩
দামোদর মুখোপাধ্যায় (বিদ্যানন্দ)	„ আষাঢ়	২২৩-২২৫
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	„ পৌষ	২৯৬
কথা-সাহিত্যের প্রথম যুগ	„ মাঘ	৪০৯-৪১০
সখারাম গণেশ দেউস্কর	„ চৈত্র	৭১৮-৭২৪
"শরৎ-পরিচয়" (পুস্তক-পরিচয়)	১৩৫৯ আষাঢ়	৩৭৭

বঙ্গশ্রী

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়	১৩৩৯ মাঘ	৯-২২
ঐ	„ ফাল্গুন	১৪৯-১৫৭
ঐ	„ চৈত্র	২৭৩-২৮৩
ঐ	১৩৪০ বৈশাখ	৪০৫-৪১৩
ঐ	„ জ্যৈষ্ঠ	৫৪১-৫৫২
রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)	„ আশ্বিন	২৮১-২৯২
রামমোহন রায় (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)	„ অগ্রহায়ণ	৫৬৮-৫৭৫
রামরাম বসু ও রামমোহন রায়	১৩৪১ আষাঢ়	৭৪২-৭৪৮
ধর্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি	„ শ্রাবণ	৯৮-১০৯
রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল	১৩৪২ ভাদ্র	২০৯

বাণী

শাস্ত্র-বিশারদ জৈনাচার্য্য শ্রীবিজয়ধর্ম্ম সূরি	১৩১৭ আষাঢ়	১৫০-১৬১
বাঙ্গালার বেগম—আমিনা	„ আশ্বিন-কার্তিক	৩৪১-৩৪৪
ঐ	„ অগ্রহায়ণ	৪৬৮-৪৭৭

বিশ্বভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক-পত্র	১৩৫১ কার্তিক-পৌষ	১০১

ভারতবর্ষ

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃ
মণিবেগমের মৃত্যু-তারিখ (বিবিধ-প্রসঙ্গ)	১৩২৪ অগ্রহায়ণ	৮৬০
মহাবৎ খাঁ কি রাজপুত ?	" পৌষ	১২০
মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর	" মাঘ	২২১-২২৮
ঐ	" ফাল্গুন	৩১৫-৩২৪
ঐ	১৩২৫ বৈশাখ	৬৬৩-৬৬৬
ঐ	" আষাঢ়	১১৯-১২৫
ঐ	" ভাদ্র	৩৫৮-৩৬৩
ঐ	" পৌষ	১৮-৩২
সম্রাট্ আক্‌বরের জন্মস্থল (আলোচনা)	১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ	৮৪০-৮৪১
মোগলযুগে স্ত্রী-শিক্ষা	" আষাঢ়	৩২-৪২
আক্‌বরের গুজরাট্ অভিযান	" পৌষ	৯৮-১০৭
সুলতানা রজিয়া	১৩২৭ আষাঢ়	১৮-২৩
ঐ	" শ্রাবণ	২০৪-২০৮
ভারতে বিদেশী ভাগ্যান্বেষী	১৩২৮ আষাঢ়	৭৮-৮১
পাঠান-যুগে ভারত	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ	৮০৭-৮১২
দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী	" শ্রাবণ	২৪২-২৪৪
বাদশাহী কথা	" পৌষ	৭৪-৮৩
বেগম সমরুর জীবন-সন্ধ্যা	১৩৩০ আষাঢ়	৬১-৬৬
বেগম সমরুর ভূ-সম্পত্তি	" ভাদ্র	৩৪৭-৩৫৪
ঐ	" আশ্বিন	৫৭৩-৫৭৫
সার্ধানার শোচনীয় অবস্থা	" অগ্রহায়ণ	৯০৭-৯১২
বেগম সমরুর জীবনী	১৩৩১ আষাঢ়	১০৯-১১২
হুমায়ুন্-নামা	" অগ্রহায়ণ	৯৩০-৯৩১
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	১৩৩৪ আষাঢ়	১১৮-১২২
শিক্ষা-বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	" মাঘ	২৫৬-২৫৯
ঐ	" চৈত্র	৪৯৫-৫০১
শিক্ষা-বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৩৩৫ আষাঢ়	২৯-৩২
ঐ	" শ্রাবণ	২৯৩-৩০০
স্ত্রী-শিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	" মাঘ	২২৮-২৩১
রংপুরে রামমোহন রায়	১৩৩৬ আষাঢ়	৮০-৮৬
ঐ	" মাঘ	২৫১-২৫৩
বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের গোড়ার কথা	১৩৩৭ আষাঢ়	১২১-১২৮

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ফার্সী সংবাদপত্রের ইতিহাসের গোড়ার কথা	১৩৩৭ শ্রাবণ	২৮৭-২৯১
"প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" (আলোচনা)	„ শ্রাবণ	৩০৪
বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস (১৮২২-১৮৩৫)	„ ভাদ্র	৪৫৮-৪৬২
প্রাচীন বাংলা সংবাদপত্রের কথা	„ কার্তিক	৭৫৪-৭৫৮
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ	„ অগ্রহায়ণ	৮৮৬-৮৮৮
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সরকারের বেসরকারী পরামর্শদাতা	„ পৌষ	৪৪-৪৯
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে	„ মাঘ	১৮৭-১৯২
"সমাচার দর্পণ" পত্রের ইতিহাস	„ ফাল্গুন	৪৩৩-৪৪০
সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (১)	„ চৈত্র	৫৩৭-৫৪৯
ঐ (২)	১৩৩৮ বৈশাখ	৭০১-৭১৬
ঐ (৩)	„ জ্যৈষ্ঠ	৮৯৯-৯১৩
ঐ (৪)	„ আষাঢ়	১৮-৩৫
ঐ (৫)	„ শ্রাবণ	২৫২-২৬৮
কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা	„ শ্রাবণ	৩৩০-৩৪১
সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৬)	„ ভাদ্র	৪১১-৪২১
ঐ (৭)	„ আশ্বিন	৬০৪-৬১৪
মীরকাসিমের শেষজীবন	„ অগ্রহায়ণ	৮৫৭-৮৬২
সংবাদ প্রভাকরে সেকালের কথা	„ মাঘ	২২৫-২৩৯
লুৎফ-উন্নিসা বেগম	১৩৪১ পৌষ	৪৯-৫২
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ	১৩৪২ বৈশাখ	৭৫৭-৭৬৫
বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা	১৩৪৪ আষাঢ়	৬০-৬৫

ভারতী

মণিবেগম	১৩১৯ আষাঢ়	২৩৯-২৪৮
গুলবদন	১৩২২ বৈশাখ	৪৭-৫৫

মানসী ও মর্ম্মবাণী

মুর্শিদাবাদের কয়েকটী স্মৃতিচিহ্ন	১৩২২ ফাল্গুন	৩৫-৪০
সলিমা সুলতান বেগম	১৩২৩ আষাঢ়	৫৫৯-৫৬১

মাসিক বসুমতী

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	১৩৩৯ বৈশাখ	৮৯-৯৫
ঐ	„ জ্যৈষ্ঠ	২১১-২১৭

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	১৩৩৯ আষাঢ়	৩৮২-৩৯২
ঐ	„ শ্রাবণ	৬৬৫-৬৭৫
ঐ	„ কার্তিক	৬২-৭২
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ	১৩৫৩ বৈশাখ	৩৮
বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সাধনা	১৩৫৬ শ্রাবণ	৪৫০
নৈহাটীর নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু	„ আশ্বিন	৭৬৯-৭৭২
সেকালের তরুণ-পাঠ্য পত্র-পত্রিকা	„ আশ্বিন	৮৫৪-৮৫৬
নিত্যকৃষ্ণ বসু	„ ফাল্গুন	৬০৫-৬০৮
কেশবচন্দ্র ও ভারত-সংস্কার-সভা	১৩৫৭ বৈশাখ	৩৩-৩৫
ঐ	„ জ্যৈষ্ঠ	১৯২-১৯৬
রজনীকান্ত সেন	„ শ্রাবণ	৫১৭-৫২১
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'স্বরাজ'	„ ভাদ্র	৭০৭-৭১১
চন্দ্রনাথ বসু	„ ফাল্গুন	৬০৯-৬১৫
বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৩৫৮ বৈশাখ	৪৪-৪৮
ঐ	„ জ্যৈষ্ঠ	২২৭-২৩৩
ঐ	„ আষাঢ়	৩৬৩-৩৬৬
ঐ	„ শ্রাবণ	৫৩০-৫৩৪
ঐ	„ ভাদ্র	৬৩২-৬৩৫
ঐ	„ আশ্বিন	৭৮৬-৭৯০
অধরলাল সেন	„ অগ্রহায়ণ	১৯৬-১৯৭
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগ-শাস্ত্রী	„ মাঘ	৫২১-৫২৩
বাংলা সাময়িক পত্র (ইং ১৮৯৬-১৯০০)	১৩৫৯ বৈশাখ	৫০-৫৫

মাসিক মোহাম্মদী

লুৎফ-উন্নিসা বেগম	১৩৪২ শ্রাবণ	৬৭৪-৬৭৬

যমুনা

সংযম (গল্প)	১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ	৫৩-৫৮
মমতাজ	১৩২০ পৌষ	৪১৫-৪১৯

শনিবারের চিঠি

পুরাতনী	১৩৩৮ আশ্বিন	৩৭-৪৩
বঙ্কিম-জীবনী	„ কার্তিক	১৭১-১৮৯
বঙ্কিম-জীবনী (২)	„ অগ্রহায়ণ	২৮৮-৩২০
বঙ্কিম-জীবনী (৩)	„ মাঘ(পরিশিষ্ট)	৴০-১৷৷৴০

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী	১৩৪৯ আষাঢ়	২৫৭-২৬৫
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দাঁতভাঙ্গা কাব্য"	১৩৫০ বৈশাখ	১৪-১৬, ৬৫-৬৬
মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিকপত্র	" কার্তিক	১৯-২০
মহিলা-পরিচালিত প্রথম পাক্ষিক পত্র	" অগ্রহায়ণ	১৬০
নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর	১৩৫১ আশ্বিন	৪৬৫-৪৬৯
কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য	১৩৫২ আশ্বিন	৭৩২-৭৩৭
ঐ	" কার্তিক	২৮-৩১
ঐ	" অগ্রহায়ণ	১৭০-১৭৪
শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়	" পৌষ	২২৭-২৩৫
ঐ	" মাঘ	২৯৫-৩০৮
ঐ	" ফাল্গুন	৩৮০-৩৯৬
ঐ	" চৈত্র	৪১৬-৪৪৮
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	১৩৫৩ আষাঢ়	১৯১-১৯৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	" শ্রাবণ	২৭৯-২৮৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	" আশ্বিন	৪৪১-৪৪৮
শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী	" কার্তিক	১৭-১৯
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	" কার্তিক	৩৮-৪০
ঐ	" অগ্রহায়ণ	১৪৯-১৫০
'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা	" পৌষ	১৬৬-১৮০
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	" পৌষ	১৯২-১৯৪
'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা	" মাঘ	২৬১-২৭৪
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	" মাঘ	২৯৫-২৯৭
রবীন্দ্রনাথ ও 'ঐতিহাসিক চিত্র'	" চৈত্র	৪২১-৪২৪
দুইখানি প্রাচীন সাময়িক-পত্র	১৩৫৪ বৈশাখ	২৪-২৯
রমেশচন্দ্র দত্ত	" জ্যৈষ্ঠ	৮১-৯৬, ১৩২-১৩৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	" আশ্বিন	৪১৪-৪৩৫
কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য	" কার্তিক	৭১-৭২
'বসুমতী'র জন্ম-তারিখ	" চৈত্র	৪৮৫-৪৮৬
প্রসঙ্গ কথা : 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত'	১৩৫৫ বৈশাখ	৫১-৫৮
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	" শ্রাবণ	৩৩৯-৩৫৩

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস	১৩৫৮ ফাল্গুন	৪৫৫-৪৬৪
চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা	„ চৈত্র	৫৫৯-৫৬৬
আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু	১৩৫৯ বৈশাখ	১-২২
নিরুপমা দেবী	„ আশ্বিন	৫৮১-৫৯৭
শেষ "কপি"	„ অগ্রহায়ণ	১১৭-১২১

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী

বসুমতীর ইতিহাস	১৩৫৭	৪৮-৫০

সাহিত্য

টেঙ্গি (বিদেশী গল্প)	১৩১৮ ফাল্গুন	৮৫৫-৮৬০
পরাজয় (গল্প)	১৩২০ শ্রাবণ	৩৬৮-৩৭৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি	১৩১৮, ৩য় সংখ্যা	১৯৩-১৯৫
"চিরঞ্জীব শর্ম্মা" (আলোচনা)	১৩৩৭, ৪র্থ „	২৪০-২৪২
"রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী" (আলোচনা)	১৩৩৮, ২য় „	১০২-১৩১, ১৩৩
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮১৬-১৮২২	„ ৩য় „	১৭৭-১৯৮
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা	„ ৩য় „	২০৩-২১৩
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮২৩-১৮৩৫ সেপ্টেম্বর	„ ৪র্থ „	২৬৭-২৯৪
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	১৩৩৯, ১ম „	৭-৮
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮৩৫-১৮৫৭ (১)	„ ১ম „	৯-৩০
ঐ (২)	„ ২য় „	১০৫-১২৯
ঐ (৩)	„ ৩য় „	১৫৩-১৭৫
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	„ ৪র্থ সংখ্যা	২৩১-২৩৪
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮৩৫-১৮৫৭ (৪)	„ ৪র্থ „	২৩৫-২৪৮
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮৫৮-১৮৬৭ (১)	১৩৪১, ৩য় „	৮৪-৯৫
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬০-১৮৬১)	„ ৪র্থ „	১০৯-১২৩
ঐ (১৮৬২)	১৩৪২, ১ম „	৭-১৩
ঐ (১৮৬৩)	„ ২য় „	৯১-১০৯
ঐ (১৮৬৪-৬৫)	„ ৩য় „	১৪৮-১৫২
ঐ (১৮৬৪-৬৭)	„ ৪র্থ „	১৮৪-২০০
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস	১৩৪৩, ১ম „	২৩-২৪
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস	„ ২য় „	৬০-৬৩

শরৎচন্দ্র (দ্বিতীয় পর্ব)

S.K.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Sm. Lt. → ব্রহ্মপ্রকাশ

নিঃসম্বল অবস্থায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে তাঁহার মাসীমা — উপেন্দ্রনাথের সহোদরা ভগ্নী অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে (৫৬ ও ৫৭/২ লিউইস স্ট্রীট) গিয়া উঠিলেন। তাঁহার মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন রেঙ্গুনের একজন নামজাদা উকীল। তিনি শরৎচন্দ্রকে সাদরে আশ্রয় দিলেন এবং [illegible] রাখিয়া তাঁহাকে বর্মী ভাষা শিখাইতে লাগিলেন; দু-তিন মাস পরে বর্মা-রেলওয়ের একজন বড় সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আপিসে পঁচাত্তর-টাকা [illegible] একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অঘোরনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, [illegible] ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রকে ওকালতি-কার্য্যে বহাল করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; ১৯০৫ সনে ৩০এ জানুয়ারি নিউমোনিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পত্নী অন্নপূর্ণা দেবী নিকটে ছিলেন না; কন্যার বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য তিনি তখন কলিকাতায়। স্বামীর মৃত্যুর দেড় মাস পরে তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন। শরৎচন্দ্র তাহার অল্প দিন আগেই সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি যে [illegible] হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সংবাদ কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার কানেও পৌঁছিয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা হস্তাক্ষর

[বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত]

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা	পৃষ্ঠা
সেকালের সংস্কৃত কলেজ (৮)	১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা	১৫৩-১৬৮
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবন	১৩৪৯, ৩য় „	৮১-৯০
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ	১৩৫০, ১ম „	১-৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন	„ ২য় „	৩৩-৩৮
রাজকৃষ্ণ রায়	১৩৫১, ১ম-২য় সংখ্যা	৬-২৫
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—রচনাপঞ্জী	„ ৩য়-৪র্থ „	৭৩-৭৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থপঞ্জী	১৩৫২, ১ম-২য় „	১৭-২২
রচনাপঞ্জী : অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	„ ৩য়-৪র্থ „	৮৩-৮৮
রচনাপঞ্জী : (ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩৫৩, ১ম-২য় „	১৯-২১
রচনাপঞ্জী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	„ ৩য়-৪র্থ „	৫৫-৬০
রচনাপঞ্জী : রমেশচন্দ্র দত্ত	১৩৫৪, ১ম-২য় „	৯-১০
রচনাপঞ্জী : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা	„ ১ম-২য় „	১০-১২
রচনাপঞ্জী : অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা	„ ১ম-২য় „	১২-১৪
বাংলা সাময়িক-পত্র—১২৭৫ সাল-১২৭৮ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৬৮-১১ এপ্রিল ১৮৭২)	৩য়-৪র্থ	৫৭-৭৫
বাংলা সাময়িক-পত্র—১২৭৯-১২৮১ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৭২-১২ এপ্রিল ১৮৭৫)	১৩৫৫, ১ম-২য়	২১-৪৮
বাংলা সাময়িক-পত্র—৩—১২৮২-১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৫-এপ্রিল ১৮৭৮)	৩য়-৪র্থ	৬৭-৮৭
বাংলা সাময়িক-পত্র—৪—১২৮৫-১২৮৬ সাল (ইং এপ্রিল ১৮৭৮-এপ্রিল ১৮৭৯)	১৩৫৬, ১ম-২য় „	৩৩-৪৪
বাংলা সাময়িক-পত্র—৫—১২৮৭-১২৮৮ সাল (এপ্রিল ১৮৮০-এপ্রিল ১৮৮২)	„ ৩য়-৪র্থ „	৪৯-৫৯
"বাংলা সাময়িক-পত্র" প্রবন্ধের সংযোজন	„ ৩য়-৪র্থ „	৮২
বাংলা সাময়িক-পত্র—৬—১২৮৯-১২৯০ সাল (এপ্রিল ১৮৮২-এপ্রিল ১৮৮৪)	১৩৫৭, ১ম-২য় „	৯-২৪
বাংলা সাময়িক-পত্র—১২৯১-১২৯৪ সাল (এপ্রিল ১৮৮৪-এপ্রিল ১৮৮৮)	১৩৫৮, ১ম-২য় „	২২-৩২
আচার্য্য যদুনাথের বাংলা রচনাবলী [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনৎকুমার গুপ্ত-সংকলিত]	১৩৬৫, ১ম	৬৬-৭২

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা		পৃষ্ঠা
The Modern Review			
A Begum's Fortune	1924	April	412-417
Romance of an Indian Queen	,,	December	632-638
A Chapter of the East India Company's Diplomacy : The Begum of Sardhana	1925	May	521-530
Administration and Policy of Begam Samru	,,	July	55-58
Begam Samru's Possessions	,,	September	308-314
Rajah Rommohun Roy's Mission to England	1926	April	391-397
Do	,,	May	561-565
Sannyasi Rebellion in Bengal	,,	September	287-293
Do	,,	October	394-400
Pandit Jagannath Tarka-panchanan and the Digest of Hindu Law	,,	November	493-496
The College of Fort William	1927	February	177-184
An Unpublished letter of Rajah Rammohun Roy (Notes)	,,	June	764
Iswarchandra Vidyasagar as an Educationist	,,	September	256-262
Do	,,	October	399-406
Vidyasagar and Vernacular Education	1928	May	537-541
Do	,,	June	650-657
"Raja Rammohun Roy at Rangpur" (Comment & Criticism)	,,	October	434
An Early Chapter of the Press in Bengal	,,	November	553-560
Debendranath Tagore on Schools for the Masses	,,	December	633-634
The English in India should adopt Bengali as their language	,,	December	635-636
Rammohun Roy's Political Mission to England	1929	January	18-21
Do	,,	February	160-165
Ancient Afghanistan	,,	March	350-357
Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar	,,	May	552-555
Rammohun Roy and an English Official	,,	June	682-685
Rammohun Roy on Religious Freedom and Social Equality	,,	July	27-29
Pandit Jagannath Tarkapanchanan	,,	September	261-262
The Last Days of Rajah Rammohun Roy	,,	October	381-388
Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi	1930	January	53-55

Registered

24/3/52

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬
বড়বাজার ১৩৪

The Agent,
Tripura State Bank Ltd.,
Tripura.

Dear Sir,

Under instructions from the Hindusthan Book Agency, Agartala, Tripura, we have today despatched to your address a consignment of books through Messrs. Air Link of 5/B, Clive Ghat Street, Calcutta. Please find herewith the receipt given by Air Link, together with our bill for the cost of books and other incidental charges.

We shall be obliged if you will collect the amount from the aforesaid party and favour us with a cheque. Bank charges will, of course, be paid by the consignee.

Yours faithfully,

Brajendra Nath Banerji
Hony. Secretary.

ব্রজেন্দ্রনাথের ইংরেজী হস্তাক্ষর
[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয়ে সংরক্ষিত পত্রের প্রতিলিপি]

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা		
The First Bengali Newspaper	1930	February	224-225
Rammohun Roy in the Service of the East India Company		May	570-576
Ishwarchandra Vidyasagar as an Unofficial Advisor of the Government	,,	September	267-271
Rammohun Roy as a Journalist	1931	April	408-415
Do	,,	May	507-515
Rammohun Roy as a Journalist (A Supplement)	,,	August	138-139
Early History of the Bengali Theatre	,,	October	385-394
Do	,,	November	521-528
Do	,,	December	632-642
English Impressions of Rammohun Roy before his visit to England	1932	March	279-284
Rammohun Roy on the disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors	,,	June	619-621
Three Tracts by Rammohun Roy	1933	December	624-628
Rammohun Roy's Embassy to England	1934	January	49-61
Rajnarain Bose on the Midnapur Public Library		May	522-423
Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta—The Spiritual Guide of Rammohun Roy		October	392-393
Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform	1935	April	415-419
Rammohun Roy's Reception at Liverpool	,,	October	414-415
Rammohun Roy to William Ward, of Medford—An Unpublished letter	1942	July	86
Mm. Haraprasad Shastri : An Autobiographical Sketch	1949	February	130-133
Do	,,	March	216-219

The Journal of the Asiatic Society of Bengal

Ishwarchandra Vidyasagar as a promoter of Female education in Bengal. Based on unpublished State records.	1927, vol. 23	381-397

বন্দর কাশিমবাজার

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

॥ এক ॥

গঙ্গানদীর সঙ্গে বন্দর কাশিমবাজারের উত্থানপতন জড়িত। দিল্লী থেকে পাটনা ও রাজমহল হয়ে হুগলি আসার নদীপথে কাশিমবাজারের অবস্থান। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ভাগীরথীর অংশ কাশিমবাজার নদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুকসুদাবাদ বা পরবর্তীকালের মুর্শিদাবাদ শহরের পরেই গঙ্গানদী অশ্বক্ষুরাকৃতিতে প্রবাহিত হত। এই অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর একাংশ বন্দরের রূপ ও সুবিধা সৃষ্টি করত। দস্যুসমাচ্ছন্ন নদীপথ থেকে নৌকাগুলি কাশিমবাজার নদীর এই অংশে প্রবেশ করতে পারলে নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা অনুভব করত। অশ্বক্ষুরাকৃতি কাশিমবাজার নদীর এই অংশের ভৌগলিক রূপ বন্দর কাশিমবাজার পত্তনের একমাত্র কারণ। বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাগের কাছে গঙ্গানদী বা ভাগীরথী পূর্ব-দক্ষিণ প্রবাহে অশ্বক্ষুর সৃষ্টি শুরু করে; তারপর ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরমুখী ও উত্তর-পশ্চিম প্রবাহ এই অশ্বক্ষুর সৃষ্টি সাঙ্গ করে। উত্তর-প্রবাহিনী গঙ্গা হিন্দু জনসাধারণের মনে বারাণসীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কাশিমবাজারে অসংখ্য ভগ্ন শিবমন্দির আর-এক পুণ্য শহর সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের কথাই প্রমাণ করে। ব্যবসার সুযোগ এবং বন্দরের নিরাপত্তা কাশিমবাজারকে অনতিবিলম্বে গঞ্জে রূপান্তরিত করল, ধর্মের টান অর্থের আকর্ষণের কাছে পরাজিত হল। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কাশিমবাজারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিল। সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই ব্যবসায়ী বাঙালী কাশিমবাজারে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হলেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে 'মাসুমা বাজার' এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।[১] 'মাসুমা' কথার অর্থ আচার্য লিখেছেন a chaste lady; বাংলায় সম্ভবত 'সতীর বাজার' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এই বাজার এই মহিলা বসিয়েছিলেন না তাঁর জায়গায় অবস্থিত ছিল, তা জানা যায় না।

এই মাসুমা বাজার নাম সম্ভবত ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দের পর অনেকগুলি রাজনৈতিক ঘটনা এই বাজারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। সম্রাট শাহজাহান তখন দিল্লীর বাদশাহ। অর্থনৈতিক কারণেই তিনি হুগলির পর্তুগীজদের বাণিজ্যের প্রসার পছন্দ করেন নি। পর্তুগীজ বণিকরা তখন চট্টগ্রামে এবং পূর্ব-ভারতীয় দীপপুঞ্জে বিশেষ বোর্নিও ও সুমাত্রার সঙ্গে প্রচুর লেনদেনের কারবারে ব্যস্ত। সম্রাট শাহজাহানের অসন্তোষের প্রধান কারণ হল পর্তুগীজদের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং সরকারী খাজনা দেবার প্রস্তাব উপেক্ষা করা। নিকোলো মানুচী অবশ্য বাদশাহের এই অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিয়েছেন। ভেনিসের এই ভদ্রলোক মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে

আসেন এবং সারা জীবন এদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে অবশেষে ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিচেরিতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর লেখা মোগল ইতিহাস (Storia do Mogor) যে অত্যন্ত মূল্যবান, একথা বলাই বাহুল্য। মানুচী লিখেছেন যে শাহজাহান বাদশাহ হবার আগে একবার বেগম মমতাজমহলকে সঙ্গে নিয়ে হুগলি পরিভ্রমণে এসে পর্তুগীজদের কাছে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। বেগমসাহেবার একাধিক পরিচারিকাকে দস্যুরা অপহরণ করে এবং স্বয়ং বেগমসহ বাদশাহজাদা অতিকষ্টে রক্ষা পান। বাদশাহ হবার পর শাহজাহান এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন এবং সেইজন্যেই সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কাশিম খাঁর নেতৃত্বে পর্তুগীজদমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সময় ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দ। কাশিম খাঁর হুগলি অভিযান এবং পর্তুগীজদের পরাজয়ের ইতিহাস সকলের জানা আছে। মানুচী লিখেছেন, পূর্ব অপমানের প্রতিশোধস্বরূপ বাদশাহের আদেশে কাশিম খাঁ অনেকগুলি পর্তুগীজ মহিলাকে অপহরণ করেন।[২] এই শুভ্রা স্ত্রীলোকগুলির রূপে কাশিম খাঁ নিজেও আকৃষ্ট হন, সঙ্গে সঙ্গে ভাবিত হন। কারণ পাটনা অথবা রাজমহলে নিজের ভোগের জন্য কয়েকটি বিদেশিনীকে লুকিয়ে রাখলে বাদশাহের কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা। তাই শেষ পর্যন্ত মাসুমা বাজারই তাঁর পছন্দ হল। এখানেই তিনি কয়েকটি পর্তুগীজ মহিলাকে নিজের জন্য লুকিয়ে রেখে অন্যগুলিকে সম্রাটের কাছে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু কাশিম খাঁর ভাগ্য মন্দ, কারণ দিল্লী থেকে আর তিনি বাইরে আসতে পারলেন না। জ্বরে সেই বছরই তাঁর মৃত্যু হল। উপরের এই ঘটনাকে উপন্যাস মনে করলেও হুগলি-বিজয়ী কাশিম খাঁ যে মাসুমা বাজারে এসেছিলেন তা প্রামাণ্য এবং কাশিম খাঁর সম্মানেই যে মাসুমা বাজার কাশিমবাজার হয়েছে একথা যুক্তিপূর্ণ মনে করা চলতে পারে।

কাশিম খাঁ যে কাশিমবাজারের উন্নতির সহায়ক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হুগলি বন্দরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর কাশিমবাজারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্যের প্রসারে হুগলি বাদশাহী বন্দরে রূপান্তরিত হওয়ায় সাধারণ ব্যবসায়ী বন্দর কাশিমবাজারে জমায়ত হলেন। বাংলাদেশ থেকে তখন নানা জিনিস রপ্তানি হত। প্রচুর পরিমাণে চাল বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করত। এছাড়া সোরা, রেশমবস্ত্র, তাঁতবস্ত্র, ঘাসের তৈরি থান ও চাটাইজাতীয় জিনিস, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা বা মরিচ, মোম, লাক্ষা ও মাটির পুতুল বাংলার অন্যতম প্রধান রপ্তানি হিসাবে গণ্য হত।[৩] রেনেল সাহেব সরকারী আয়ের হিসাব দিয়েছেন নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে।[৪] তিনি লিখেছেন যে আইন-ই-আকবরির সময়ে বাংলার খরচাবাদ আয় ছিল ১৪৯½ লক্ষ সিক্কা টাকা, ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে সেটা হয় ১৪২½ লক্ষ সিক্কা টাকা। তখন ১০ সিক্কা টাকা সমান এক স্টারলিং পাউণ্ড হিসাব করা হত। বাংলার বাণিজ্যের দিগন্ত কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

হুগলিতে পর্তুগীজদের পরাজয় ইংরেজ কোম্পানির খুবই সুবিধা করে দিল। তারা মহানন্দে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের শূন্যস্থানে আকণ্ঠ ডুব দিল। এদিকে ডাক্তার বুটন বাদশাহ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করে ইংরেজ কোম্পানির জন্য কিছু সুবিধা আদায় করে নিলেন।

বন্দর কাশিমবাজার ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ

[রেনেল্-এর মানচিত্র থেকে]

১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহের আদেশে মাদ্রাজ কাউন্সিলের অধীনে হুগলিতে বে কাউন্সিল (Bay Council) স্থাপিত হল। ক্রমে অতি দ্রুতগতিতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ভিতর-বাংলায় কুঠি স্থাপন করলেন। হুগলির অধীনে বালাসোর, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা ও সিংহাইয়াতে ইংরেজ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠল। হান্টার সাহেব লিখেছেন যে কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ষ্টিফেনস্ সাহেব কাশিমবাজারের ফ্যাক্টর বা প্রধান নিযুক্ত হবার পর মারা যান ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি (যা প্রচলিত ভাষায় কুঠি নামে পরিচিত হয়) ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে নিশ্চয় ছিল।[৫] ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন কীন ৪০ পাউণ্ড বেতনে ফ্যাক্টর এবং পরবর্তীকালের কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চারনক তাঁর সহকারী হিসাবে ২০ পাউণ্ড বেতনে নিযুক্ত হন। জব চারনক ১৬৮০-তে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হন এবং বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁর বিরাগভাজন হবার ফলে এখান থেকেই ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে পলায়ন করেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি এক নাগাড়ে কাশিমবাজারে ছিলেন কিনা জানা যায় না।[৬]

এই সময়ে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সোরা-ব্যবসায়কে প্রধান বলে মনে করতেন। সপ্তম শতাব্দীর পঞ্চম দশকে হুগলির কুঠিয়ালকে কেবল সোরা-ব্যবসায়ে অর্ধেক টাকা লগ্নি করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে হুগলির ফ্যাক্টরকে সোরা কেনবার জন্য প্রতি বছর ৫০০০১ পাউণ্ড পাটনায় এবং সিল্ক কেনবার জন্য ৪০০০১ পাউণ্ড কাশিমবাজারে পাঠাতে বলা হয়েছে। এই টাকায় কেনা হত কাঁচা রেশম, টাফেটা ও সুতি সুতো।[৭]

১৬৬০-৬১-তে নিকোলো মানুচী স্বয়ং কাশিমবাজারে আসেন। হুগলি থেকে আগ্রা যাবার পথে কাশিমবাজারে আসতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন:

> "হুগলী থেকে যাত্রা করার তৃতীয় দিনে আমি কাশিমবাজারে উপনীত হলাম। দেখলাম এখানে উচ্চশ্রেণীর কাটা কাপড়ের জিনিস ও প্রচুর শাদা কাপড় তৈরি করা হয়। এই গ্রামটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং তিনটি বিলাতি জাতির ফ্যাক্টরি এখানে রয়েছে। জাতি তিনটি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ। কাশিমবাজার থেকে আমি রাজমহলের পথ ধরলাম।"[৮]

মানুচীর সাক্ষ্যে তিনটি বিদেশী কোম্পানির অবস্থিতি কাশিমবাজারের তৎকালীন সমৃদ্ধি প্রমাণ করে।

১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০০ তাঁতী সিল্ক-বোনার কাজে লিপ্ত ছিল। অন্য দুই কুঠিতে তখন এত লোক ছিল না। কাশিমবাজারে প্রতি বছর ২২০০ গাঁইট সিল্কের কাটনা বা কাটা সুতো প্রস্তুতের ক্ষমতা ছিল। প্রতি গাঁইটের ওজন ১০০ লিভার (livres)—এক ইংরেজী পাউণ্ডের (ওজন) থেকে এক লিভার একটু বেশি ভারি। সমগ্র ওজন প্রায় ৩০০৭৮ মনের সমান। রেশমের কাটা সুতো জাপান বা ওলন্দাজ দেশে যেত ৬০০০ থেকে ৭০০০ গাঁইট, তাতারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং মোগল-সাম্রাজ্যে যেত সমপরিমাণ। ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা বাকি ৯০০০ গাঁইট এদেশে বিক্রয় করতেন। প্রয়োজন

অনুসারে এই সুতো থেকেই বিভিন্ন রকম সিল্কের থান তৈরি করা হত। বলা বাহুল্য, প্রচুর পরিমাণ সুতো আমেদাবাদ ও সুরাটে ক্রয় করে রেশমের কাপড় ও পোশাকাদি বানান হত।[৯] ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজদের ব্যবসা এত উন্নতি লাভ করল যে তাঁরা পাটনা, দৌলতগঞ্জ, ছাপরা, সিংহাইয়া ও হাজিপুরে বাণিজ্যবিস্তার করলেন এবং রেশমশিল্পের মধ্যমণি কাশিমবাজারে (কালিকাপুরে) ১৫৩০০০ টাকা খরচ করে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করলেন।[১০]

ফরাসী কুঠি অশ্বক্ষুরাকৃতি কাশিমবাজার নদীর বহিঃপ্রবাহের মুখে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে এই স্থানটি ফরাসডাঙ্গা নামে প্রচলিত হয়। কুঠিস্থাপনের শ্রেষ্ঠতম জায়গা পেলেও ফরাসী ব্যবসায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ডুপ্লে (Dupliex) ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী কুঠির সংস্কার ও ফরাসী ব্যবসায়ের পুনঃপত্তন করেন। ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসী ব্যবসা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত উন্নতি করল।[১১] রপ্তানির জন্য ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতি বছর ৬০০০০ পেটি সেরা সিল্কের সুতো বা টানি ক্রয় করতে শুরু করল। এছাড়া অন্যান্য নানা জিনিসের মধ্যে রেশম ও সুতির কাটা কাপড়, সাদা গাড়া বা মোটা সুতি কাপড়ের থান প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি শুরু হল। ডুপ্লে ও ডুমার চেষ্টায় কাশিমবাজারে নূতন জিনিসের ব্যবসা শুরু হল। তাঁরা চীন থেকে ফটকিরি, কর্পূর, দস্তার তৈরি জিনিস, পারদ, চীনামাটির সামগ্রী, চীনাসিন্দুর আর ঝুটা মুক্তা নিয়ে বাংলাদেশের বাজারে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন।[১২] ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় রাজ্যের সেরা তাঁতীদের সমাবেশ করলেন। ফরাসডাঙ্গার তাঁতের জিনিস পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে গেল। ফরাসডাঙ্গার নাম শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনের মত লোকের মুখে মুখে ঘুরে সুখ্যাত হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা যে ফরাসী কুঠি সম্পূর্ণ লুপ্ত, কিন্তু এখনো কয়েকঘর তাঁতী বিজয়াশেষে প্রদীপের মতো ফরাসডাঙ্গায় টিকে আছে।

ডুপ্লের আমলে ফরাসী কুঠির কদর ছিল আলাদা। প্রতিবার বর্ষায় ডুবে যেত বলে কুঠি রক্ষার জন্য পণ্ডিচেরি থেকে এঞ্জিনিয়ার এল। নানাভাবে চেষ্টা করে জল ঢোকা বন্ধ হল। কুঠির চারিদিকে প্রাকার তৈরি হল। বস্তুত এই কুঠি ক্রমে এক দুর্গে পরিণত হল। প্যারিসে রক্ষিত নকশা আজও ডুপ্লের কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফরাসী ব্যবসার প্রসারের ফলে ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে জনৈক 'ইন্দ্রনারায়ণ-পুত্র' বার্ষিক ৮০০ টাকা উপায় করতেন। ইনি ফরাসীদের 'ভকিল' বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁকে ফরাসী কুঠির গোমস্তা বলা চলে কিনা বিবেচ্য। এই ভদ্রলোক নবাব-দরবারেও ফরাসী কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে আমদানি ও রপ্তানির কাজে তিনি শতকরা ১২ টাকা করে পাবেন।[১৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ১৬০০০০ টাকার ব্যবসা হয়। কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিল লণ্ডনের পরিচালক সমিতিকে ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি জানালেন যে ফরাসীরা পাঁচখানা জাহাজ সোজাসুজি ইওরোপে পাঠাচ্ছে। ফরাসীদেশে লা ওরিয়েন্ট বন্দরে যে-সব জিনিস বাংলাদেশ থেকে পাঠান হয়েছে তার মধ্যে দেখা যায় কাশিমবাজারের সুতি কাটা কাপড়ের

টুকরো ৩৮৭৮২০খানি ও নমুনার জন্য ৭১খানি সিল্কের রুমাল, এছাড়া আরো ৩৯ খানি সিল্কের ছাপানো রুমাল।[১৪] ডুপ্লে চন্দননগরের রাজ্যপাল হয়ে চলে যাবার পরেও ফরাসী ব্যবসার প্রসার হয়, কিন্তু ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ফরাসী ব্যবসার প্রভাব কমতে থাকে। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কাশিমবাজার নিম্নবাংলার শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ; ভিতরবাংলায় বন্দরের রাণী বলেও কাশিমবাজারকে প্রশংসা করা হয়েছে। রেশম ও মসলিন-শিল্পের কেন্দ্রভূমি হিসাবেই এই খ্যাতি তার প্রাপ্য হয়েছিল।

ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম যখন বাংলাদেশে পদার্পণ করে তখন তিন প্রধান বিদেশী কোম্পানির মধ্যে তারা ছিল নিকৃষ্টতম। ইংরেজ কুঠির ক্রমবিবর্তন তাই অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলী হুগলির প্রতিনিধির কাছে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারির এক চিঠিতে হুগলি, বালাসোর, পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠিস্থাপনা অনুমোদন করেন।[১৫] ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে জব চারনক কুঠির প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর সময়ে মোট ২৩০০০০ পাউণ্ডের মধ্যে ১৪০০০০ পাউণ্ড কেবল কাশিমবাজারের ব্যবসায় লগ্নি করতে বলা হয়।[১৬] তখনকার বিনিময়মূল্য হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা কেবলমাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীরাই এই সময়ে সোরা ও রেশমের জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং বাংলার মধ্যে কাশিমবাজার সে-সময়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে শীর্ষস্থান অধিকার করত এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফৌজদারের উৎপীড়ন সে-সময়কার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির বণিকরা এবার কেবল প্রতিবাদই করল না, উৎকোচ দিতে অস্বীকার করল। বাঙলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খাঁর কাছে ঢাকায় এ সংবাদ পৌছান মাত্র তিনি কাশিমবাজার কুঠি অবরোধের হুকুম দিলেন ও জব চারনককে বন্দী করতে বললেন। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। নবাব-সৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে চারনক হুগলিতে পালিয়ে গেলেন। এই পলায়নের সূত্র ধরেই ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার পত্তন এবং ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কলিকাতায় চারনকের মৃত্যু, নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-তরঙ্গ। জব চারনকের পলায়নের পর শায়েস্তা খাঁর আদেশে কাশিমবাজারের ইংরেজ ও ফরাসী কুঠি প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরে বাদশাহী সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজীব বিধর্মীদের সব অপরাধ ক্ষমা করে তাদের বাণিজ্য-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তদনুযায়ী বাংলার তৎকালীন সুবেদার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ দেন।[১৭] এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অধিকৃত ইংরেজ কুঠিগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসকে যে পত্র দেওয়া হয় তা থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দের ৩০ মার্চ কাশিমবাজারের ফৌজদার নবাবের দেওয়ানের আদেশ জারি করেন এবং সমস্ত বিদেশী কোম্পানির অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজের কুঠি বাজেয়াপ্ত করেন। ইংরেজদের কুঠিতে তখন ৫০০০ টাকার বেশি জিনিস ছিল না। হলসে সাহেবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে নবাবের লোকেরা তাঁকে কয়েদখানায় না নিয়ে গিয়ে কাশিম-বাজার কুঠিতেই বন্দী করে রেখে দেয়। এই সময়ে ওলন্দাজদের কুঠিতে অনেক সম্পত্তি ছিল।

সেজন্য ওলন্দাজ কোম্পানি নবাবের কর্মচারীদের প্রচুর ঘুষ দেয় এবং তদনুযায়ী অধিকাংশ জিনিস পাটনা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেবার পর ওলন্দাজ কুঠির ওপর পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৮]

তখন থেকেই কাশিমবাজারে ব্যবসা করতে ইংরেজ বদ্ধপরিকর। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ মার্চ ইংল্যাণ্ড থেকে পরিচালকমণ্ডলী জানালেন যে আর কোথাও ব্যবসার প্রসার না হলেও কাশিমবাজার ও মালদাতে কুঠি রক্ষা করে বাংলার ব্যবসাকে বাড়াতে হবে।[১৯]

মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে নিয়ে এলেন এবং নিজের নামানুসারে নামকরণ করলেন মুর্শিদাবাদ। কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তাই অতি সহজেই কাশিমবাজার রাজধানী মুর্শিদাবাদের অংশ-বিশেষ বলেই গণ্য হল। বন্দর কাশিমবাজার রাজধানীর বন্দরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। ইওরোপীয় কুঠিগুলির রূপান্তর লক্ষণীয়। এগুলি আর কেবল বাণিজ্যের নয়, রাজনীতিরও কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ল। দিনেমার ও আর্মেনিয়ান বণিককুল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বার ভয়েই কুঠিস্থাপনে বিরত হলেন। প্রত্যেক কুঠির প্রধানরা নূতন মর্যাদায় ভূষিত হলেন। উইলিয়াম বাগডেন ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে নবাবকে ৩০ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়ে ইংরেজ কুঠির আমূল সংস্কারের আদেশ চেয়ে নিলেন। এই সময়ে কুঠি ও ইংরেজ-অধিকৃত জমির পরিধি বৃদ্ধি হল।

দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্যে মৃত্যু হল ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে। মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশাহের নামমাত্র আনুগত্যে বাংলায় স্বাধীন নবাবির পত্তন করলেন। পরবর্তী ৬০ বছর রাজনীতির উজ্জ্বল আলোয় মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের দৈনন্দিন জীবন আলোকিত হয়ে উঠল। কাশিমবাজার ধীরে ধীরে হয়ে উঠল নানা রকমের রাজনৈতিক ফন্দিবাজি, ষড়যন্ত্র ও পরামর্শের কেন্দ্রস্থল। নবাবী দৃষ্টি থেকে সামান্য দূরে কাশিমবাজার আলোচনার চমৎকার জায়গা হয়ে উঠল। জগৎশেঠগণ কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে একটি বড় বাড়ি তৈরি করলেন। সত্যি আশ্চর্য হতে হয় যে মাত্র ৬০ বছরের মধ্যে কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসেও কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল! ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে বাংলার স্বাধীন নবাবি শুরু, আর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে তার শেষ। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সত্যই লিখেছেন, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারতের পরাধীনতা শুরু হয়।[২০] মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবা বাংলার অধিপতি হলেন। দিল্লীর নিত্যপরিবর্তনশীল বাদশাহী তক্তের অধিকারীদের কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে মনোযোগী হলেন। তৎকালীন বাংলা অর্থে বৃহৎবঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ (বা পূর্ব পাকিস্তান), মনিপুর, শ্রীহট্ট, মানভূম, সাঁওতালপরগনা, পূর্ণিয়া এবং উড়িষ্যার কিয়দংশ প্রভৃতি বাংলার অন্তর্গত ছিল। বিহার কোলগাঁও থেকে বক্সার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নেপাল ছিল বিহারের উত্তর-সীমা ও সিংভূম দক্ষিণ-প্রান্ত। উড়িষ্যা পুরী ও গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও পরিধিতে অত্যন্ত ছোট ছিল।[২১]

বাদশাহ আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁর স্বাধীন নবাবি শুরু হল, একথা মনে করা যায়। রাজ্যশাসনে অভিজ্ঞ নবাব বাংলা সুবাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। জনসাধারণ নির্ভয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারতেন এবং রাত্রে অর্গল বন্ধ না করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতেন।[২৬] দেশের এই শান্ত অবস্থা বিবেচনা করে বিদেশী কোম্পানিগুলি এই সময়ে বাংলা সুবায় প্রচুর অর্থ ব্যবসায় লগ্নি করে। ভারতীয়গণও পেছনে পড়ে থাকেন নি। রাজস্থানের নাগর শহরের অধিবাসী হীরানন্দ শাহ পাটনায় ব্যবসা করতে আসেন ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে। তাঁরই বংশধর শেঠ মানিকচাঁদ ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসেন। একসঙ্গে আসার কারণ যে নবাবের সঙ্গে শেঠের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, একথা বলাই বাহুল্য। শেঠ মানিকচাঁদ নবাব-আবাসের দুই মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে মহিমাপুরে নিজের বাসস্থান তৈরি করলেন।[২২] শেঠ মানিকচাঁদের বংশধররাই ইতিহাসে জগৎশেঠ-বংশ নামে খ্যাত; ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের আগে কিন্তু শেঠরা টাঁকশাল বসিয়ে টাকা ছাপাবার একচ্ছত্র অধিকার পান নি। শেঠ মানিকচাঁদ ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তার পরেই বাদশাহ ফররুখশিয়র মুর্শিদকুলী খাঁকে সুবা বাংলার সুবাদার এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাদশাহ মানিকচাঁদকেও শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলায় কায়েমী শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানিকচাঁদের সাহায্য ছাড়া যে মুর্শিদকুলী খাঁ করতে পারতেন না, একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। শেঠ মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর (১৭১৪ খ্রী) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র শেঠ ফতেচাঁদ পিতার নির্দিষ্ট পথেই ব্যবসা চালিত করেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহকে সৈন্যবাহিনীর বেতন দেবার জন্যে শেঠ ফতেচাঁদ এক কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং তার অব্যবহিত পরে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহ শেঠ ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৩] তদবধি এই বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর জগৎশেঠ নামে প্রসিদ্ধ। সম্মান আরও এল। বাংলা সুবায় পায়ে সোনার গহনা পরার অধিকার ছিল কেবলমাত্র বাংলার নবাবের আর জগৎশেঠ-বংশের। জগৎশেঠের স্থান নির্দিষ্ট হল নবাবের বামে।[২৩] সব বিষয়ে, এমনকি শাসনব্যবস্থা পরিচালনাতেও জগৎশেঠ-বংশকে বাংলার নবাবের অংশীদার বলে স্বীকার করা হল। এইজন্য দেখি বাংলায় সুশাসন প্রবর্তনের জন্য জগৎশেঠদের উদ্বেগ। এই উদ্বেগ অনধিকারী অর্থলোভী ব্যবসায়ীর নয়, দেশের ও দশের শুভকামনার অধিকারী শাসনযন্ত্রের ছোট অংশীদারের। তাই ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের খ্যাতনামাদের তালিকায় নবাব ও নবাব-বংশধরদের পরই জগৎশেঠের স্থান নির্দিষ্ট আছে।[২৩]

স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করলেও মুর্শিদকুলী খাঁকে প্রায়ই দিল্লীর 'নজরানা'র তাগিদ মেটাতে হত। বাদশাহ-বদল দিল্লীতে তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নূতন বাদশাহের অর্থের প্রয়োজন হলেই সুবাদারদের নজরানা পাঠাবার হুকুম আসত। মুর্শিদকুলী খাঁ এইরকম তাগিদ এলেই বিদেশী কোম্পানিদের কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করতেন। ক্রমে এই রীতিটাই চালু হয়ে গেল। দিল্লী রহুকুম এলেই নবাব হুকুমনামা জারি করতেন। কোন

বিদেশী কোম্পানি টাকা দিতে অস্বীকার করলেই নবাবী ক্রোধ তাদের সহ্য করতে হত। কাজেই বাদশাহী সমন এলেই নবাবের কর্মচারীদের কাশিমবাজারের কুঠিগুলিতে আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পেত। কোম্পানিগুলি তাঁদের দেয় নির্দিষ্ট অর্থ জগৎশেঠ ফতেচাঁদের গদিতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ১৭২১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি টাকা দিতে অস্বীকার করেন। নবাব তাঁদের দুই মাস সময় দিলেন, তারপর ঐ বছরের মে মাসে ইংরেজ কুঠির গোমস্তা (broker) কান্তবাবুকে (কৃষ্ণকান্ত নন্দী) গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। ফলে ইংরেজ কুঠির বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল, কেননা বাঙালী এবং দেশী ব্যবসায়ীদের কেনাবেচা কান্তবাবুর মাধ্যমেই হত। অবশেষে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মধ্যস্থতায় কান্তবাবু মুক্তি পেলেন এবং ইংরেজ ফ্যাক্টরি থেকে সৈন্য অপসারণ করা হল।[২৪] ওলন্দাজ কোম্পানির 'ভকিল' বা প্রতিনিধিকেও নবাব বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছিলেন। এই সময়েই ইংরেজ কোম্পানির টাকা তৈরি করার আবেদন নবাব নাকচ করে দেন এবং সমুদয় রুপা প্রতি 'ডুকাটুনে' তিন পাই লোকসানে জগৎশেঠকে বিক্রি করে দিতে ইংরেজ কোম্পানি বাধ্য হয়। পরের বছরে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে আবার নজরানার তাগিদ এল। এবার ইংরেজ ও ওলন্দাজ কুঠির দুজন ভকিলই গ্রেপ্তার হলেন। ইংরেজ কুঠির সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্টেন বোরল্যাস জগৎশেঠের সঙ্গে দেখা করে নবাবী কীর্তির তীব্র প্রতিবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন। অবস্থা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠল। অসন্তোষের ঘূর্ণিবাতাস কাশিমবাজারের পথে পথে ধুলো উড়িয়ে চতুর্দিক অস্পষ্ট করে দিল। ইতিমধ্যে আর এক গোলমাল শুরু হয়েছে।

কলিকাতার পত্তন করে ইংরেজ কোম্পানি স্পষ্টই বুঝতে পারল যে এক সুবাদারের দেওয়া সনদ অন্য এক সুবাদারের হুকুমে নাকচ হয়ে যেতে পারে। নবাব ইব্রাহিম খাঁর দেওয়া অধিকার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাতিল করে দিতে পারেন। কাজেই পাকা বন্দোবস্তের একমাত্র উপায় দিল্লীর হুকুমনামা, বাদশাহী ফরমান সংগ্রহ করা। চেষ্টা শুরু হল এবং ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে 'হাসব-উল-হুকুম' নামে বাদশাহী আদেশ কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিলের হস্তগত হল। এই হুকুমে ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, উপরন্তু তাদের বাধা দিতে বা আঘাত হানতে বারণ করা হয়েছে। এই আদেশের পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করবার জন্য বাদশাহের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি আরো সুবিধা আদায় করলেন। বাংলাদেশে বাণিজ্যের এবং শুল্ক আদায়ের অধিকার পাওয়া গেল আর পাওয়া গেল হুগলি, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদা, রাজমহল, বালাসোর ও রাধানগরে কুঠি স্থাপনের অধিকার। এতদিন যা ছিল নবাবী অনুমতির দয়ার প্রত্যাশী, এখন থেকে হয়ে গেল বাদশাহী হুকুমে হকদার। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহী ফরমানও এসে গেল, যার ফলে ইংরেজ কোম্পানি দিল্লীর বাদশাহের অধীনে ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতানটির জমিদার বলে স্বীকৃত হল। স্বভাবতই কলিকাতা শহরের কিছু উন্নতি হল, নূতন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তৈরি হতে দেখা গেল। ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব-কর্মচারী আবদুল রহিম কলিকাতার উন্নতি করার জন্য ৪৪০০০ টাকা অতিরিক্ত খাজনা দাবি করলেন। কলিকাতার কোম্পানির

প্রধান এই অতিরিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার কাশিমবাজারে সৈন্য এল। কান্তবাবু এবার আগে থেকেই ইংরেজ কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছেন। নবাবী সৈন্য দেশী বণিকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হল না। অবশেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় এবং কাশিমবাজারের নূতন কুঠিয়াল ষ্টিভেনসনের চেষ্টায় ইংরেজ কোম্পানি নবাবকে ২০ হাজার টাকা নজরানা দিতে স্বীকৃত হলেন, নবাবও এক পরোয়ানা জারি করে আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে অন্যায়ভাবে কোন অতিরিক্ত কর বা খাজনা ধার্য করা হবে না। ১৪ মার্চ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে মে মাসে প্রতিশ্রুত নজরানা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।[২৫] নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর এটাই শেষ প্রাপ্তিযোগ। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বাংলাদেশের জমিদারদের শায়েস্তা করেন। ভূষণার রাজা সীতারাম রায়কে দমন তাঁর এক কীর্তি। বাংলা সুবায় তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। তাঁর সৃষ্ট 'বৈকুণ্ঠ' ধনীদরিদ্র সবারই মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। অমানুষিক অত্যাচারের এই বন্দোবস্ত দেশের আইন অমান্য করাকে দুরূহ করে। শূলবিদ্ধ হয়ে রাজা সীতারামের বীভৎস মৃত্যু পরবর্তী যুগের বাঙালী যতই অস্বীকার করুন, 'বৈকুণ্ঠ'-সৃষ্টিকারী শাসকের হাতে সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা। মুর্শিদকুলী খাঁ রাজকার্যে বেশ পটু ছিলেন। তাঁর সময়ে বাঙলার জায়গীরসমেত মোট জমার পরিমাণ ছিল ১:২৮৮১৮৬ টাকা। তিনি পরগনা-বিভাগের পুনর্বিন্যাস করেন। আগে সুবা বাংলা ১৩৫০টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। মুর্শিদকুলী তাকে ১৬৬১টি পরগনায় বিভক্ত করেন। তাঁর সময়ে চাকলা বিভাগ এবং প্রতি চাকলার সুনির্দিষ্ট জমা ও বার্ষিক হস্তবুদ 'জমা-কামেল তুমারী' নামে অভিহিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুর্শিদকুলী খাঁকে 'জেন্দাপীর' বা মহাপুরুষ-রূপে বর্ণনা করেছেন।[২৬] কাশিমবাজারের অনতিদূরে কাটরায় তাঁর সমাধি ও মসজিদ আজও বিদ্যমান।

॥ দুই ॥

মুর্শিদকুলী খাঁ মৃত্যুর আগে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে নবাব মনোনীত করেন। কিন্তু নবাবের গত হওয়ার সংবাদে নবাব-জামাতা ও সরফরাজ খাঁর পিতা উড়িষ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ রাজধানীতে উপনীত হন এবং সুজাউদ্দৌলা আসাদ জঙ্গ নাম গ্রহণ করে নবাবী তক্তে আরোহণ করেন। সুজাউদ্দৌলার নবাবির বার বছর রাজনৈতিক প্রস্তুতির সময় বলা চলতে পারে। নবাব উড়িষ্যা থেকে আসবার সময়ে তাঁর অন্যতম সহকারী হাজী আহমদ খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা আলিবর্দি খাঁকে সঙ্গে আনেন। এঁরা পারস্যদেশীয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী। জজৌ রণক্ষেত্রে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ওরঙ্গজীবের পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে আলিবর্দি খাঁ অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল মির্জা মহম্মদ আলি।[২৭] সুজাউদ্দৌলা এঁদের সাহায্যে উড়িষ্যায় সুশাসন প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। সুবা বাংলার শাসনে নতুন নবাব পুরাতন ভৃত্যদের ওপরই নির্ভরশীল হলেন। শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য

আলিবর্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন এবং হাজী আহমদ ও দেওয়ান আলমচাঁদ নবাবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা হলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ নবাবের বন্ধু ও রাজ্য পরিচালনায় সহায়ক হবার ফলে জগৎশেঠ পরিবার কৌলীন্যে ও ক্ষমতায় প্রায় নবাবের সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। এদের সাহচর্যে ও সাহায্যে সুজাউদ্দৌল্লা সুবা বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করে বার্ষিক ১২৫০০০০০ টাকা বাদশাহকে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন ; এগার বছর আট মাস তের দিন বাংলার নবাবি করে দিল্লীতে পাঠান মোট ১৪৬২১৮৫৩৮ টাকা।[২৮]

কাশিমবাজারের বিদেশী কুঠিদের নবাবী দাক্ষিণ্য অর্থের বিনিময়ে কিনতে হত। হাজী আহমদের মধ্যস্থতায় ওলন্দাজ বণিকগণ ৫৫০০০ টাকা নজরানার বিনিময়ে বাঙলা সুবায় বাণিজ্যের পরোয়ানা লাভ করে ৬ জুলাই ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে। আলমচাঁদের মধ্যস্থতায় ইংরেজ বণিকগণ ৭০০০০ টাকায় পরোয়ানা লাভ করে। ইংরেজদের কাছে নবাব ২ লক্ষ টাকা দাবি করেন, কারণ ইংরেজ ব্যবসায়ে তখন বিশেষ সমৃদ্ধ। নজরানা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ায় কোম্পানির সোরা ভর্তি নৌকাগুলিকে আজিমগঞ্জে আটক করা হয়। নৌকাগুলি পাটনা থেকে কলিকাতা আসছিল।[২৯]

নবাব মুর্শিদকুলীর আমল থেকেই জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ইংরেজ কোম্পানির মাতব্বর। সুতরাং বণিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বর্তমান নবাব ও কোম্পানির মধ্যে বোঝাপড়ার ভার নেন এবং নবাবি পরোয়ানা নিজেই স্বহস্তে কুঠিয়ালকে দিয়ে যান।[৩০]

জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদের বন্ধুত্বের প্রধান কারণ হল, ইংরেজ বণিকগণ জগৎশেঠের কাছে নিয়মিত টাকা ধার করতেন। এই টাকা ধার নেবার ব্যাপারে ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে গোলমাল উপস্থিত হলে এই সৌহার্দ্য প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই গোলমালের কারণ খুঁজতে গিয়ে জগৎশেঠের ইংরেজ কোম্পানিকে টাকা দেবার পদ্ধতি জানা যায়। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান জন স্ট্যাকহাউস কলিকাতায় কাউন্সিলের সভাপতিকে জানালেন যে তাঁদের গোমস্তা কান্ত নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং তার ফলে কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে ব্যবসায়ীদের দাদন দেবার উপায় নাই, কারণ জগৎশেঠ টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন। কান্ত মারফৎ তিনি কোম্পানিকে দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, সে টাকার কিছু ফেরৎ না পেলে নতুন অর্থ কোম্পানিকে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং জগৎশেঠের সঙ্গে বোঝাপড়া না হলে ব্যবসা চালানো কঠিন।[৩১]

অবশেষে কান্তকে (কৃষ্ণকান্ত নন্দী বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হল। কান্তবাবুর হিসাব ওয়াশিল করে দেখা গেল যে তিনি কোম্পানির দালাল হিসাবে ২৪৫০০০ টাকা জগৎশেঠের কাছে নেওয়া ছাড়াও স্বনামে ১৩৩০০০ টাকা ধার নিয়েছেন। কান্তবাবু সমুদায় ঋণের জন্যে ২৭২০০০ টাকার সম্পত্তি (Security & Property) বন্ধক রাখতে রাজী হলেন।[৩২]

গোলযোগের একমাত্র কারণ ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য কান্তবাবুর কাছে টাকা ধার করতেন। কান্তবাবু জগৎশেঠের কাছ

থেকে টাকা ধার নিয়ে সেই টাকা কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীকে দিতেন। কান্তবাবুর হিসাব থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে কাশিমবাজার কুঠির ভূতপূর্ব কুঠিয়াল ষ্টিফেনসন সাহেব একাই ১৭৫০০০ টাকা নিয়েছেন আর তাঁর বেনিয়ান নিয়েছেন ৭০০০ টাকা।[৩৩] কাজেই এই টাকা ফেরৎ না পেলে কান্তবাবুর পক্ষে জগৎশেঠের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। জগৎশেঠ প্রস্তাব করলেন যে কোম্পানি তাঁকে ২৭২০০০ টাকার হাতচিটা বা প্রমিসারি নোট দিন, তাহলে তিনি কান্ত মারফৎ আরো ৮০০০০ টাকা কোম্পানিকে দেবেন। কোম্পানি এতে রাজী হলেন না, উপরন্তু কান্তবাবুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে মনস্থ করলেন। জগৎশেঠ দেখলেন যে কান্ত বরখাস্ত হলে তাঁর পক্ষে টাকা আদায় করা অসম্ভব হবে। সুতরাং তিনি কোম্পানিকে জানালেন যে কান্তকে বরখাস্ত করলে তিনি ধরে নেবেন যে কোম্পানি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছেন। ইতিমধ্যে নূতন মাতব্বরের খোঁজে ইংরেজ কোম্পানি নবাবপুত্র সরফরাজ খাঁর দরবারে আনাগোনা ও উপহার দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু কোনও ফল হল না। হাজী আহমদ খাঁ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে নবাব মনে করেন জগৎশেঠের সঙ্গে শত্রুতা করা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করার সামিল। শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠকে ১৩০০০০ টাকা দিয়ে কোম্পানি তার সঙ্গে মিটমাট করলেন। ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দের ২২ অক্টোবরের কনসাল্টেশনে এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, আর আছে জগৎশেঠের এক বিজ্ঞপ্তির ইংরেজী অনুবাদ।[৩৪] জগৎশেঠ এই বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন যে ইংরেজ কোম্পানির দালাল বা গোমস্তা কান্তর কাছে তাঁর আর কোনও দাবিদাওয়া নাই এবং ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির কান্তবাবুকে বরখাস্ত করার চেষ্টাও বিফল হল। জনৈক বুড়া দত্তকে কান্তবাবুর জায়গায় ঐ বছর ৮ সেপ্টেম্বর নিযুক্ত করা হয়। ৩ অক্টোবর স্ট্যাকহাউস সাহেব কলিকাতায় লিখলেন যে বুড়া দত্ত চাকরি করতে অস্বীকার করায় তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। কান্তবাবু চাকরিতে বহাল থেকে গেলেন।[৩৫]

নবাবী হুকুমে ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে আরকট ও মাদ্রাজী টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হল।[৩৬] ইংরেজদের শায়েস্তা করতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩ বাক্স-ভর্তি রুপা জগৎশেঠকে বিক্রি করে ইংরেজ কোম্পানি আবার জগৎশেঠের সুনজরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন।[৩৭]

নবাব সুজাউদৌল্লার সময়কে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে গণ্য করা চলতে পারে। নবাবী ক্ষমতার হ্রাস এবং নবাবী কর্মচারীগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এই সময়কার বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতা-বৃদ্ধির সূত্র ধরেই হয় সম্পদ বৃদ্ধি ; নবাবী কর্মচারীদের সম্পদ এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জগৎশেঠের ক্ষমতা ও সম্পদ আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। বিদেশী কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হন। কাশিমবাজার হয়ে উঠল সম্পদবৃদ্ধির কেন্দ্র-স্থল। বলা বাহুল্য, এই সম্পদবৃদ্ধি প্রায়ই প্রচলিত পথ ছেড়ে নানা গুপ্ত পথে গোপনীয় উপায়ে হয়েছিল। বুদ্ধিমান সাধারণ লোক কান্তবাবুর পক্ষেও প্রায় তিনলক্ষ টাকা সম্পদের জামিন দেওয়া সম্ভব হয়। এই সময় দুইজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা পরবর্তীকালে

ভারত-ইতিহাসে নিজেদের নামকে কায়েমী করেছেন। ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে) বিহারে জন্মালেন আলিবর্দির দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ যিনি পরবর্তীকালে সিরাজদৌল্লা নামে খ্যাত হন। আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চলে জন্মালেন ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস, কালের অমোঘ টানে তাঁকে প্রথমে কাশিমবাজার ও পরে ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছিল। নবাব সুজাউদৌল্লা ১৩ মার্চ ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করলেন। পিতার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বিনা বাধায় নবাব হলেন। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই প্রধান অমাত্যদের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হল। সরফরাজ খাঁ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী ও রাজকার্যে অমনোযোগী হওয়ায় দেওয়ান আলমচাঁদ তাঁকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেন।[৩৮] প্রকাশ্য দরবারে নবাব হাজী আহমদকে সুজাউদৌল্লার বিলাসরমণী সংগ্রহ-কারক বলে অপমান করেন।[৩৯] জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পুত্রবধূকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার ঘটনা সত্য হবার সম্ভাবনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা সরফরাজ খাঁর ব্যবহারে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর নবাব যখন প্রবীণ হাজী আহমদকে প্রধান দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করলেন তখন রাজামাত্যগণ সত্যই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দি খাঁকে এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব করতে ডাকা হল।[৪০]

সরফরাজ খাঁর ভাগ্যাকাশে আরো মেঘ জমে উঠল। নাদির শাহ দিল্লী দখল করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করলেন এবং সরফরাজ খাঁকে তাঁর নামে টাকা ছাপাতে হুকুম করলেন। তদনুযায়ী নবাব সরফরাজের মুদ্রায় নাদির শাহের নাম দেখা যায়। এই বছরই নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেলে মহম্মদ শাহ আবার দিল্লীর বাদশাহ হলেন। সরফরাজ খাঁ অনধিকারীর নামে তনখা বার করে দিল্লীর বাদশাহের বিরাগভাজন হলেন।

সরফরাজ খাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত হীন। নারীসঙ্গ, পানবিলাস ও আলস্য-পরায়ণতা তাঁর চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। রাজকার্যে অমনোযোগ এবং রাজ্যের প্রধান কর্মচারীদের অপমান ও বরখাস্ত শাসনব্যবস্থায় সঙ্কট এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে অমাত্যগণ দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কিত হলেন, সেইসঙ্গে নিজেদের ক্ষমতাহানিতে ক্ষুব্ধ হলেন, ভবিষ্যতে সম্পদহানির সম্ভাবনায় নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। নবাবের পতন বাদশাহ মহম্মদ শাহের অভিপ্রেত, এমন খবরও আলিবর্দির কাছে পৌঁছে গেল। ২০০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২০টা কামান আর ৩০০০ অশ্বারোহী আফগান সৈন্যের পুরোভাগে আলিবর্দি বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন। বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে নবাব স্বয়ং বিদ্রোহীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলেন। গিরিয়ার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নবাব সরফরাজ খাঁ বীরের মতো যুদ্ধ করে হত হলেন (৯ এপ্রিল ১৭৪০ খ্রীঃ)। যে নবাবের জীবনে কোন স্থৈর্য ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে মৃত্যু তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। জালিমসিংহের গল্প সরফরাজের এই কীর্তিকেই শ্রদ্ধা জানান।[৪১]

সরফরাজ খাঁর পতনের সঙ্গে সাধারণভাবে রাজ্যের সব প্রধান ব্যক্তিগণ যুক্ত। জগৎশেঠ

এ ষড়যন্ত্রে কোন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু নবাবের মৃত্যুতে তিনি যে অত্যন্ত লাভবান হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নবাব আলিবর্দি খাঁর দরবারে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সম্মান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ স্বয়ং নবাব আলিবর্দিকে প্রায়ই জগৎশেঠের কাছে টাকা ধার নিতে হওয়ায় তাঁদের ক্ষমতা নবাবের থেকেও বেশি হয়েছিল। এই কারণে সরফরাজের পতন ও মৃত্যুতে জগৎশেঠদের নেপথ্য হস্ত অস্বীকার করা যায় না। ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে হাজী আহমদ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল। ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হল। নবাব আলিবর্দি শক্ত হাতে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন।[৪২] বিহার শাসনব্যবস্থা তাঁরই সৃষ্টি, কাজেই সেখানে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু উড়িষ্যা সরফরাজ খাঁর ভগ্নিপতি রুস্তম জঙ্গ-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করল। ময়ূরভঞ্জের রাজা ও খুরদার রাজা বিদ্রোহী আলিবর্দিকে নবাব বলে স্বীকার করলেন না এবং রুস্তম জঙ্গের সঙ্গে যোগ দিলেন। সারা বছর ধরে যুদ্ধ চলল। নানা যুদ্ধে বারবার জয়ী হয়েও নবাব আলিবর্দি উড়িষ্যাকে আয়ত্বে আনতে পারলেন না। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ শুরু হতেই মারাঠা দস্যুর অশ্বক্ষুরধ্বনি আকাশবাতাস কম্পিত করল। বর্গির হাঙ্গামা শুরু হল।

কাশিমবাজারের জনজীবন শান্তস্নিগ্ধ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। শান্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে এখানকার অধিবাসীরা অভ্যস্ত হয়েছেন। এই সময়ে কাশিমবাজারের জনসংখ্যা একলক্ষ। ব্যবসায়ী শহর হবার জন্য বহু বণিক, মহাজন, স্রফ ও গদিওয়ালা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু। তাদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব খুব বেশি। কেনাবেচার মাঝে মাঝে প্রায়ই কীর্তন শোনা যায়, মৃদঙ্গ আর কর্তালের ধ্বনি ব্যবসায়ীদের উন্মনা করে দেয়।[৪৩] একদিকে বাণিজ্যের প্রসার, অর্থের লেনদেন, ব্যবসার লাভ, অন্যদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত নাম সংকীর্তন করে কাশিমবাজার ঐহিক ও পারত্রিক দুই বিষয়েই সমান দৃষ্টি দিয়েছিল। মাঝে মাঝে বিপদ আসতো।

১৭১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ ইংরেজ কুঠিয়াল আঙ্গে (Ange) মুর্শিদাবাদের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কথা লণ্ডনের ডিরেক্টরদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই আগুনে মুর্শিদাবাদের পাকা বাড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উত্তরে লণ্ডন থেকে জানান হয়েছে যে সব কাঠে তেলের ভাগ বেশি সে সব কাঠ যেন গৃহনির্মাণে ব্যবহার করা না হয়।[৪৪] কিন্তু এই উপদেশ সত্বেও আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে লণ্ডনে লেখা এক পত্রে জানা যায় যে আগুনে কাশিমবাজারের কুঠির সৈন্য থাকার ব্যারাক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেটি মেরামতের জন্যে সেগুন কাঠ পাঠান হয়।[৪৫]

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ইংরেজরা মারাঠা-আক্রমণের খবর লণ্ডনকে জানাতে গিয়ে লিখছে :

"আমরা কাশিমবাজারের স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিমবাজারে মারাঠা-আক্রমণ হতে পারে। বর্ধমান, রাধানগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের ব্যবসায়ীরা এই খবরই এনেছে"।[৪৬]

কলিকাতা থেকে কুঠি রক্ষার জন্য একটি বড় শক্তিশালী সৈন্যদল অনতিবিলম্বে কাশিমবাজারে পাঠান হয়।[৪৭] মারাঠাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে কুঠির চারিদিকে উঁচু প্রাচীর ও মাঝে কামান বসাবার জন্য গম্বুজ (Bastion) তৈরি করা হয়। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে চারটি গম্বুজ তৈরি করে কামান বসান হয়েছে। লণ্ডনে চিঠি লেখা হল যে কুঠি এখন দুর্ভেদ্য।[৪৮] তবে ভাবনা গেল না। মারাঠা-আক্রমণের ভয় ছাড়া নবাবের নজরানার ভয় কম ছিল না; আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে প্রতি গম্বুজের জন্য নবাব আলাদা আলাদা নজরানা দাবি করবেন। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দেও নবাবী শমন না পেয়ে ইংরেজ অবাক হল। লণ্ডনে লিখে পাঠাল যে যুদ্ধের সময়ে এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নবাব সম্ভবত অনুমোদন করেছেন। নজরানার দাবি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত করা হবে না।[৪৯]

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর মারাঠা দস্যুরা বাংলা দেশে আসতে শুরু করল। নবাব স্বয়ং বর্গিদমনের ভার নিলেন। বারবার যুদ্ধে হেরে গিয়েও মারাঠা দস্যু দমিত হল না। সাময়িক শান্তির পর আবার গ্রাম-নগর আক্রমণ করে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার অপহরণ শুরু করত। বর্গির হাঙ্গামা বাঙলা-বিহারের জাগ্রত বিভীষিকা। নবাব কখনও তাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতেন কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। শেষে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্ত হত্যা নবাবের প্ররোচনায় সংঘটিত হল। কিন্তু পর বৎসর আবার বর্গীরা এল—দস্যুতা ও অগ্নিসংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করতে লাগল।

১৭৪২-এর মার্চ মাসে বর্গীদের আগমন-সংবাদ দাবাগ্নির মতো কাশিমবাজারে এসে পৌঁছল। বীরভূম ধ্বংস করে ৮০০০ অশ্বারোহী কাশিমবাজার অভিমুখে ছুটে আসছে, একথা নিমেষমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। আরো রাষ্ট্র হল যে, মারাঠা দস্যুরা কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে না, সুযোগ পেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আটক করে অর্থ আদায়ও করে। একমাসের মধ্যে পলায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে মুর্শিদাবাদে কিংবা কাশিম-বাজারে দেখা যেত না। সবাইকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু জগৎশেঠের প্রাসাদকে লুকিয়ে রাখা কঠিন। জুন মাসে নবাবের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মারাঠা দস্যুরা জগৎশেঠের গদি লুঠ করে দুই কোটি টাকা নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে নিয়ে গেল নানারকমের মূল্যবান খুচরা জিনিস।[৫০] এই ঘটনার পর কাশিমবাজার কাউন্সিল কলিকাতায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পত্র লিখলেন ৭ জুন ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ, আরো লিখলেন যে বর্গীর হাঙ্গামার পর কাশিমবাজার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এমন কি রাজধানী মুর্শিদাবাদেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কুঠির নিকটবর্তী একাধিক চুরি ডাকাতির প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।[৫১]

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা আবার শুরু হল। জগৎশেঠ এবার আগে থাকতেই সাবধান হয়েছেন। টাকাকড়ি, সম্পদ এমন কি বাড়ির মেয়ে ও ছোট ছেলেদের পর্যন্ত ঢাকায়

পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং নবাব আলিবর্দি ও নবাব-ভ্রাতা হাজী আহমদও অর্থ ও সম্পদ ঢাকায় স্থানান্তরিত করে মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলায় প্রস্তুত হলেন। বর্গীদের একটা দলকে অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে অন্যদলকে নবাব যুদ্ধে পরাজিত করলেন। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে নবাব কেবল শক্তিতে নয় বুদ্ধিতেও বর্গীদের পরাজিত করলেন। সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা করতে এসে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলেন। পরের বছর আবার মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করল। আবার দস্যুতা আর অগ্নিসংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করল। বাৎসরিক বর্গীর আক্রমণ এই সময়কার জীবনে নিয়মিত ঘটনা। বহু কবিতা ও ছড়া এই হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে এই সময় রচিত হয়। নয় বছর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করার পর নবাব আলিবর্দি মারাঠাদের সঙ্গে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে সন্ধি করলেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে নবাব বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন এবং সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ মারাঠা অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হল। উড়িষ্যা পাবার ফলে মারাঠা-কর্তৃত্ব আবার সাগরের তীর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হল।[৫২] এই যুদ্ধের ব্যয়ভার নবাব জগৎশেঠ ও বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে আদায় করলেন। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দেই নবাব ত্রিশ লক্ষ টাকা বিদেশী বণিকদের কাছে চাইলেন। ইংরেজরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করলে নবাব বলে পাঠালেন যে, আগে ইংরেজ কোম্পানির মাত্র চার পাঁচ খানি জাহাজ ছিল। এখন তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা জাহাজ বন্দর-কাশিমবাজারে যাওয়া আসা করে। তার ওপর নবাব তাদের কলিকাতা শহরের রক্ষক সুতরাং অন্ততপক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকা কেবল ইংরেজ কোম্পানির কাছে তাঁর যুক্তিসঙ্গত দাবি। অবশেষে কলিকাতার কাউন্সিল এক লক্ষ টাকা মাত্র মঞ্জুর করলেন। কাশিমবাজারের কুঠিয়াল জন ফর্স্টারের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত নবাবী দাবি ও ইংরেজ কোম্পানির দেয়-র মধ্যে সামঞ্জস্য করা হল। তদনুযায়ী ফর্স্টার ১৬ সেপ্টেম্বর ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলকে জানালেন যে নবাব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং বিনিময়ে এক পরোয়ানা জারি করে কোম্পানির হুগলি, পাটনা, ঢাকা ও বিভিন্ন আড়ঙ্গের বাণিজ্য-অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। জগৎশেঠ ফতে চাঁদ স্বয়ং এই পরোয়ানা কাশিমবাজারে এসে কুঠির প্রধানের হাতে অর্পণ করেন। নবাব আলিবর্দি এই অর্থ পেয়ে খুবই খুশি হন, কারণ তিনি কলিকাতা কাউন্সিলের প্রধানের জন্য শিরোপা ও একটা হাতি উপহার দেন। কলিকাতা কাউন্সিল নবাবকে একটা আরবী ঘোড়া উপহার দেন। নবাব বহিঃশত্রুর আক্রমণে কোম্পানির সৈন্য সাহায্যের প্রস্তাবও করেন কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি তাতে রাজী হন না।[৫৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই সময় ইংরেজ কোম্পানির নবাবের সঙ্গে দরাদরি করার ক্ষমতা এসেছে। কেবল তাই নয় ইংরেজদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নবাব অবহিত ছিলেন, তা না হলে তাদের কাছে কখনই সৈন্যসাহায্য চাইতেন না। জগৎশেঠের ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে সহৃদয়তা ছিল এ-খবর সকলেই জানতেন। এই সখ্যতার প্রয়োজনও ছিল। মারাঠা ভীতিতে ইংরেজদের ব্যবসা ভাল না হওয়ায় জগৎশেঠের কাছে তাদের

টাকা ধার করতে হয়। এই সময়ে নবাবের টাকার প্রয়োজন কোনও শেঠ বা ব্যবসায়ীকে বাদ দেয় নি। বার বার টাকা ধার দিতে দিতে স্বয়ং জগৎশেঠও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'দেশে এখন নবাব বা ভগবান কিছুই নেই। কোনও নিয়মশৃঙ্খলা দেখা যায় না। আছে শুধু লোভ, শুধু টাকা পাবার তৃষ্ণা'।[৫৪] মারাঠা সন্ধি হবার আগে পর্যন্ত ইংরেজদের জগৎশেঠের কাছে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১২৮২০৮/০ টাকা মাত্র।[৫৫]

বর্গীর হাঙ্গামা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মারাঠারা যে দস্যু ছিল না কিংবা বাংলা বিহারে অত্যাচার করার পেছনে ছিল তাদের আইনসঙ্গত অধিকার এবং বাদশাহী অনুমোদনেই যে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয় এ কথা প্রায়ই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলা নবাব আলিবর্দির সঙ্গে কাটোয়ায় মিলিত হন। রঘুজীর সঙ্গে ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত। এই সময় নবাব আলিবর্দি জানতে পারেন যে দিল্লীর বাদশা মারাঠা ছত্রপতি রাজা সাহুকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকার চৌথ দান করেছেন। একমাত্র সর্ত যে রাজা সাহুকে এই চৌথ বাহুবলে আদায় করতে হবে। রাজা সাহু রঘুজী ভোঁসলাকে এই চৌথ দান করলেন। দিল্লীর বাদশা কিন্তু ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজী রাওকে এই খবর দিয়েছেন।

পেশোয়া বালাজী রাও, রঘুজী ভোঁসলার দীর্ঘদিনের শত্রু, সুতরাং বাদশাহী আদেশে চৌথ আদায় করা এবং রঘুজীকে নিরস্ত্র করার জন্য বালাজী রাও বাংলা সুবায় সসৈন্য প্রবেশ করলেন। রঘুজী ইতিমধ্যে উড়িষ্যায় ঘাঁটি স্থাপনা করেছেন। সুতরাং বাদশাহী আদেশের ফলস্বরূপ দুই দল মারাঠা বাহিনী বাংলায় এল এবং অত্যাচারে-অনাচারে বাংলার জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে চুক্তি অনুযায়ী সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে মারাঠাদের সরে যেতে হল এবং তৎকালীন উত্তর-উড়িষ্যার কিছু অংশ মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হল।[৫৬]

ইতিমধ্যে নবাব আলিবর্দিকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। পাটনার পাঠান বিদ্রোহে ভ্রাতা হাজী আহমদ এবং তাঁর পুত্র, আলিবর্দি-জামাতা জৈনুদ্দিন আহমদ নিহত হন। নবাব-কন্যা সিরাজ-মাতা আমিনা হলেন বন্দিনী। সময় ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ। মারাঠা যুদ্ধ স্থগিত রেখে বৃদ্ধ নবাব সসৈন্যে পাটনা গেলেন এবং বিদ্রোহী পাঠান সৈন্যদের পরাজিত করে কন্যার মুক্তি সাধন করলেন। জামাতার জায়গায় দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ্ সিরাজদৌল্লা বিহারের নামমাত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। সিরাজের বয়স তখন পনের বছর তাই রাজা জানকীরামের হাতে বিহারের শাসনভার দিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তিনি ফেরামাত্র পঞ্চদশবর্ষীয় নবাব-দৌহিত্র রাজা জানকীরামকে অপমানে জর্জরিত করেন এবং বিলাস-সঙ্গীদের কুপরামর্শে রাজা জানকীরামকে পদচ্যুত করে স্নেহময় পিতামহ স্বয়ং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বলা বাহুল্য এখবর গোপন থাকেনি। বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং পাটনায় এসে সিরাজকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন ও রাজা জানকীরামকেই বিহারের শাসনকর্তার পদে পুরাপুরি নিয়োগ করলেন।[৫৭]

ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হিসাব থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৭৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা ৩৩৬৬০৫০ সিক্কা টাকা বাংলাদেশের ব্যবসায়ে লগ্নি করেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে একটি বিদেশী কোম্পানি যখন ৩৩৬৬০৫০ টাকা লগ্নি করেছেন, তখন নিশ্চয়ই বাংলাদেশে শান্তি বিরাজিত ছিল। এই টাকার মধ্যে ৫৬৮৪০০ টাকা কাশিমবাজারে লগ্নি করা হয়।[৭৮] ১৭৫১ থেকে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার হয়েছে। সাধারণ লোক সম্পত্তি কেনার সাহস পেয়েছে। ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত নন্দী কাশিমবাজারে পাঁচটি সম্পত্তি পাট্টা ও কবালা মূলে খরিদ করেন—প্রথম তিনটি স্বনামে এবং শেষের দুইটি বেনামে।[৭৯] নবাবের জীবনের শেষ পাঁচ বছর বাংলায় কোন যুদ্ধ হয়নি। অবশেষে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে (মতান্তরে ৮২ বছর বয়সে)[৮০] বৃদ্ধ নবাব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে আসেন। মাদ্রাজ ও কলিকাতায় অল্প দিন অবস্থানের পর ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কাশিমবাজারে পাঠান হয়। তখন তাঁর মাহিনা নির্দিষ্ট হয় বাৎসরিক পাঁচ পাউণ্ড এবং কুড়ি টাকা মাসিক; এ ছাড়া কাপড় ধোয়াবার জন্য সামান্য খরচও তাঁকে দেওয়া হত। কাশিমবাজারে উইলিয়াম ওয়াট্সের অধীনে তিনি প্রথমে কোম্পানির সিল্কের ব্যবসা দেখাশোনার ভার পান। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের সভার বিবরণী লেখার কাজে দেখা যায়। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাশিমবাজার কাউন্সিলের সেক্রেটারি ও স্টোরকিপার পদে নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের বন্ধু মারিয়ট লিখেছেন, প্রতি বছর বন্যায় কাশিমবাজারের নানা অঞ্চল সহজে প্লাবিত হলে তাঁরা দুইবন্ধু প্রায়ই জলবন্দী হওয়ার আনন্দ উপভোগ করতেন।[৮১]

নবাব সিরাজদৌল্লা ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মে মাসে মাতৃষসা ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণ করলেন, রাজা রাজবল্লভ কারারুদ্ধ হলেন, মীরজাফর ও রায়দুর্লভ পদচ্যুত হলেন এবং সেই জায়গায় রাজা মোহনলাল কাশ্মীরী ও মীরমদন যথাক্রমে মন্ত্রী ও সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর মহাতব রায় জগৎশেঠ ও তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ বিত্তের, প্রভাব ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ইতিহাসে বার বার এঁরা জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল নামে উল্লেখিত হয়ে খ্যাত হয়েছেন। সিরাজদৌল্লা জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে অপমানিত করলেন। নবাবের বিরুদ্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমান ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ক্ষোভ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। নবাব ২ জুন ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করে কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি দখল করলেন। কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স ও সহাধ্যক্ষ কোলেট বন্দী হলেন। ৯ জুন হেস্টিংস কারারুদ্ধ হলেন। সিরাজদৌল্লা ৯ জুন পর্যন্ত কাশিমবাজারে কোলেট সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই কলিকাতা-জয়ে যাত্রা করেন। কুঠি আক্রান্ত হলে ব্যাটসন ও সাইকস পলায়ন করেন। সেনাপতি লেঃ ইলিয়ট পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মহত্যা করেন।[৮২] হেস্টিংসকে বেশিদিন আবদ্ধ থাকতে হয়নি। ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরনেট সাহেব ৩০০০ টাকা জামিনে

হেষ্টিংসের মুক্তিক্রয় করেন। কান্তবাবুর সহায়তায় এই অর্থ সংগৃহীত হয়। হেষ্টিংস ও কান্তবাবুর মধ্যে এই ঘটনার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সখ্যতার সূত্রপাত হয়। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজের সৌভাগ্যের সময়। একের পর এক সাফল্য যদি তরুণ নবাবকে দিশেহারা করে দিয়ে থাকে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ২০ জুন সিরাজ কলিকাতা জয় করলেন। সে বিজয়োৎসব মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের নাগরিকদের দীর্ঘকাল মনে ছিল। ওয়াট্স ও কোলেট মুক্তি পেলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। ১০ অক্টোবর মনিহারির যুদ্ধে শওকত জঙ্গের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সিরাজের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত। এরপর দেখা যায় নবাব দ্বিধাগ্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভীত, ত্রস্ত, আশঙ্কিত; কখন ইংরেজ কখন ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি ও সাহায্যের প্রস্তাবে উন্মুখ। উড়িষ্যার মারাঠাদের সাহায্য চাওয়া উচিত কিনা, তাও নবাবের বিবেচনাধীন। এই চিন্তার কারণ ছিল। ক্লাইভের নেতৃত্বে ২৭ ডিসেম্বর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের উদ্যম আরম্ভ হল। ফলতা থেকে ক্লাইভ ও ওয়াট্সনের নেতৃত্বে স্থলপথে ও জলপথে অভিযান শুরু হল। ২৯ ডিসেম্বর বজবজ দুর্গ ইংরেজ অধিকার করল। কলঙ্কিত ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ বাংলার মুখে দুরপনেয় কালিমা লেপন করল। ২ জানুয়ারি ক্লাইভ কলিকাতা পুনরুদ্ধার করলেন। ১৯ জানুয়ারি নবাব সসৈন্যে হুগলিতে উপনীত হলেন। ৩ ফেব্রুয়ারি উমির্চাদের বাগানে (বর্তমানে যেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অবস্থিত) ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভের নবাব-ঘাঁটি আক্রমণ হঠকারিতার সাফল্যের এক জলন্ত উদাহরণ। ৬ ফেব্রুয়ারি নবাব পলায়ন করলেন। ৯ ফেব্রুয়ারি আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। কলিকাতা ইংরেজ-অধিকারে এল। বিজয়ী ইংরেজ যা চাইলেন নবাব সব কিছু দিতে সম্মত হলেন। নবাব ইংরেজদের দুর্গস্থাপনে অনুমতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে ও সিক্কা টাকা বানাতে দিতে সম্মতি জানান হল।[৬৩] ইংরেজগণ যে সুবিধা চাইলেন নবাব সবই দিতে সম্মত হওয়ায় ইংরেজদের মনের বল বহুগুণ বেড়ে গেল। নবাবের দুর্বলতার এই নিদর্শনই ক্লাইভের পক্ষে যথেষ্ট। ক্লাইভের ফরাসী চন্দননগর-জয় সিরাজের পরাজয়ের প্রথম ধাপ। কলিকাতা-জয়ে রাজা মানিকচাঁদ যেমন উৎকোচ গ্রহণ করে শহররক্ষার ব্যবস্থায় অবহেলা করেন, চন্দননগর-জয়ের সময় নন্দকুমার তেমনি ইংরেজপক্ষ থেকে ঘুষ নিয়ে এই শহর রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করলেন না।[৬৪] ফরাসীদের অধিকৃত এই শহর রক্ষা করতে নবাব বিন্দুমাত্র সাহায্য করলেন না। বরঞ্চ চন্দননগরের পলাতক ফরাসীরা যখন কাশিমবাজারে উপনীত হল, তিনি তাদের কাশিমবাজার ছেড়ে যাবার আদেশ দিলেন। সিরাজের একমাত্র সুহৃদ্ মশিয়ে ল্যাঁ লা ছিলেন কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ। তিনিই প্রথম নবাবকে সভাসদ্‌গণের ষড়যন্ত্রের খবর দিয়ে সাবধান করে দেন এবং ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আশংকাপ্রকাশ করেন। নবাব লা সাহেবের কথায় কর্ণপাত করলেন না। ২৩ মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করলেন, আর ১৬ এপ্রিল কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠি তুলে দিয়ে জাঁ লা সাহেব সদলবলে পাটনা যাত্রা করলেন। যাবার আগে নবাবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে বিপদের সময় নবাব যেন

তাঁকে স্মরণ করেন। পলাশির যুদ্ধে পরাজিত সিরাজ পাটনায় মঁসিয়ে লা-র কাছেই পৌছবার চেষ্টা করেছিলেন। জাঁ লা সাহেবও সিরাজদৌল্লাকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাংলার সীমান্তে অপেক্ষা করছিলেন। ভগবানগোলায় সিরাজ যখন ধরা পড়লেন, লা সাহেব তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে।

নবাবের এই অনীহার কারণ সিরাজের চরিত্র। বিলাসব্যসনে, চরিত্রহীনতায়, নৃশংসতায়, ধর্ষণে, অত্যাচারে তখন তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তরলমতি, অল্পবয়সে ক্ষমতার অহংকার এবং কুসঙ্গ সিরাজদৌল্লার নামে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে নবাবের নাম ছিল দুঃস্বপ্ন, নবাবের কীর্তি ছিল লজ্জাকর।[৬৫] ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র করার তাই বিরাট সুযোগ এল; নবাব সরফরাজের মতো নবাব সিরাজদৌল্লার গদিচ্যুতির প্রয়োজন হল। ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মীরজাফর, রায়দুর্লভের পেছনে বাংলার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হলেন। ইংরেজদের ওপর নবাবকে সরাবার ভার দেওয়া হল। কাশিমবাজারের বাতাস সিরাজের পতনের চক্রান্তে পূর্ণ হয়ে উঠল। কাশিমবাজারে জগৎশেঠের বাড়ি আর ইংরেজদের কুঠি হয়ে দাঁড়াল আলোচনার কেন্দ্রভূমি। অবশেষে ৫ জুন ওয়াট্‌স-মীরজাফরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১২ জুন ওয়াট্‌স, সাইকস্, কোলেট ও হেস্টিংস কাশিমবাজার থেকে পলায়ন করলেন।[৬৬] ১৯ জুন কাটোয়া দুর্গ জয় করে ইংরেজ ২২ জুন পলাশিতে সৈন্যসমাবেশ করল।[৬৭] ইতিমধ্যে আহমদ শা আবদালী চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করেছেন। দিল্লী দখল করে তিনি ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মার্চ মথুরা অধিকার করেন। হত্যা ও অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী লোকের মুখে মুখে বাংলায় এসে পৌছল। নবাব আশঙ্কা করলেন যে এই দিগ্বিজয়ী সুবা-বাংলায় উপনীত হবেন ও রক্তের স্বাক্ষরে নিজের নাম চিহ্নিত করে যাবেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে আবদালীর আক্রমণের ভয়েই তিনি ইংরেজদের যুদ্ধসজ্জা ও ঔদ্ধত্য সহ্য করেছেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজের কাপুরুষতা আহমদ শা আবদালী -ভীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[৬৮] ওই বছর এপ্রিল মাসে আহমদ শা ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার খবর পাবার পরেও সিরাজের অকর্মণ্যতাকে তাই ক্ষমা করা যায় না। পলাশিতে নবাব যুদ্ধ করতে গেলেন যেন নিরুপায় হয়ে, প্রাণের ভয়ে সর্বদা রইলেন ত্রাস্ত, তারপর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার আর-এক উদাহরণ সৃষ্টি করে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হলেন পলায়িত।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ। নবাবের ৫৩খানা কামানের মধ্যে ৪১টা থেকে কোন গোলা ছোঁড়া হয়নি। নবাবসৈন্যের কেবল একপঞ্চমাংশ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পদচ্যুত সিপাহসালার, দেওয়ান বা মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে যুদ্ধে আসা মীরজাফর ও ওয়াট্‌সের চুক্তি না থাকলেও অনুমোদন করা যায় না। যে অবস্থায় নবাব এই সব অপমানিত অমাত্যের কাছে বিশ্বাস বা আনুগত্য প্রত্যাশা করেছিলেন, তাতেই তাঁকে বাতুল বা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট। আরও সন্দেহ হয় যে বিলাসে মগ্ন নবাব মঁসিয়ে লা সাহেবের একটা কথাও বিশ্বাস করেন নি। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তাঁর

পলায়ন (কলিকাতার যুদ্ধেও তাই করেছেন) যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার লক্ষণ। হাতিতে, মতান্তরে উটে চেপে পলায়নে সন্দেহ হয়, তিনি অশ্বারোহণ করতে পারতেন কিনা! সব দিক বিবেচনা করলে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কিছু কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়; যেমন তিনি একাধিক নর্তকী নিয়ে পলাশিতে যুদ্ধ করতে আসেন এবং পলায়নের সময় তার স্ত্রী নয়, সঙ্গে ছিল আর-এক প্রণয়সঙ্গিনী। সিরাজদৌল্লার যে ছবি স্বাভাবিকভাবেই ভেসে ওঠে তা দাদুর আদরের নাতি, দুর্বিনীত, বদরাগী, অত্যাচারী। ক্ষমতার সুরায় যা ইচ্ছা তাই করার মোহে মত্ত। যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক বিলাসীকেই পাই বারবার, যিনি যুদ্ধ-জয়ের কৃতিত্ব নেন, কিন্তু যুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। সে ভার থাকে সৈন্যাধ্যক্ষদের হাতে। বর্গির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত অশীতিপর নবাব আলিবর্দির সম্পূর্ণ বিপরীত এই চরিত্র। বিপরীত, কিন্তু নূতন নয়। বাংলার নবাবের এই রূপই স্বাভাবিক। আসঙ্গলিপ্সা, নর্তকী আর সুরায় তাদের জন্মগত অধিকার। কেবল নবাব কেন, অর্থবানরা সকলেই কমবেশি এই সকল নবাবী গুণের অনুকরণ করতেন। এটাই ছিল তৎকালীন অভিজাত জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ধারা। মুর্শিদকুলী খাঁ বা আলিবর্দি খাঁ ছিলেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

২৪ জুন প্রথমে গোলকটে ও পরে নৌকাযোগে নবাব পাটনা যাত্রা করলেন। আবার প্রশ্ন জাগে, তবে কি বিলাসী সিরাজ অশ্বারোহণ জানতেন না? ৩০ জুন সিরাজ ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পলাশির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের এই অসহায়তায় অবাক হতে হয় বৈকি! কি অদ্ভুত একাকীত্ব, কি সাংঘাতিক সুহৃদ্‌হীনতা। একাকী লুৎফ-উন্নিসা সমভিব্যাহারে নবাবের শকট ও নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা মনকে ব্যথিত করে। বাংলার নবাবের পতাকাতল কি বাংলাদেশের একটি লোককেও আকর্ষণ করতে পারল না? মৃত্যুর থেকেও এই পরিণাম আরো দুঃখের। ২ জুলাই মীরনের প্ররোচনায় গুপ্তঘাতকের হাতে সিরাজের মৃত্যু হল। ৩ জুলাই হস্তীপৃষ্ঠে মৃতদেহের নগরভ্রমণ ও সমাধি। হতভাগ্য সিরাজের ইতিহাস শেষ হল।

এর মধ্যে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে এসে মীরজাফরকে নবাবী দিয়েছেন ২৯ জুন। কাশিম-বাজার কুঠিতে বসে ইংল্যাণ্ডে তাঁর পিতাকে ক্লাইভ চিঠি দিয়ে দেশের বাড়ি মেরামত করতে লিখলেন, আর লিখলেন তার জন্যে পার্লামেণ্টে একটা আসন সংগ্রহ করতে।[৬৯] মীরন ক্লাইভকেও গুপ্তঘাতক দিয়ে বধ করার মতলব করেছিলেন। কিন্তু মীরনের এই চেষ্টায় বাদ সাধলেন জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল। তাঁরা এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ক্লাইভকে সাবধান করে দিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল বাদে সবাই ভেবেছিলেন যে ইংরেজ যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে। ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই দেশের শাসনভার নেবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। জগৎশেঠরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, দেশে স্থায়ী শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা না হলে তাঁদের ব্যবসায়ে বিরাট ক্ষতি হবে, তাই ইংরেজদের বাংলা-বিহারের দেওয়ানী নেবার জন্য উৎসাহিত

করেন। মঁসিয়ে লা স্পষ্ট করে লিখে গেছেন যে ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন শেঠভ্রাতৃদ্বয়; তাঁদের কাছ থেকে জোর না পেলে ষড়যন্ত্র সফল হতে পারত কিনা সন্দেহ। ইংরেজ কিন্তু প্রথমে মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরতে চায়নি। যখন ধরল, জগৎশেঠ হলেন তাদের প্রথম বলি। টাঁকশাল কলিকাতায় এল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে। জগৎশেঠের আর টাকা তৈরি বা বিনিময়ের অধিকার থাকল না। নবাবের পাওনাদার থেকে জগৎশেঠ-বংশ সামান্য জমিদারে পরিণত হল। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং হাউস জগৎশেঠ দিল্লীর বাদশাহকে টাকা ধার দিয়েছেন। পেশোয়ার থেকে মালয় পর্যন্ত জগৎশেঠের হাতচিটা বা হুণ্ডি টাকার লেনদেন করেছে। পলাশির যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যে তাঁদের পতন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবথেকে বড় দুঃসংবাদ।[৭০]

পলাশির যুদ্ধের পর কাশিমবাজারের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল। ইংরেজ বণিকেরা হয়ে উঠল নবাবের থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী। মাত্র একবছর আগে যারা ছিল নবাবের নিম্নতম কর্মচারীর করুণাভিখারি, উৎকোচ আর উপহারে বাণিজ্যের অধিকার বজায় রাখাই ছিল যাদের একমাত্র কর্ম, এখন তারা শুধু নবাবের প্রধান সহায় নয়, তাঁর আজ্ঞাকারী। কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে সম্মানিত সভাসদের মর্যাদা পেলেন। তাঁর নাম হল রেসিডেণ্ট। কুঠির নামকরণ হল কাশিমবাজার রেসিডেন্সি। বেশ বড় গোছের সিল্কের কারখানা স্থাপিত হল কাশিমবাজারে ব্যবসার প্রসারের জন্য। রপ্তানির জন্য আলাদা গৃহ নির্মিত হল।[৭১] বস্তুত শাসনক্ষমতায় এবং ব্যবসায়ে কাশিমবাজার কয়েক বছরের জন্য বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা প্রাপ্ত হল।

॥ তিন ॥

আচার্য যদুনাথ পলাশির যুদ্ধকে নবযুগের সূচনা বলেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরোনো যুগের খোলস ছিঁড়ে ফেলে নূতন যুগের জন্ম হল, যার ফলে শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতি ও জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষে এক অপূর্ব জাগরণের সময় এল।[৭২] অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম সোপান কাশিমবাজার। পলাশির অব্যবহিত পরবর্তী যুগে কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁদের কাজকর্ম সম্প্রসারণ করলেন। কেবল ইংরেজ বা অন্যান্য ইওরোপীয় জাতির কোম্পানি নয়, বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হলেন। সুদূর গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীর দল কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে বসবাস শুরু করলেন। ইংরেজ বণিকগণ সিল্কের উৎপাদনকে শিল্পের মর্যাদা দিলেন এবং ইটালী হতে একদল কারিগরকে নিয়ে এসে রেশম উৎপাদনের উন্নতি করলেন।[৭৩] নানা বিদেশী উপায়ে (winding and reeling) উৎপন্ন রেশমের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করতে শুরু করলেন। রেশম ও সোরা রপ্তানি ইংরেজ কোম্পানির সবথেকে বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। এই ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজার হয়ে উঠল বিশিষ্ট নগরী। সোরা সাধারণত পাটনা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত বটে, কিন্তু তা জমায়েত হত কাশিমবাজারে এবং সেখান

থেকেই সময়ে সময়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করত। একটা বৃহৎ বাগান কাশিমবাজারে আজও সোরাখানা বাগান নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে। সোরাপূর্ণ নৌকাগুলিকে শীতকালের শীর্ণা জলঙ্গী নদী পার করে দেবার অনুরোধ প্রায়ই কাশিমবাজারের রেসিডেণ্টকে রক্ষা করতে হত।[৭৪] পাটনা থেকে সোরাপূর্ণ নৌকাগুলি কাশিমবাজার হয়ে কলিকাতা অভিমুখে যেত। ক্ষীণ নদীস্রোতের জন্য যাতে নৌকাগুলি থেকে সোরা নামান না হয়, তার আবেদনও দেখা যায়।

রাজনৈতিক ঔজ্জ্বল্যের শেষ মুহূর্তে কাশিমবাজারের অর্থনৈতিক উদ্দীপনার শুরু। রাজনৈতিক জীবনের মতই কাশিমবাজারের ব্যবসায়ী প্রাধান্য অল্প সময়ের জন্য প্রচণ্ড উন্নীত হয়ে অবহেলার অন্ধকারে বিলীন হয়। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী ৭০ বছর কাশিমবাজারের সর্বাপেক্ষা উন্নতির সময়। পদ্মা থেকে গঙ্গা নদী বিভক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদিয়াতে জলঙ্গী নদীর সঙ্গে মিলিত। পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত গঙ্গানদীর এই প্রবাহ কাশিমবাজার নদী নামে সুখ্যাত হল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই নাম প্রচলিত ছিল। কাশিমবাজার নদী, পদ্মা ও জলঙ্গী নদীর মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ ভূখণ্ড তিন নদীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মণ্ডলীকৃত হওয়ায় দ্বীপের আকার গ্রহণ করল। এই ভূভাগের নামকরণ হল 'কাশিমবাজার দ্বীপ' (The Island of Cossimbazar)।[৭৫] অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই আমরা এই দ্বীপটির কথা বিদেশী কাগজপত্রের মধ্যে দেখতে পাই। রবার্ট ওর্মে তাঁর ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বই-এ (A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan) বারবার কাশিমবাজার দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। ওর্মে লিখেছেন 'কাশিমবাজার দ্বীপে অবস্থিত পলাশি…' এমনকি 'কাশিমবাজার দ্বীপে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ সহর…' কাশিমবাজার দ্বীপের পরিধি লম্বায় অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল, আর চওড়া কোথাও ত্রিশ মাইলের বেশি নয়; বরঞ্চ উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত প্রায় ত্রিকোণাকৃতি।[৭৬] মেজর রেনেল ১৭৬৩ থেকে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রথমবার বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় জরিপ করেন। বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলির উল্লেখ করেন এইভাবে: 'কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ঢাকা, কাশিমবাজার, মালদা ও হুগলি।'[৭৭]

পলাশির দামামানিনাদের প্রতিধ্বনি থেমে যাবার আগেই মুর্শিদাবাদ স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করল। বাজার, হাট, ব্যবসা, বাণিজ্য নিয়মিত শুরু হয়ে গেল। সিরাজের হত্যায় কোন চাঞ্চল্য জনজীবনে পরিলক্ষিত হল না। 'ক্লাইভের গর্দভ' রূপে খ্যাত নবাব মীরজাফর তাঁর নবনিযুক্ত দেওয়ান বা মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের মারফত দেশশাসনের অভিনয় করতে থাকলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হলেন। স্ক্রাফটন হলেন রেসিডেন্ট তথা নবাবের সভাসদ্। স্ক্রাফটনের ওপর থাকল রাজনীতির ভার, হেস্টিংস কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য দেখতে গেলেন। এক বছর পর স্ক্রাফটন কলিকাতায় গেলে হেস্টিংস যুগপৎ প্রধান ও রেসিডেন্টের কাজের ভার পেলেন।[৭৮] একা

সমস্ত বিষয়ের দেখাশোনা করা সহজ ছিল না। ব্যক্তিগত শোক হেস্টিংসকে ভারাক্রান্ত করল। তাঁর স্ত্রী ও সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যু হল। পুত্র জর্জ অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী-কন্যাকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই কাশিমবাজারে কবরস্থ করে হেস্টিংস ক্লাইভকে পত্র লিখলেন: 'অল্পবয়সে এত দুর্ভাগ্য অতি অল্পলোকের হয়। আমি সেই হতভাগ্যদের একজন।' আরো লিখলেন: 'যে ভবিতব্য আমাকে এই দুঃসহ ব্যথা দিয়েছে, সেই আমার মনকে তা সহ্য করার শক্তিও দেবে।'[৭৯] স্ক্রাফটন লিখে পাঠালেন: 'মুর্শিদাবাদের যত দোষই থাক, মনের শক্তি গঠন করার অমন জায়গা আর নেই।' কিছুদিন পরে হেস্টিংস ক্লাইভকে লিখলেন: 'বারবার প্রতিবাদ করে কোন ফল নেই। এখানকার লোকেদের মনে ন্যায়, লজ্জা বা অনুশোচনা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।' বারবার লেখা সত্ত্বেও কাশিমবাজারে আর কোন দায়িত্বপূর্ণ লোককে পাঠান হল না। হেস্টিংস একাধারে রেসিডেন্ট ও প্রধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ওই দুই পদে কায়েমি করা হল।[৮০]

ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করলেন। অন্যায় ও কলুষের বান ডেকে গেল। হেস্টিংস ক্লাইভের জন্য দুশো মন রেশম গুজরাটে পাঠালেন এবং নিজেও রেশমের ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করলেন। চীনে ক্লাইভ যে সিল্কের সম্ভার পাঠালেন তাতে হেস্টিংসও অংশীদার ছিলেন। কান্তবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসের যোগাযোগ এই সময়ে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হল। বস্তুত ব্যবসার প্রসারে কান্তবাবু হেস্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কাজ করতেন। সাইকস, হ্যানকক ও বারওয়েলের সহযোগিতায় নানা বাণিজ্যের লভ্যাংশ হেস্টিংস লাভ করেন এবং ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে দুশো পাউণ্ড পাঠাতে সক্ষম হন। কোন ব্যবসাই হেস্টিংসের কাছে ছোট ছিল না, এমন কি কোম্পানিকে কামানের গাড়ি টানবার বলদ (Bullock) সংগ্রহ করে দেবার কনট্রাক্টও হেস্টিংস পূরণ করেন।[৮১] ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে ৫০০০ মন রেশম ইওরোপে রপ্তানি হয়।[৮২]

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চারিদিকে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফরাসী কোম্পানি জগৎশেঠের কাছে সাত লক্ষ টাকা ঋণ করেছিলেন। টাকা শোধ করার ক্ষমতা ফরাসী কোম্পানির ছিল কি না বলা শক্ত; তবে তাঁরা ধার শোধ করলেন না। ফলে ফরাসী কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির যাবতীয় সম্পত্তি মায় ঘরবাড়িদুর্গ জগৎশেঠ দখল করে নিলেন। কাশিমবাজারে ফরাসী কোম্পানির ইতিহাস এখানেই শেষ হল।[৮৩]

ভারতের ইতিহাসেও বিরাট পরিবর্তনের সময় এই বছর। দিল্লীতে শাহ-আলম বাদশাহ হলেন। আহমদ শা আবদালী দিগ্বিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করে দিল্লীর বাদশাহের বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাঁর বন্ধুত্বে আশ্বস্ত দিল্লীর বাদশাহ বাংলা সুবা পুনরুদ্ধারের জন্য অযোধ্যার নবাবের সহযোগিতায় পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে বাংলার নবাবের সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা ইংরেজবন্ধু রায় দুর্লভরামকে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখা যায়। অন্যদিকে নবাবের মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্য মারাঠাদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। স্বয়ং মীরজাফরের পদচ্যুতির জন্য

ক' শমবাজার রেসিডেন্সি
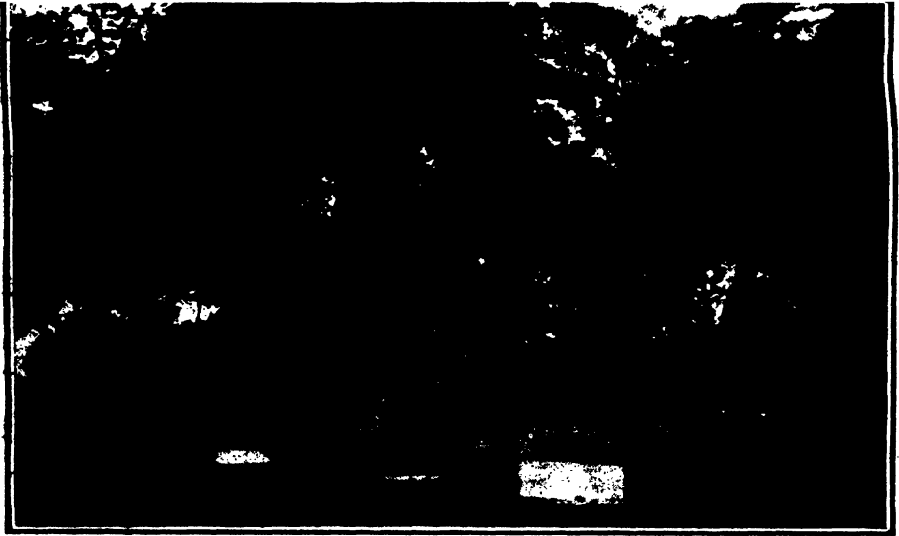
(১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

মিসেস্ হেষ্টিংসের সমাধি

[কাশিমবাজার]

বাদশাহের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের পত্রালাপ প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজ সন্দেহ করে, মন্ত্রীমহাশয় ওলন্দাজদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন ও ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ইংরেজ জালিয়াতির অভিযোগ করে।[৮৪] এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের মুহূর্তে কে কার দিকে বোঝা সহজ নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাইভ স্বদেশযাত্রা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মীরজাফরের নবাবি গেল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট স্বয়ং মীরজাফরকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করলেন ও মীরকাশিমকে নবাবের গদিতে বসালেন। ওদিকে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ-শক্তি ক্রমবর্ধমান। কুট ও মন্‌সন ফরাসী পণ্ডিচেরি অবরোধ করার ফলে লালী সসৈন্যে উপবাসী। এদিকে আহমদ শা আবদালী যমুনার তীরে সিন্ধিয়ার সৈন্যদের পরাভূত করে হত্যালীলায় মেতে উঠলেন। বাদশাহ শাহ্‌-আলম পাটনার উপকণ্ঠে কার্‌নাকের নেতৃত্বে ইংরেজ-বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। অরক্ষিত দিল্লী মারাঠাগণ অধিকার করে পানিপথ পর্যন্ত সৈন্যসমাবেশ করলেন।

কাশিমবাজার কুঠিতে বসে হেস্টিংস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এদেশে থেকে যদি নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে হয় তাহলে শাসনরজ্জু ইংরেজকে গ্রহণ করতে হবে। তা না-হলে নদীর প্লাবনে যেমন কাশিমবাজার রেসিডেন্সি প্রতিবছর জলমগ্ন হয়, তেমনি তাদের ব্যবসা-প্রচেষ্টা রুদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর যখন দুর্বার জলোচ্ছ্বাস আসবে, তখন কুঠি বা ব্যবসা রক্ষা করার কোন উপায় থাকবে না। হেস্টিংস কলিকাতায় গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখে পাঠালেন: 'এদেশে থাকতে হলে ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে হবে।' ভ্যান্সিটার্ট এ-বিষয়ে একমত হলেও ভারতীয়দের কোম্পানির কাজে নিয়োগ করার প্রস্তাব কাউন্সিলে পাশ করাতে পারলেন না। তবে এই ঘটনা উপলক্ষে ফার্সী ভাষার এই দুই ছাত্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা হল। ক্লাইভ কাশিমবাজারেই হেস্টিংসের কাজকর্ম দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'নির্লোভ ও কর্তব্যপরায়ণ' বলে প্রশংসা করলেও হেস্টিংসের এদেশীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের মতামত শোনার ইচ্ছাকে ক্লাইভ 'চরিত্রের দুর্বলতা' বলে অভিহিত করেছেন।[৮৫] হেস্টিংস কাশিমবাজারে থাকাকালীন ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তিলাভ করেন এবং সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা শুরু করেন। ভি বি. কুলকার্নীর মতে এই সময়ে তিনি বাংলা ভাষাও শিক্ষা করেন (British Statesmen in India, pp. 28-29)।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দ ইংরেজদের অনুকূল। কার্‌নাক শাহ-আলমকে পরাভূত করলেন, কুট ফরাসীদের পণ্ডিচেরিতে হারিয়ে দিলেন, আহমদ শা আবদালী পানিপথে মারাঠাদের ধ্বংস করলেন। হেস্টিংস এবছর মোট ৯৫০ পাউণ্ড লণ্ডনের ব্যাঙ্কে লগ্নি করতে পাঠালেন।

মীরকাশিম নবাবি করার উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু দেশী-বিদেশী মহলে কেউ কার্যক্ষম নবাব চাননি। শক্ত নবাব তাঁদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাবেন, এ-সন্দেহ তাঁদের ছিল। মীরকাশিম ব্যবসায়ের দুর্নীতি দৃঢ়হস্তে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে করলেন শত্রুবৃদ্ধি। কুট, কার্‌নাক ও হলওয়েল ধারণা করলেন যে মীরকাশিম স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে চান। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন যে মীরকাশিম যুদ্ধসাজে

প্রস্তুত হচ্ছেন। তার কারণ ছিল। মীরকাশিম আর্মেনীয় যুদ্ধব্যবসায়ী গ্রেগরির অধীনে তাঁর সৈন্যদলকে ইওরোপীয় প্রথায় যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এই গ্রেগরিই গুরগিন খাঁ। অন্যান্য ইওরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ নবাব মীরকাশিমের সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার পেলেন। সবদিক থেকেই নবাব মীরকাশিম দেশশাসনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

বাদ সাধল ইংরেজ কোম্পানি। বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকারের অজুহাতে কেবল বিদেশী নয়, দেশী ব্যবসায়ীরাও নবাবের শুল্ক ও দস্তুক ফাঁকি দিতে শুরু করল। হেস্টিংস গভর্নরকে লিখে পাঠালেন: 'যে-সব লোক মাথায় টুপি পরে তারা কলিকাতার আওতা ছাড়িয়ে আসামাত্র স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করা শুরু করে।' আরো লিখলেন: 'আমি যদি নবাবের স্থলাভিষিক্ত হতাম, তাহলে আমার প্রজাদের রক্ষার জন্য নবাব যা-যা করেছেন তাই করতাম।' ৮৬ নবাব মীরকাশিম ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে শুল্ক আদায় না করতে পেরে সর্বপ্রকার শুল্ক আদায় তুলে দিলেন; তার ফলে ইংরেজদের অধিকার ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের অধিকার এক হয়ে গেল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস বাদে কলিকাতা কাউন্সিলের অন্য সকলে প্রচণ্ড রেগে নবাবের অপসারণ দাবি করলেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে আপোষ করার জন্য হেস্টিংসকে নবাবের কাছে পাঠান হল। কিন্তু হেস্টিংসের দৌত্যের কোন ফল হল না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে লিখেছেন, 'নবাবের মতো এমন শান্ত ও ভদ্রলোক আমি কখন দেখি নাই। শান্তি, যুক্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁর যতখানি ইচ্ছা, ততখানি ইচ্ছা যদি আমাদের থাকত তাহলে কখনই মতদ্বৈধের কোন কারণ ঘটত না। নবাবের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করেছি তাতে কেঁচোর থেকে একটু বেশি ব্যক্তিত্বপূর্ণ হলেই ক্ষেপে ওঠার কথা।' ৮৭ কাশিমবাজারে ফিরে এসে গভর্নরকে লিখলেন, 'যাওয়া আসার পথে এমন একখানিও নৌকা দেখলাম না যাতে আমাদের পতাকা উড়ছে না। আমাদের সিপাহিরা স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে যে গ্রাম ও দোকানপাট পরিত্যক্ত হয়। আমাদের আমদানিকারক ও ভৃত্যরা ইংরেজ জাতির কলঙ্ক।' ৮৮ কিন্তু হেস্টিংস বা ভ্যান্সিটার্ট কোম্পানির কর্মচারীদের সংযত করতে পারলেন না। লুব্ধ জানোয়ারের মতো তারা দলে দলে এসে বাংলার ঐশ্বর্য লুঠ করতে লাগল। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে কোম্পানির কাছে হেস্টিংস পদত্যাগপত্র দাখিল করে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই স্বদেশযাত্রা করলেন। এদিকে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে নবাব মীরকাশিম কাশিমবাজার কুঠি দখল করলেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মনোমালিন্য চরম হয়ে উঠল। পাটনা থেকে ফেরার পথে আমিয়েট সাহেব কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্তীস্থলে নদীর পারে নবাবের প্ররোচনায় সদলে নিহত হলেন।৮৯ ইংরেজ ও অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকবার জন্য নবাব মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। নবাবের রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত হওয়া ইংরেজ সুনজরে দেখল না। মুর্শিদাবাদে মীরজাফরকে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে

আবার নবাবির গদি দেওয়া হল। মীরকাশিমের সৈন্যদলকে তুটি যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঙ্গের দখল করল। মীরকাশিম জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাবার সময় বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যান। মুঙ্গেরের পরাজয়ের পর জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তারপর পাটনা অধিকার করে মীরকাশিম এলিস,।হে ও লুসিঙ্গটন সহ ৫০ জনকে নিহত করলেন। ইংরেজ-ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই প্রথমে কাটোয়ার যুদ্ধে, তারপর গিরিয়া ও শেষে উদয়নালার যুদ্ধেও মীরকাশিম পরাজিত হলেন। গুরগিন খাঁ বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত হলেন। অযোধ্যার নবাবের সহায়তায় মীরকাশিম বক্সারে শেষবার ইংরেজশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাভূত হলেন। অযোধ্যা শহর ইংরেজরা ধ্বংস করল। মীরকাশিম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা হলেন পলাতক। মীরকাশিম সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুন দিল্লীতে মারা যান। শেষজীবন তাঁর অত্যন্ত তুরবস্থার মধ্যে কেটেছিল।

মীরকাশিম ও সিরাজের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। মীরকাশিমের কিছু না থাকা সত্ত্বেও বারবার যুদ্ধ করে ইংরেজের শক্তিপরীক্ষা করেছেন। সিরাজের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও বিলাসব্যসনে লিপ্ত থেকে তিনি সব কিছু নষ্ট করেছেন, যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। মীরকাশিমের পরাজয় গৌরবমণ্ডিত ; সিরাজের পরাজয় লজ্জার। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই লিখেছেন যে, 'সিরাজদৌল্লার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।' [৯০]

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ আবার ফিরে এলেন। নবাব মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তিমূলে বাংলা-বিহারে সমুদয় রাজস্ব কোম্পানির আয়ত্তে এল। কোম্পানি পেলেন বাংলা-বিহার রক্ষার অধিকার। বাংলার নবাব কেবলমাত্র বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা মাসহারা নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন। মন্ত্রিমণ্ডলী ইংরেজদের নির্বাচিত হবেন স্থির হল। ক্লাইভ এবার আর অপেক্ষা করলেন না। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ-আলম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানিকে অর্পণ করলেন। এই দেওয়ানি কোম্পানিকে দেশের শাসক করল, বাংলার নবাবের একমাত্র অধিকার থাকল শুধু নবাব নাজিম নাম আর নিয়মিত মাসহারা। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বালক-পুত্র নাজম-উদ দৌল্লা নবাব ঘোষিত হলেন। তাঁর বাৎসরিক প্রাপ্য হল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে সেটাকে করা হল ৩২ লক্ষ টাকা। ইংরেজদের হাতে স্বাধীন বাংলা সুবা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধা পড়ল।[৯১] দেওয়ানি পাওয়া ছাড়া কোম্পানি পেল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব এবং কলিকাতার জমিদারি। লর্ড ক্লাইভ হলেন ২৪ পরগনার জায়গিরদার। ইংরেজ কোম্পানির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তাঁরা একদিকে ফরাসীদের ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করলেন, অন্যদিকে ইংরেজ ব্যবসাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করলেন। ভেলভেটের দস্তানার তলে কোম্পানির লৌহমুষ্টি বাংলা-বিহারের কণ্ঠরোধ করল।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হবার আগেই কান্তবাবু বেশ গুছিয়ে বসেছেন। ১৭৬০

খ্রীস্টাব্দের আগে থেকেই তিনি হেস্টিংসের 'বেনিয়ান'-রূপে কাজ করেছেন।[৯২] হেস্টিংস চলে যাবার পর ১৭৬১ থেকে ১৭৬৯ সাইকস্ সাহেবের দেওয়ান ও বেনিয়ান নিযুক্ত হন। তাঁর ভাই নৃসিংহ নন্দী ও ভাইপো বৈষ্ণবচরণ ওরফে বোষ্টমচাঁদ নন্দী বেসরকারি সিল্কের ব্যবসার সহযোগিতা করে কাশিমবাজারের গণ্যমান্য ব্যবসায়ী হয়েছেন।[৯৩] কান্তবাবু ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দেই সাতটি সম্পত্তি ক্রয় করেন; তার মধ্যে পাঁচটি স্বনামে ও দুটি বেনামে। ১১৬৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন তারিখের দলিলে তাঁকে 'মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তবাবু' নামে আখ্যাত করা হয়েছে। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি তিনটি সম্পত্তি কেনেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে কান্তবাবু নয়টি সম্পত্তি কিনলেন এবং একটি বাদে সবই স্বনামে। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে ২ নম্বর তৌজির অংশবিশেষ কুলবেড়িয়া পরগনা কিনে জমিদারি পত্তন করেন বলা চলতে পারে। ১১৬৬ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন এই সম্পত্তি তাঁর হয়। পরের মাসে অর্থাৎ ১১৬৬ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র ২ নম্বর তৌজির অপর অংশ জোত সর্বজয় খরিদ করেন।[৯৪] ১১৬৬ বঙ্গাব্দ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পক্ষে বিশেষ শুভ। এই বছর ২৭ বৈশাখের এক পাট্টামূলে রানী ভবানীর কাছ থেকে শ্রীপুর প্রভৃতি অনেক মহাল ক্রয় করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের রাজনৈতিক উত্তেজনা কান্তবাবুর সম্পত্তিসংগ্রহে প্রতিফলিত। তিনি এ-বছর মাত্র তিনটি সম্পত্তি ক্রয় করেন—তার মধ্যে দুইটি বেনামা। এমন কি ২ নম্বর তৌজির অপর অংশ পরগনা সমরশালি 'রামসেন' নামে খরিদ করতে হয়। ১২৭২ বঙ্গাব্দে দু আনি পরগণা কিনে তার নাম দেন কান্তনগর এবং সেই সঙ্গে তাঁর লাভ হল 'চৌধুরী' উপাধি। ১৭৬২ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাত্র একটি সম্পত্তি কিনতে দেখা যায় ১৫ চৈত্র ১১৬৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে। নিজগ্রাম শ্রীপুরের সম্পত্তি হলেও বেনামীতেই কান্তবাবু খরিদ করেন।[৯৫]

ইংরেজ কোম্পানির সাহেবরাও ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে বড়লোক হতে থাকলেন। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীনের লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন, 'বাংলাদেশে অর্থ কমে গেছে। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণই যে তার একমাত্র কারণ তাতে সন্দেহ নাই। প্রতি বছর প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। ইংরেজরা বাংলাদেশের সম্পদে নিজের দেশে ধনিকের মতো থাকছে।' বার্ক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় হাউস অফ কমন্সে অভিযোগ করলেন, 'সমুদ্রের তরঙ্গের মতো সাহসী তরুণ ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর দল ক্রমাগত ঐ দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চিরক্ষুধার্ত মাংসাশী পক্ষীর মতো তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত খাচ্ছে আর জীর্ণ করছে। তাদের ক্ষুধার শেষ নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টির হতাশা, মনের বিভ্রম, আচরণের অসহায়তা, কিছুই এই নবযুগের পশুদের নিবারণ করতে পারছে না।[৯৬] বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড হাতে পেয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। তাদের লোভ আকাশচুম্বী হয়েছিল তাও সত্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং শাদা চামড়ার উত্তমর্ণবোধ তাদের অর্থগৃধ্নু করে তুলেছিল। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দেও ইংরেজ রাজত্ব করতে চায়নি, অর্থ নিয়ে দেশে ফিরতেই চেয়েছিল। রাজ্যশাসনের দায়িত্ব সম্পর্কে তাই অবহিত হওয়ামাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীদের চরিত্রে ও কাজে অদ্ভুত পরিবর্তন

দেখা যায়। যেদিন ইংরেজ কোম্পানি বুঝতে পারল যে শাসনের গুরুদায়িত্ব তাদের, সেদিন থেকেই তাদের মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ব্যাটসন সাহেব কাশিমবাজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হলেন। হেস্টিংস গেলেন কলিকাতায়। চেম্বার্সকে ব্যাটসনের সহকারী নিযুক্ত করা হল। প্রধানের মাহিনা ধার্য করা হল বাৎসরিক ৫০১৬০ টাকা! এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মোট ৪ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশের ব্যবসায়ে লগ্নি করেন। তার মধ্যে ৯০০০০ পাউণ্ড বা ৯ লক্ষ টাকা কাশিমবাজারের ব্যবসার জন্য দেওয়া হল।[৯৭] উইলিয়াম বোল্টসকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই 'সব থেকে দুরাত্মা ইংরেজ' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থ বা স্বর্ণ উপার্জনের জন্য তিনি সবকিছু করেছেন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, জোচ্চুরি, উৎকোচ বা অত্যাচার সবদিকেই তিনি সমান পটুত্ব দেখিয়েছেন। বোল্টস ১৭৬০ থেকে ১৭৬৮ পর্যন্ত এদেশে ছিলেন এবং কিছু সময় কলিকাতা কাউন্সিলকেও অলঙ্কৃত করেন। তাঁকে জোর করে জাহাজে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তিনি কেবল রোকড় টাকাতেই ৯ লক্ষ টাকার বেশি নিয়ে যান। বোল্টসের অর্থোপার্জনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার।[৯৮]

রেশম ও তাঁতের কাপড়ের শিল্প এইসময়ে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করে। ইওরোপের সিল্কের চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীর কাছে যেন সোনার খনির দরজা খুলে দিল। রেশমশিল্পের কেন্দ্রভূমি হিসাবে কাশিমবাজারের সুনাম ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে গেল। এই সময় থেকে মহাজনটুলিতে যে গুজরাটি ব্যবসায়ীদের দেখা যায়, তাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নাই; কেবলমাত্র মুনাফার গন্ধে তারা সুদূর গুজরাট থেকে এসে কাশিমবাজারে বাসা বেঁধেছিল।

নিম্ন-বাংলায় বন্দর কাশিমবাজার রেশম, রেশমী সুতা ও রেশমী দ্রব্য রপ্তানি করে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে কেবল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারই কাশিমবাজারকে 'বন্দরের রানী' আখ্যায় ভূষিত করেছিল। আজ একথা অনস্বীকার্য যে কাশিমবাজার বন্দরের উন্নতির একমাত্র কারণ ইওরোপে রেশমের চাহিদাবৃদ্ধি এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে প্রধানত বিদেশী কোম্পানিগুলির প্রচেষ্টা। বিদেশে রেশমের চাহিদা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজারের পতন শুরু। রেশমের ব্যবসা বন্ধ হওয়ামাত্র বন্দর কাশিমবাজারের বিলুপ্তি। নিঃসন্দেহে তাই বলা যায়, রেশমের ব্যবসার সঙ্গে কাশিমবাজারের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাই দেখি ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির সঙ্গে দিনেমার ও আর্মেনিয়ান বণিকগণও রেশমের ব্যবসায়ে জড়িত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লিখে পাঠালেন যে কাঁচা রেশমের রপ্তানিবৃদ্ধির উপরই তাদের আয়বৃদ্ধি নির্ভর করছে।[৯৯] পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আবার লিখলেন যে তৈরী রেশম বেশি রপ্তানি না করে ইংরেজরা যেন কাঁচা রেশম 'winding' করে পাঠাবার দিকে বেশি মনোযোগী হন। স্পষ্ট ভাষাতেই বিলেতের কর্তৃপক্ষরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করলেন। তাঁরা লিখলেন, 'কাশিমবাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সিল্কের ব্যবসা তুলে নেবার জন্য প্রয়োজন হলে অনেক বেশি দামে যেন কাঁচা রেশম ক্রয় করা হয়।

সর্দাররা যাতে কাঁচা রেশম থেকে কোন পাকা রেশম তাদের বাড়িতে তৈরী করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজন হলে সরকারী আদেশ জারি করতে হবে। যারা এই আদেশ অমান্য করবে তাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে।' [১০০] কাঁচা রেশমের চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হরণ করেছিল। সেপাই পাঠিয়ে সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের দরজা ভেঙ্গে কাঁচা রেশম লুঠ করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁচা রেশমকে চরকায় কেটে সিল্কের সুতো বার করত 'নাখদ'রা। দলকে দল 'নাখদ'দের ধরে এনে ইংরেজ ফ্যাক্টরিতে বন্দী করে রাখা হত। এই সব সিল্কের তাঁতিরা যাতে সুতোর প্রজনন করতে না পারে তাই দলে দলে তাদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলা হল। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রেশম ছিল কেবলমাত্র লাভের একটি পণ্য, কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে রেশমের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল ইংরেজদের এক বিরাট জাতীয় পরিকল্পনা। [১০১] রেশম রপ্তানিকে চরম স্বাদেশিকতা ও দেশ-প্রেমের প্রকাশ বলে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ গণ্য করতে লাগলেন। তার কারণ বাংলাদেশের চরকায় যে সিল্কের সুতো তৈরী তা কমজোরি হত, তার ফলে বুননের সময় প্রায়ই কেটে যেত। বিশেষ ইংল্যাণ্ডের তাঁতযন্ত্রের টান চরকায় কাটা সুতো সহ্য করতে পারত না। উপরন্তু দেশী সিল্কের সুতোয় গিঁঠ থাকত, তাতে দেশী তাঁতের কোন অসুবিধা হত না, কিন্তু বিদেশের যন্ত্রে লাগানমাত্র গিঁঠে গিঁঠে ছিঁড়ে যেত। কাঁচা রেশম রপ্তানি করে যন্ত্রের সাহায্যে যে সুতো তৈরী, তা শক্ত টেকসই ও জেল্লাদার হত। কাজেই যেনতেন-প্রকারেণ কাঁচা রেশম ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করতে পারলে লাভের অঙ্কটা বড় হয়। ইওরোপের বাজারে চীনা ও ইতালীয় রেশমের তুলনায় বাংলার রেশম সস্তা ও উৎকৃষ্ট গণ্য হওয়ায় বাংলার সিল্কের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ কোম্পানি রেশমে টাকা লগ্নি করা বৃদ্ধি করলেন, বেসরকারী ব্যবসাতেও কোম্পানির কর্মচারী আর তাদের অনুগতরা এই রেশমী ক্ষুধার সুযোগ নিলেন। ক্রমাগত হাত বদলাবার ফলে কাঁচা রেশমের দাম বৃদ্ধি হতে থাকল। তারপর ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) সিল্কের গুটিপোকার চাষীরা যখন দলে দলে মারা গেল এবং দেশ থেকে পালিয়ে গেল, তখন কাঁচা রেশমের দাম আরো বৃদ্ধি পেল। পাইকার এবং খুচরা দালালরাও লাভের লোভে চড়া সুদে টাকা দাদন দিতেন। তার ফলে গুটিপোকার চাষী এবং রেশমের তাঁতীরা পাইকারদের খপ্পরে পড়ে গেল। কাঁচা রেশমের খুচরা এবং পাইকারী বাজার হিসেবে কাশিমবাজার প্রসিদ্ধি লাভ করল। [১০২] কাঁচা রেশমের দামবৃদ্ধির আর এক কারণ বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যেকার রেষারেষি। গুটিপোকার চাষী আর রেশমের তাঁতীদের নিয়ে এমন গোলমাল শুরু হল যে ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানি চাষী ও তাঁতীদের ভাগাভাগি করে নেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শক্তি স্ফীতোদর ইংরেজ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী কোম্পানি প্রায় বিলুপ্ত, ওলন্দাজ ব্যবসাও স্তিমিত, তাই চন্দননগরের ফরাসী 'শিভেলিয়ার' ফরাসী ও ওলন্দাজ সিল্কের সামগ্রী যখন কলকাতার ইংরেজদের আড়ঙ্গে রাখার প্রস্তাব করলেন তাও নাকচ করা হল। [১০৩] ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে তাই দেখা যায় যে ইংরেজরাই

বাংলাদেশের একমাত্র ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত ব্যবসা ক্রমে ইংরেজ রাজপুরুষদের একচেটিয়া অধিকার বলে গণ্য হতে থাকল। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের 'ক্যালিকো' বা সুতি কাপড় ইওরোপের বাজারে ছিল সর্বাগ্রগণ্য। এই সুতি তাঁতের কাপড়ের অধিকাংশ তৈরী হত কাশিমবাজারে। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সভাতেও ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশের সিল্কের জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এইসময়ে সিল্কের কাপড়ের ওপর রঙ্গিন ছাপ দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কাশিমবাজারের অনতিদূরে বালুচর থেকে এই ব্যবস্থা সম্ভবত শুরু হওয়ায় ছাপা রেশমের জিনিস 'বালুচরী' নামে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। ফরাসী সাম্রাজ্যে এই 'বালুচরী' সহজেই আদৃত হয়। ইংরেজ বণিকগণ বালুচরীর রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এবং ইংল্যাণ্ডে বালুচরী ঢঙে সিল্কের ও সুতির থান ছাপাবার ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে বেশির ভাগ ছাপা জিনিসই বিদেশে তৈরী হয়েছে। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির মাথায় আর এক নূতন বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল। তাঁরা কাঁচা রেশম থেকে মসলিন তৈরী করে ভারতবর্ষেই বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের তাঁতযন্ত্র সস্তায় মসলিন তৈরী করতে লাগল, তার ফলে দেশী মসলিনের থেকে শতকরা ২০ টাকা কমে বিলিতী মসলিনের বিক্রি সম্ভব হল। রেশমের ব্যবসায় ইংরেজদের একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপিত হল। কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠি বন্ধ হবার উপক্রম হওয়ামাত্র তাঁতীরা ইংরেজ কুঠিতে আশ্রয় নিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ বণিক কোম্পানির মুষ্টিবদ্ধ হয়ে পড়ল।[১০৪]

বাংলাদেশে ব্যবসার প্রথম যুগে বিদেশী কোম্পানিদের মধ্যে ওলন্দাজরাই ছিলেন প্রধান। পলাশির যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। অর্থ লগ্নি করায় বা মোট ব্যবসার হিসাবেও ওলন্দাজদের কীর্তি যথেষ্ট বৃহৎ ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন উদাসীন। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের মনোমালিন্যের সময় যেমন, তেমনি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের শক্তিপরীক্ষার সময়েও তাঁরা নীরব নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেছেন। এই নিরপেক্ষতাই ওলন্দাজ বণিকদের সর্বনাশের কারণ হল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে নবনিযুক্ত নবাব মীরজাফর যখন 'নজরানা'র দাবি তুললেন তখন বুঝতে কষ্ট হয় নাই যে ইংরেজের প্ররোচনা পেছনে আছে। কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির প্রধান ও নবাব দরবারে ওলন্দাজ প্রতিনিধি ভেরনেটের প্রস্তাবক্রমে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্নর বিসডম বাটাভিয়া থেকে সৈন্য আনা স্থির করলেন। নবাবের আড়ালে ইংরেজ শক্তি তাঁদের ব্যবসা বিপন্ন করে তুলছে বুঝতে পারলেও ইংরেজরা যে নবাবকেও চালনা করছে তা ওলন্দাজ বণিকরা তখনও বুঝতে পারেননি। সবদিক থেকেই ওলন্দাজ ব্যবসায়ে বাধাসৃষ্টি করা হল। তাঁতীদের চুরি করা কিংবা ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গোমস্তাদের হয়রানি করা, ওলন্দাজ জাহাজ থেকে ব্যক্তি, সম্পত্তি ও নাবিক অপহরণ, এমন কি ওলন্দাজ মানীব্যক্তিদের গায়েব করে দেওয়ার অভিযোগ ওলন্দাজরা বারবার নবাবের কাছে করেছেন। অবশেষে ক্লাইভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজ শক্তি ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণ পরাভূত হল বটে, কিন্তু ওলন্দাজ বাণিজ্য বন্ধ হল না। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

২৮৫৭৯ মন সোরা প্রতি বছর তাঁদের রপ্তানি করতে দেখা যায়। বিহারের সোরা তৈরীর অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা প্রতি বছর নিয়মিত ২৩০০০ মন সোরা রপ্তানির জন্য পেতেন। আফিম, সিল্ক, কাটাকাপড় ও রেশমের তৈরী জিনিসের ব্যবসায়ও অল্প পরিমাণে চলতে থাকে।[১০৫] ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অফ ট্রেড জানালেন, 'এ-বছর ওলন্দাজরা বাংলাদেশে কোন অর্থ লগ্নি করেনি।'[১০৬]

শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্নর ওল বাই ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকার ইংরেজ কুঠির প্রধান বেব সাহেব জানান যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে সুতি ও সিল্কের কাটা কাপড় বেআইনীভাবে দিনেমার-জাহাজে ইওরোপে যায়। ইওরোপে এই বেআইনী ব্যবসার প্রধানকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কোপেনহাগেন, লিসবন, অস্টেণ্ড প্রভৃতি শহরগুলি।[১০৭]

১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ কাশিমবাজারের অর্থনীতির অত্যন্ত সুসময়। ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসার কেন্দ্র হল কাশিমবাজার। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে দেশী বণিকেরাও রপ্তানি ও দালালিতে মেতে উঠলেন। হরিনারায়ণপুরের মানিক কুণ্ডু আর কান্তবাবুর ভাইপো কাশিমবাজারের বোষ্টমচাঁদ নন্দী গুজরাটি বণিকদের কাঁচা রেশম সরবরাহ করতেন।[১০৮] কান্তবাবু স্বয়ং তাঁর পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে ১৭৭৩ থেকে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত ইংরেজ কোম্পানিকে রেশম ও সুতির কাটা কাপড় সরবরাহ করেছেন। কান্তবাবুর ভাই নৃসিংহ নন্দী জে. ইরউইনের জামিন হয়ে কোম্পানিকে কাটা কাপড় বিক্রি করতেন। কাঁচা রেশমও তাঁরা মাঝেমাঝে ইংরেজ কোম্পানিকে বিক্রি করেন।[১০৯]

আর্মেনীয় বণিকরা প্রতি বছর কাশিমবাজার থেকে ১০০ মন সিল্ক সুরাটে ও ১০০০ মন সিল্ক মির্জাপুর, নাগপুর, ছত্তরপুর, বেনারস ও অন্যান্য জায়গায় নিয়মিত পাঠাতেন।[১১০] আর্মেনীয় বণিকগণ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার ফরমান লাভ করেন এবং তদনুযায়ী কাশিমবাজারের সংলগ্ন সৈদাবাদে বসতিস্থাপন করেন। খেতো খাঁর বাজারে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে তৈরী করা গির্জা আজ আর্মেনীয়দের বসবাসের একমাত্র নিদর্শন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আর্মেনীয় বণিকরা অভিযোগ করেন যে তাঁদের নিযুক্ত রেশমের তাঁতীদের ইংরেজ কোম্পানি বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে। আরো অভিযোগ করা হয় যে ইংরেজ বণিকগণ জোর করে রপ্তানির জন্য রাখা কাঁচা রেশম ও সুতি-কাটা কাপড় অপহরণ করে নিজেদের রপ্তানিগুদামজাত করেছে। বহিঃসমুদ্রেও ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা আর্মেনীয় জাহাজ দখল করে আর্মেনীয় রপ্তানিদ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করত।[১১১] কর্নেল জেমস রেনেল এই সময়ে লিখেছেন যে 'কাশিমবাজারে প্রস্তুত রেশমে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বহু জায়গা ছেয়ে গিয়েছিল। ৩০০০০০ থেকে ৪০০০০০ পাউণ্ড (ওজনে) কাঁচা রেশম ইওরোপের বিভিন্ন যান্ত্রিক তাঁতেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হত।[১১২]

কাশিমবাজারের রেশম ও সুতার কাটা কাপড়ের ব্যবসা সম্পর্কে সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দি অত্যন্ত মূল্যবান। সদানন্দের এই বিবৃতি ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কুমারখালির

রেসিডেন্টের কাছে দেওয়া। রেসিডেন্ট কলিকাতার বোর্ড অফ ট্রেড-এর কাছে সদানন্দের বক্তব্য পাঠিয়ে দেন। জবানবন্দি থেকে আমরা জানতে পারি যে সদানন্দ কাশিমবাজারের গুজরাটী ব্যবসায়ী গিরিধারীদাসের গোমস্তা এবং সিল্কের ব্যবসায়ে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি বলেছেন যে ১৭৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দে ১০০০ মন কাঁচা রেশম কাশিমবাজার থেকে কলিকাতায় যায় এবং সেখান থেকে সুরাটে পাঠান হয়। পরবৎসর সিল্কের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে মাত্র ৫০০ মন রেশম পাঠান সম্ভব হয়। সুরাটের জন্যে সিল্ক সংগ্রহ করা হত প্রধানত শেরপুর, গোরাঘাটা (ঘোড়াঘাট ?), বাউলিয়া, কুমারখালি ও রাধানগর থেকে। গুজরাটি ব্যবসায়ীরা রাধানগরের রেশম ও কাশিমবাজারের তানা বা টানা পছন্দ করতেন। এই দুই রকমের রেশম সংগ্রহ করতে পারলে অন্য কোথাও তাঁরা রেশমের খোঁজ করতেন না। ৭ জন গুজরাটি ব্যবসায়ী তখন কাশিমবাজারে ছিলেন। তাঁরা হলেন নীলমণিদাস, গিরিধারীদাস, গোবিন্দদাস, নাগিন (নগেন ?) দাস, গোলাপচাঁদ, তুলসীদাস ও যোগজীবনদাস। রেশমের ব্যবসা করার সঙ্গে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা করতেন। এই তুলা থেকেই বাংলাদেশের সুতি কাপড় তৈরী হত। গুজরাটি ব্যবসায়ীরা অনেক সময় রেশমের বিনিময়ে তুলা সংগ্রহ করতেন। এই তুলা সাধারণত সুরাট এবং মিরাট থেকে সংগৃহীত হত। বাংলাদেশের কার্পাস থেকে দেশী তুলা শান্তিপুর ও তার আশেপাশে নদীয়াতে এবং মৈমনসিং জেলাতে উৎপন্ন হত। কাশিমবাজারের গুজরাটি ব্যবসায়ীগণ প্রতি বছর মির্জাপুর ও বেনারসে দুশো থেকে তিনশো মন সিল্কের থান পাঠাতেন। সম্ভবত মির্জাপুর থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামাকাপড়ে রূপান্তরিত হত। কাশিমবাজারের রেশম থেকেই নাগপুরে, ছত্তরপুরে (মধ্যপ্রদেশে) এবং পুনায় কিংখাপ ও গুলবাহার বা ব্রোকেড তৈরী করা হত। সাটিনের ও অন্যান্য নানা রকমে রেশমের রূপান্তর লক্ষণীয়। মির্জাপুরে কাঁচা রেশম বিক্রির জন্য পাঠান হত। মির্জাপুর থেকে কাঁচা রেশম মুলতান ও লাহোরে যেত। কাশিমবাজার থেকে যত রেশম রপ্তানি করা হত, তার মধ্যে ৭ আনা সমুদ্রপথে যেত সুরাটে, ৪ আনা করে যেত নাগপুর ও মির্জাপুরে, আর এক আনা যেত বেনারসে।[১১৩] সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রেশমশিল্প তখন অবনতির পথে। রেশমের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় নিম্নমানের রেশম সুতার ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে। যার ফলে খাঁটি রেশমের উৎকর্ষ নষ্ট হয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহুলোকের মৃত্যু হওয়াতে রেশমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সদানন্দ বলেন যে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজারের সর্বসমেত দশজন গুজরাটী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে সমুদ্রপথে কমবেশি ৬০ গাঁইট করে কাঁচা রেশম প্রতি বছর বোম্বাই ও সুরাটে পাঠাতেন। প্রতি গাঁইটের ওজন ছিল ২৫ মন। প্রতি গাঁইটের এই সময়কার দাম দশ হাজার টাকার থেকে কিছু বেশি। প্রায় বিশ হাজার মন সিল্ক প্রতিবছর রপ্তানি হয়েছে।[১১৪]

সুরাটের ইংরেজ ফ্যাক্টরিতে বাংলাদেশের সিল্ক আমদানির যে হিসাব লিপিবদ্ধ আছে তা প্রণিধানযোগ্য। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের রেশম সমস্তই কাশিমবাজার থেকে রপ্তানি

হত। রেশমের ব্যবসায়ে বোম্বাই ও সুরাট অত্যন্ত লাভবান হয়। ব্যবসায়ী লাভ ছাড়াও টাকার বিভিন্ন মূল্য এই মুনাফার মুল কারণ ছিল। ১০০ মিশ্রিত সিক্কা টাকার বিনিময়ে বোম্বাই ও সুরাটের ১১৬ টাকা পাওয়া যেত।[১১৫] তার ওপর রেশমের সুতা বা কাপড় খুব অল্প জায়গা নিত। ফলে রপ্তানির খরচও অত্যন্ত কম ছিল। নিম্নে সুরাটের কুঠির হিসাব দেওয়া যায়।[১১৬]

বছর	গাঁইট	মূল্য টাকা	বছর	গাঁইট	মূল্য টাকা
১৭৬৫	১২৫	২৫৭৬৫০৲	১৭৭৭	৫৩	৫৫৩৬৮৲
১৭৬৬	৬	৭৬৬৪০৲	১৭৭৮	২০	২৭৭৬১৲
১৭৬৭	৭০	১২৪৭১২৲	১৭৭৯	৯	৫৪৫৲
১৭৬৮	১৫৬	১৬৬২৩৭৲	১৭৮০	২৬	৩১০০০৲
১৭৬৯	২০৪	২১০১৭৭৲	১৭৮১	৯	৯৫৩৭৲
১৭৭০	১৭৬	২৫৩৭০০৲	১৭৮২	২৬ ও ২৮	৩৫৫৮৬৲ ও
১৭৭১	২৮	৪২৭৩৫৲			৩৭২৯৫৲
১৭৭২	১০৫ (?)	৬৩.৬১৲	১৭৮৩	৭৭	৯২৮০৬৲
১৭৭৩	২৭	৩৪১৬০৲	১৭৮৪	২৪	৫২৭৭০৲
১৭৭৪	২৯	১৬৭৯৯৲ (?)	১৭৮৫	২১ ও ২৭	১৭৪৬৬৲ ও
১৭৭৫	৫০	২৭৪৯২৲			২০৫৭৫৲
১৭৭৬	৮৬	৬২২০৩৲	১৭৮৬	৫ ও ১	৬৬৯৮৲ ও
					২২৩৩৲

ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিল্কের সুতো তৈরী করার পুরাতন উপায়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সেই জন্য কাঁচা রেশম রপ্তানি করায় আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সিল্কের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জন্য ইংরেজরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কুমারখালিকে ঘাঁটি করে পলু বা রেশমী গুটিপোকা সোজাসুজি চাষীদের কাছ থেকে কেনার ব্যবস্থা করেছে।[১১৭] তুঁত বা মালবেরি গাছ লাগাবার জন্য চাষীদের টাকা সাহায্য করেছে এবং 'ফিলেট্যুর'-প্রথা মাধ্যমে টাফেটা থান তৈরী করে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করেছে।[১১৮] উত্তম রেশম তৈরী করার জন্য ইংরেজ কোম্পানি একদল ইটালীয় কারিগরকে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দেই কুমারখালিতে এনে রেখেছিল।[১১৯] রেশমের উৎকর্ষের জন্য ইটালীয় কারিগরদের নিয়োগ সিল্ক ব্যবসা সম্পর্কে ইংরাজদের ঔৎসুক্য প্রমাণ করে। এই সময়ে চীন থেকে রেশম কীট বা পলুর ডিম আনার ব্যবস্থা হয়েছিল।[১২০]

ইংরেজরা 'রিলিং' ব্যবস্থা প্রচলন করে। বাঙালী তাঁতীরা নতুন প্রক্রিয়াতে রেশমী সুতা তৈরীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পারদর্শী হয়ে উঠল। পিতলের দাঁতযুক্ত রিলিং চক্র ইংল্যাণ্ড থেকে সরবরাহ করা হত। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে সিল্কের উৎপাদনে উন্নতির জন্য এই রকম ৫০০ চক্র আসতে দেখা যায়।[১২১] ইংরেজদের অধীনে কুমারখালি, রাধানগর, বোয়ালিয়া,

জঙ্গিপুর, রংপুর ও কাশিমবাজারে প্রধানত সিল্ক তৈরী করা হত। প্রত্যেক জায়গায় একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত ছিলেন। এই সমুদয় সিল্ক কাশিমবাজারের 'রপ্তানিদ্রব্যগৃহে' (Export Ware House) জমায়েত করা হত। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ১৯৯৫১২৪ টাকা দামের সিল্কের রপ্তানি মাংগী কাস্টমস্ হাউসে লিপিবদ্ধ আছে।[১২২]

রেশমের পরেই কাশিমবাজারে তাঁতের কাপড় তৈরী বিখ্যাত হয়েছে। তাঁতশিল্প কাশিমবাজারের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। বস্তুত তাঁতশিল্প অত উন্নত থাকার জন্যেই রেশম-শিল্পকে গ্রহণ করা সহজ হয়েছে। রেশমশিল্পের শ্রেষ্ঠ সময়ে সুরাট ও বোম্বাই থেকে তুলা-আমদানি তাঁতের কাপড় তৈরী করায় সাহায্য করেছে। রেশমশিল্প যেমন তাঁতশিল্পের উৎকর্ষের জন্য এসেছে, তেমনি রেশমশিল্পের উন্নতি তাঁতশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। সুতির কাটা কাপড়ের ব্যবসা কাশিমবাজারে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে দুশো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি ৯১০২২ টাকা কেবল সুতি কাপড়ে লগ্নি করেছে। কুমারখালি ও বরানগর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৫৬৬৯০৮ টাকা লগ্নি করা হয়।[১২৩] নানারকম সুতি কাপড়ের নাম পাওয়া যায়, যেমন—মলমল, তাঞ্জিব, আবরোঁ, আলাবলি, নয়নসুক, সরবতী, তেরিনদাম, সরকার আলি, জামদানী, হামাম, শীরবন্ধ, ডুরা ও বাদানখাস। সূক্ষ্ম কাপড় 'খাসা' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল বাফটা, সাহুস, গড়া। অমৃতি নামে একশ্রেণীর কাপড় তৈরী হত। সুতি মোটা থান—যার ওপর ছাপা হত, ইংরেজদের কাছে 'সিণ্টজ' (Chintz) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতি কাপড় তৈরীর প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, মালদা, লক্ষ্মীপুর ও ক্ষীরপুর।[১২৪] এই সমুদায় কাপড় বন্দর কাশিমবাজার হয়ে প্রথমে কলিকাতা এবং পরে বিদেশ যাত্রা করত। বাংলাদেশের তাঁতীরা জানত না যে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কল সুতি কাপড় তৈরী করে সস্তায় এদেশের বাজারে ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তৈরী কাপড় আমদানি না করে ইংরেজ, ভারতীয় তুলা আমদানি শুরু করল। একদিকে তুলার দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে সস্তা বিলিতি কাপড় বাংলার তন্তুশিল্পকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তাঁতীদের এক বৃহৎ অংশ চাষীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার তাঁতের গৌরব পরিণত হয়েছে রূপকথায়। মহাত্মা গান্ধী যখন চরকাকে তাঁর রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রতীক করলেন তখন তার পেছনে যে কি বিরাট অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই যে তার একমাত্র কারণ তা আজ বিনাদ্বিধায় বলা চলে। সুতি কাপড় বা তুলা হতে উৎপন্ন কাপড়ের ইংল্যাণ্ড হতে আমদানিতে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংল্যাণ্ড হতে এদেশে আসে। প্রতি বৎসর বস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হয় ১৪ লক্ষ ও ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ১৬ লক্ষ টাকা। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ৪২ লক্ষ টাকা, ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ৭০ লক্ষ টাকা, ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ৪৬ লক্ষ টাকা, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে ৮৫ লক্ষ টাকা এবং ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় আমদানি হয়।[১২৫]

সোরার ব্যবসা কাশিমবাজারের অর্থনীতির উন্নতির আর এক কারণ। সোরা কখনই কাশিমবাজারে তৈরী হত না; পাটনা ও তার নিকটস্থ অঞ্চল থেকে আসত। কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীরা সোরা রপ্তানি করে প্রচুর লাভ করতেন। ফ্রান্সিস সাইকস্ (পরে স্যার) ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান ও পরে নবাব-দরবারে রেসিডেণ্ট ছিলেন। দুই বছরে তিনি ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা কেবল সেলামী বাবদ আয় করেন। বারওয়েল ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হন। তিনি তাঁর পিতাকে এক পত্রে জানান যে সোরার সেলামীতে এক পয়সা লগ্নি না করে ৫০০০০ টাকা তাঁর লাভ হয়েছে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার নদী দিয়ে সোরা কলিকাতায় আনার খরচ হত মনপ্রতি সাড়ে তিন আনা, কিন্তু গ্রীষ্মে যখন কাশিমবাজার নদীতে জল কমে যেত এবং জায়গায় জায়গায় শুখিয়ে যেত তখন পদ্মা ও সুন্দরবন দিয়ে কলিকাতায় সোরা আনার খরচ পড়ত মনপ্রতি ছয় আনা।[১২৬] পাটনার ইংরেজ কোম্পানির প্রধানদের প্রায়ই কাশিমবাজারের কুঠিয়ালকে সোরা-জাহাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কাশিমবাজার নদী দিয়ে পার করে দেবার অনুরোধ জানাতে হত।

এইসময় অনেকগুলি নূতন ব্যবসা শুরু হয়। পাটের ব্যবসায়ে কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীরা সহজেই লাভ করতে লাগলেন। হস্তিদন্তশিল্প শুরু হওয়ামাত্র প্রসিদ্ধিলাভ করল। ছোট ছোট শিল্পকর্ম ইওরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হতে শুরু হল। কাঁসার বাসন তৈরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হল। সিল্ক ও সুতি কাপড়ের ওপর রঙ্গিন ছাপার কাজও বিখ্যাত হয়ে উঠল। এই সুসময়ে ধুলামুঠিও সোনামুঠিতে রূপান্তরিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর কাশিমবাজারের সেই সুসময়। চুনাখালিতে প্রস্তুত হাতে-তৈরী কাগজ কলিকাতাতেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হত। কাগজ যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরা বংশপরম্পরায় সেই বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যেতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতি কাগজের দাপটে দেশী কাগজ তৈরী বন্ধ হয়। কাগজ যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরা চাষীতে রূপান্তরিত হলেন। কিছুই তখন বৃথা যেত না। বাতিল হওয়া রেশম দিয়ে তসর, গরদ, মটকা ও ছালের কাপড় তৈরী হতে লাগল। এখনও এই শিল্প বেঁচে রয়েছে।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে টাঁকশাল মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হল বটে, কিন্তু রেশম ব্যবসায়ের মাধ্যমে কাশিমবাজারের উন্নতি অব্যাহত থাকল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবসার জগতে তার প্রাধান্য ছিল আনন্দের। বাংলার তাঁতী ইংরেজী ফ্যাশনে 'ওয়াইনডিং' শিখে নিল। 'রিলিং' শেখার পর তার পারদর্শিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। বিদেশী মতে বাংলার শিল্পী-কারিগরদের মতো রেশমের সৃষ্টি করা আর কারোপক্ষে সম্ভব ছিল না। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গালী তন্তুবায়ের যে বিশেষত্ব ছিল পলাশির পঞ্চাশ বছর পরেও তা যে একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এটা কম শ্লাঘার কথা নয়। যুদ্ধের পূর্বেকার স্বাধীনতা অবশ্য ছিল না। ইংরেজ অধীনে তন্তুশিল্পকে কর্তার ইচ্ছামতো, রপ্তানির তাগিদ অনুসারে চলতে হয়েছে। হাতের ছোঁওয়া আর রেশম বা তুলোর সুতোর মাধ্যমে অপরূপ শিল্পসৃষ্টি ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দেও অব্যাহত ছিল। শুধু ছিল না সেই আকাশের অসীম উদারতা—শিল্প আর শিল্পী হয়ে দাঁড়াল

প্রয়োজনের বেতনভুক, মস্ত মাকড়সার মুনাফার শিকার। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বছরের মধ্যে তন্তুবায়দের অবনতিতে তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সর্বগ্রাসী লোভের বেদীতে বাংলার বয়নশিল্প চিরকালের মতো নিষ্পিষ্ট হল। চসার আর পাইকারদের লোভে সুবিখ্যাত ব্যবসার প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হল। খরচ অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে বাংলার রেশমের দাম ইতালীয় রেশমের থেকে বেশি হয়ে দাঁড়াল। মোটা বা গাড়া সুতোর মিশ্রণে রেশমের উৎকৃষ্টতা নষ্ট হল আর সেই সঙ্গে নষ্ট হল বাংলার খাঁটি রেশমের সুনাম আর তার ইওরোপের বাজার।

ধ্বংসের যে করাল ছায়া রেশমশিল্পের ওপর ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে পড়েছিল সে-সম্বন্ধে তন্তুবায় ও ব্যবসায়ীকুল সকলেই অজ্ঞ ছিলেন। নেপোলিয়ানের উন্নতি সাময়িকভাবে ইংরেজদের রেশম ব্যবসায়ে মন্দা আনল। কিন্তু ইটালিয়ান সিল্কের ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রেশমের চাহিদা বেড়ে গেল। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের পরে তাই রেশমী শিল্পে আবার তেজীভাব দেখা যায়।[১২৭] ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দেই ৮০০০ গাঁইট রেশম পরের বছর রপ্তানি করার জন্য হুকুমনামা আসে।[১২৮] ঐ বছরেই ১ জুন আরো জানান হয় যে, দুই লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা কেবল রেশমশিল্পে লগ্নি করার জন্য এদেশে পাঠান হয়েছে।[১২৯] ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে টাকার পরিমাণকে বাড়িয়ে ৪২ লক্ষ টাকা করা হয়।[১৩০] ইতিমধ্যে কাঁচা রেশম থেকে বিদেশে উৎপন্ন কাপড় ভারতের বাজারে ছেয়ে গেছে, ছেয়ে গেছে সস্তা দামের ইতালীয় সিল্ক আর ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরী সুতি কাপড়ে, ছেয়ে গেছে রঙ্গিন সস্তা ছাপা কাপড়ের থানে। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাংলাদেশের সিল্কের ব্যবসা তুলে দিল।[১৩১] ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে নাভিশ্বাস বেশ স্পষ্ট। কাশিমবাজারে সে বছর মাত্র ২০০০ মন রেশমের সুতো তৈরী হয়। কোরা কাপড় বিক্রি নেমে এল বছরে মাত্র দুই লক্ষ টাকায়। মাঝে মাঝে পর্যটকেরা এসে যদিও রেশম ও সুতির দ্রব্যসম্ভার দেখে অবাক হয়েছেন, কিন্তু তখন রেশম ব্যবসা শেষ হবার পথে। কুটিরশিল্প হিসাবে রেশমশিল্প ও তন্তুশিল্প টিকে থাকার প্রয়াস পেয়েছে মাত্র। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী, ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে হ্যামিল্টন সাহেব[১৩২] এবং বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল এবং কার্জন রেশমশিল্প সম্পর্কে যে প্রশংসার বাণী রেখে গেছেন তা কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত করুণ বলে মনে হয়।

সব দিক থেকেই কাশিমবাজারের পতন লক্ষণীয়। ব্যবসার অবনতির সঙ্গে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। একসময় কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর জায়গা মনে করা হত। ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির একজন কেরানী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাশিমবাজারে বদলি হবার আবেদন করেছেন।[১৩৩] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসার পরেই স্বাস্থ্যের সুনাম কাশিমবাজারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য করা হত। পলাশির যুদ্ধের পর যে সব ইংরেজ যোদ্ধারা কলিকাতা এবং চন্দননগরে ছিলেন তাঁরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাশিমবাজারে অবস্থিত ২৫০ জন গোরা সিপাহির মধ্যে ২৪০ জনই সুস্থ ছিল।[১৩৪] ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিল স্থির

করেন যে অধিকসংখ্যক গোরা সৈন্যদের কাশিমবাজারে রাখা হবে, কারণ কলিকাতা অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর।[১৩৫] ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন কাশিমবাজারকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে লিখে গেছেন। তিনি কাশিমবাজারের উর্বর জমি এবং কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী অধিবাসীদের প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমতি শেরউড কাশিমবাজারকে 'অত্যন্ত গরম ও স্যাঁতসেঁতে, ঘেমো আলসেমিতে পূর্ণ' বলে লিখেছেন। তাঁর মতে গোটা দেশটা 'মদ চোলাই করার পাত্রের মতো গরম'। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার 'ভিতরবঙ্গের একটি বড় ব্যবসায়ী শহর' বলে গণ্য হলেও পূর্বগৌরবের অনেকখানি তখন লুপ্তপ্রায়।[১৩৬] বাংলার শিল্পের প্রাধান্যের মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপন্নকারীদের নৈপুণ্য ও হাতের কাজের সৌকর্য। সস্তা আমদানি এই শিল্পনিপুণতাকে চিরকালের মতো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। বাংলা-শিল্পকে যাঁরা পৃথিবীর বাজারে পরিচিত করেছিলেন, সেই কারিগরশ্রেণীর নিপুণতা শিল্প-উদ্যোগ হিসাবে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হল। বেঁচে থাকলেন দুচারজন, যাঁরা কুটিরশিল্পের মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রেশমের বুনন, সেই বালুচরী ছাপ ও সূতার কাজ, সেই হস্তিদন্ত বা কাঁসা-পিতলের বাসনের শিল্পকর্মের নমুনার কাজ, ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মতো বর্তমান কালের সামনে তুলে ধরলেন। কিন্তু এগুলি স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। পুরান কালের পারিপাট্য বা রঙের মাধুর্য বা বুননের ঐতিহ্য কিছুই এই নূতন কালের শিল্পকর্মে থাকল না। তবু বর্তমান কাল তাই দেখেই মোহিত হল। ছায়াকে বুকে তুলে নিয়ে কায়ার প্রতি অনাদরের প্রায়শ্চিত্ত করল।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পৃথিবীও পাল্টে গেছে। ইংরেজ কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করে নূতন আইনশৃঙ্খলা প্রবর্তন করে জোর কদমে দেশশাসন করছে। হেস্টিংস ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত গবর্নর পদে ও পরে গবর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করে দিয়ে গেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে দেশে নূতন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করে গেছেন। নবাবের পাওনাদার থেকে নেমে এসে জগৎশেঠ-বংশ সামান্য জমিদারে রূপান্তরিত হয়েছে। বসার জায়গা বা সম্মানে তার স্থান তখনও যদিও কাগজে কলমে নবাবের পরেই, কিন্তু এরা তখন খেলার নবাব, খেলার শেঠ। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদকে বাড়ির গহনা বিক্রয় করতে দেখে যত না আশ্চর্য হতে হয়, তার থেকেও আশ্চর্য লাগে ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে ১২০০ টাকা মাসহারা গ্রহণ করাতে।[১৩৭] নূতন যুগে পুরান কালের বংশ এইভাবেই বাতিল হয়ে গেল। এযুগের লোক কান্তবাবু আট টাকা মাসিক মাহিনায় ইংরেজ কুঠিতে ঢুকেছিলেন।[১৩৮] গবর্নর জেনারেলের বেনিয়ান হয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। ১২০০ সালে পৌষ মাসের শুক্লানবমীতে নব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৭৯৩)। মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র সন্তান মহারাজা লোকনাথ রায়, নায়েব দেওয়ান বাহাদুরকে পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং এক লক্ষ টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। জগৎশেঠ আর কান্তবাবু দুই যুগের দুই প্রতীক। ব্যবসায়ী বাংলার পতনের সঙ্গে জগৎশেঠ-বংশের পতন।

জমিদারী বাংলার উত্থানের সঙ্গে কান্তবাবুর দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীতে রূপান্তর। ইংরেজ আমলের শুরু নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আইনের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে নিজামৎ-বংশের হিঙ্গু সাহেব খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। এন্সাইন নর্টন নামে এক ইংরেজ কাটোয়াতে এক হিন্দু রমণীর মৃত্যুর কারণ বিবেচিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল।[১৩৯] কাশিমবাজারে ইংরেজ কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ১৮৫৮-৬২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিক্রি করে দেওয়া হল।[১৪০]

কাশিমবাজারে সংস্কৃতশিক্ষার প্রচলন করলেন কান্তবাবুর পৌত্র রাজা হরিনাথ রায়। সময় ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের পরে, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের আগে। নিজে ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই বিদ্যার বিস্তারে তিনি অগ্রণী হন। কাশী থেকে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে কাশিমবাজারে নিয়ে এসে তাঁর পরিচালনায় অনেকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ন্যায় ও স্মৃতি উভয় বিষয়েই শিক্ষাদান করতেন। নদিয়ায় ন্যায় পাঠ করার ফলে ন্যায়পঞ্চাননের পরিচালনায় চতুষ্পাঠীগুলি সর্বদা ছাত্র পরিপূর্ণ থাকত। দেশের নানা জায়গা থেকে বিদ্যার্থীগণ কাশিমবাজারে সমবেত হতেন।[৪১] ব্রাহ্মণগণ সাধারণত বামুনগাছাতে অবস্থান করতেন। ফলে এখানে ক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভক্ত হলেন। ব্যাসপুর শৈব আরাধনা ও চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ব্যাসপুরের শিবমন্দির তৎকালীন যুগের মন্দিরশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। শিক্ষাবিস্তারে রাজা হরিনাথের বিশেষ মনোযোগ ছিল। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর কুড়ি হাজার টাকা দান উল্লেখ-যোগ্য।[১৪২]

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর সৈদাবাদে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। সম্ভবত মুর্শিদাবাদে এটি প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। বিদ্যোৎসাহী রাজা হরিনাথ রায় ঈশ্বর-প্রাপ্ত হলেও তাঁর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের বদান্যতার কথা সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে। স্টুয়ার্ট সাহেব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[১৪৩]

ব্যবসায়ী কাশিমবাজার ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দেও জীবন্ত ছিল। তখনও রেশম, সুতি কাপড়, সোরা, চিনি ও নীলের ব্যবসায় চলছে। চাল যা উৎপন্ন হয় তা নদীপথে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্থলপথেও চাল উত্তরপশ্চিমের প্রদেশগুলিতে রপ্তানি হত। মুর্শিদাবাদে তখনও প্রচুর পরিমাণে ধান, নীল, সরষে, তিসি, মটরের ডাল ও তুঁত উৎপন্ন হচ্ছে। নীল চাষ কায়েমী হয়েছে জঙ্গিপুরে ও কালিগঞ্জে, উৎপন্ন নীলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫০০ ও ২০০০ মন। জঙ্গীপুর ঘাটে টোল আদায়ের পরিমাণ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে ৫০০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে হল দেড় লক্ষ টাকা।[১৪৪]

কাশিমবাজারের অবনতির জন্য প্রকৃতিও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। যে নদীর বাঁক কাশিমবাজারের উন্নতির প্রধান সহায়, বন্দর কাশিমবাজার সৃষ্টির কারণ, সেই বাঁক থেকে নদী সরে গেল। সপ্তগ্রাম বন্দর যেমন কুৎসিত গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে, গৌড়ের প্রাধান্য[১৪৫] ও শান্তিপুরের সৌন্দর্য যেমন অবলুপ্ত হয়েছে, নদীর চঞ্চলা গতি কাশিমবাজারের পতনেও সহায়ক

হল। নদীর গতির মধ্যেই ধ্বংসের নিশানা ছিল। প্রায় ৯০ ডিগ্রির বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী নদী যখন দক্ষিণপূর্ব প্রবাহে অশ্বক্ষুরমুখে প্রবেশ করত তখনই পলিমাটি বাঁকের মুখে জমা করত। ক্রমে বর্ষার উত্তাল তরঙ্গে বয়ে আনা পলিমাটির পাহাড় ভেদ করে শীতের ক্ষীণশক্তি নদীর গতি ক্ষীণতর হয়ে এল। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বার্নিয়ার ও টেভার্নিয়ার স্থতি শহরে পৌঁছবার পর, বার্নিয়ার জলপথের অসুবিধার জন্য স্থলপথে কাশিমবাজারে উপনীত হন। টেভার্নিয়ার এই বাঁকটিকে 'ক্ষুদ্র খাল' বলে অভিহিত করেছেন। হেস্টিংস ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহুলা পর্যন্ত এসে স্থলপথে কাশিমবাজারে আসেন।[১৪৬] হলওয়েল পলাশির যুদ্ধের পর জলাভাবে বজরা ত্যাগ করে একটি ছোট নৌকায় কাশিমবাজারে উপনীত হন।[১৪৭] বর্ষায় বন্যা ও শীতে জলাভাব ক্রমে নিয়মিত রূপ নিল। কুঠিরক্ষার জন্য ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়ালগণ বর্ষাকালে নানা উপায় অবলম্বন করতেন। কলিকাতা গেজেটে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর কাশিমবাজারে এক বন্যাপ্লাবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত শহর সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হয়। জল সরে যাবার পর ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী প্লেগের আক্রমণে শহর শূন্য হয়ে যায়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার নদীতে এক সাইক্লোনের খবর কলিকাতা গেজেটে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঝড়ে মেজর ডান ও তাঁর স্ত্রী জলে ডুবে মারা যান। এবারও জল কাশিমবাজারের বসত অঞ্চলকে ডুবিয়ে দিল।[১৪৮] নিয়মিত বাড়ি পড়ে যেতে লাগল এবং অধিবাসীরা পলায়ন শুরু করল। বন্যার শেষে মড়ক এমন দুর্দান্ত আকার ধারণ করল যে মৃতদেহ সংকার করা দুরূহ কার্য হয়ে দাঁড়াল। কাজেই অনেকে নদীর জলে শকটপূর্ণ মৃতদেহগুলি ফেলে দিতে লাগলেন। ফলে জল দূষিত হয়ে উঠল। সেই জল ব্যবহারে রোগের প্রসার বৃদ্ধি হল।[১৪৯] কাশিমবাজার ক্রমে জনশূন্য হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই কাশিমবাজার জঙ্গল ও বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ভেলেস্লিয়া লিখেছেন যে কাশিমবাজারে বাঘের উপদ্রবে অস্থির হয়ে প্রতি বাঘ মারার জন্য কোম্পানি দশ টাকা করে পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন।[১৫০] কাশিমবাজারের পরিপূর্ণ ধ্বংসের জন্য কোম্পানির পূর্তবিভাগ অনেকখানি দায়ী। পদ্মা যেখানে ভাগীরথীর থেকে পৃথক পথে প্রবাহিত, সেই মুখে ছিল যুগান্তের পলিমাটি। ভাগীরথীর বা কাশিমবাজার নদীর প্রবাহ উন্নত করার জন্য ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে খননকার্য শুরু হল।

পলিমাটির জঞ্জালমুক্ত নবীন নদী আনন্দপ্রবাহে ছুটে চলে। কাশিমবাজারে ঢোকার বাঁকে না গিয়ে নবযৌবনা নদী সোজা ছুটে চলে মুর্শিদাবাদ শহরের ওপর দিয়ে। ভেঙ্গে পড়ে মুর্শিদকুলী খাঁর নবাববাড়ি, ভেসে যায় সিরাজদৌল্লার সাধের হীরাঝিল। পলি ও বালিতে নদীর যাত্রাপথ এত উঁচু হয়ে উঠেছিল যে নূতন খাতে প্রবাহের জন্য নদীকে নূতন পথ কাটতে হল। ভেঙ্গে পড়ল জগৎশেঠের টাঁকশাল, রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদ। ফরাসী কুঠির ওপর দিয়ে হল নূতন নদীর পথ। নূতন যুগে নদী যুগধর্ম মেনে চলল। কাশিমবাজার নদী আর কাশিমবাজার দিয়ে প্রবাহিত হল না। কাশিমবাজারে অবরুদ্ধ নদী ক্রমে এক বৃহৎ জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়ে কাটিগঙ্গা আখ্যা পেল। বাঁকের বহির্গমন মুখে বা অশ্বক্ষুরাকৃতির

শেষ অংশে পূর্তবিভাগ 'স্লুস্লিস্ গেট' বানিয়ে প্রতি বর্ষায় কাটিগঙ্গাকে সঞ্জীবিত করতেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে এই গতিপরিবর্তন সম্পূর্ণ হল। কাশিমবাজারের নদী ভাগীরথী নামে পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত প্রায় সোজাসুজি প্রবাহিত হল। বন্দর কাশিমবাজারকে পুনর্জীবিত করার শেষ চেষ্টা করলেন কান্তবাবুর প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। কাশিমবাজার ও লণ্ডনের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার পরিকল্পনা ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুন প্রচারিত হল।[১৫১] কিন্তু পরিকল্পনা কাজে পরিণত হল না। কৃষ্ণনাথ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর কলিকাতায় আত্মঘাতী হলেন।[১৫২] একদা কাশিমবাজারের উপনগরী সৈদাবাদ, ফরাসডাঙ্গা, কালিকাপুর, বামুনগাছা, ভাটপাড়া ও চুনাখালি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরিণত হল। বন্দর কাশিমবাজার লুপ্ত হল। ধ্বংস হয়ে গেল 'অগণ্য অট্টালিকা পরিপূর্ণ কাশিমবাজার'। যে শহর বিদেশী পর্যটকদের অবাক করে দিত, যেখানে 'ইহার পরস্পর সংলগ্ন গগনস্পর্শী অট্টালিকারাজির জন্য রাজপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না, দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিনী সৌধমালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে গতায়াত করিতে পারিত, তাহা এক্ষণে আরবের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়'।[১৫৩] 'এক্ষণে ইহার অধিকাংশ বাস্তবাটি জনশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সকল উৎসাদিত গৃহের ইষ্টকাদি মশলা লইয়া অনেকে অপরাপর স্থানে গৃহনির্মাণ করিতেছে।'[১৫৪] কেবল আছে কতকগুলি ভগ্ন মন্দির, আর্মেনীয় গির্জা, ইংরেজ আর ওলন্দাজদের সমাধিস্থল আর জাহাজে আরোহণ ও অবতরণের উঁচু পাকা মঞ্চ। এই মঞ্চ তৈরী হবার সময় ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দ। বন্যার ভয়ে নদীর জলের সাধারণ সীমা থেকে ৬০ ফুট উঁচু করে এই মঞ্চ তৈরী করা হয়। ৪০০ ফুট লম্বা ভাল ইটের পাকা দেয়াল তুলে নদীর পাড় বাঁধান ও মঞ্চটিকে মজবুত করা হল। আজও দুই দিকের সুন্দর বৃহৎ সোপানশ্রেণী সকলের প্রশংসা লাভ করে। এই সমস্ত কাজ শেষ করতে খরচ পড়ে ৩০০০ টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি দেন মাত্র ২৫০ টাকা। বাকি খরচ কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীকুল চাঁদা করে বহন করে।[১৫৫] বর্তমানে চতুর্দিকের জমির মাঝখানে এই মঞ্চখানি বিস্ময় ও প্রশ্নের সৃষ্টি করে। নদীর সস্নেহ সংস্পর্শ বন্যার সময়েও লাভ করা সহজ হয় না। বিরাট এক পরিহাসের মতো মহাজনটুলির পাথরের রাস্তা আজও বেঁচে রয়েছে, কিন্তু সদাচঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্রের চিহ্নমাত্র নাই। মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ কোম্পানির কুঠি অবলুপ্ত, অন্যান্য বাড়িগুলিও অদৃশ্য হবার পথিক। বর্গির হাঙ্গামার সময় যে মধুগড় পুষ্করিণীতে ব্যবসায়ীরা তাঁদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন, আজ তা প্রায় জলহীন এক পঙ্কপল্বল, আর কাশিমবাজার এক প্রয়োজনহীন সৌন্দর্যহীন বিস্মৃত গণ্ডগ্রাম। মানুষের অহংকার কালের গতির কাছে যে কতো তুচ্ছ কাশিমবাজার তার এক অপূর্ব উদাহরণ।

সূত্র নির্দেশ

১। Jadunath Sarkar—Krisnath College Centenary volume : 1853-1953, pp. 131-135. (Nov. 53).

২। Niccolo Manucci—Storia da Mogor, vol I, II & III, (First Ed. 1907, Rep. 1965)

৩। Bengal Past & Present. vol 86. Part I. No. 161 (Jan.-June 1967): The Rise and Decline of Hoogly.

৪। James Rennell—Memoir of a Map of Hindoosthan. cxiii (1793)

৫। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ॥ Wilson's Annals, vol, I

৬। Philip Woodruff—Men who Ruled India, vol I. p 70 (1953)

৭। Bengal Past and Present as (৩)

৮। Niccolo Manucci—Storia da Mogor, vol. II, pp 88-89 (1965)

৯। Jadunath Sarkar as (১)

১০। Narendrakrishna Singha—The Economic History of Bengal, vol I. p 52 (1956) ॥ Hunter—Statistical Account of Murshidabad.

১১। M. Alfred Martineau's Dupleix et I Inde Francaise, vol I

১২। Jadunath Sarkar as (১)

১৩। ঐ

১৪। Narendrakrishna Singha as (১০) p 34

১৫। O'Malley—Murshidabad Gazetteer.

১৬। Narendrakrishna Singha as (১০) ॥ Hunter—Statistical Account. ॥ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৪

১৭। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৫

১৮। C. R, Wilson—Old Fort William in Bengal. vol I, pp 51-52 (1906)

১৯। ঐ ঐ p 16.

২০। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

২১। মানচিত্র ॥ (১) A.D. Innes (২) Hunter—History of Bengal (৩) Rennell.

২২। J. H. Little—House of Jagat Seth. (1967)

২৩। ঐ — ঐ ॥ Seir Ul Mutaqherin, vol I, pp 270-273,

২৪। ঐ — ঐ pp 41-42.

২৫। ঐ — ঐ pp 54-58 ॥ Bengal Consultations. 12 Dec. 1726, 13 Feb. 1727.

২৬। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৪১৭-৪৫৮ ॥ Murshid Quli Khan and his Times—Dr. Abdul Karim

২৭। J. N, Sarkar, Ed—History of Bengal, vol II (Dacca Univ,)

২৮। ঐ — ঐ ॥ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস

২৯। ঐ — ঐ

৩০। J. H. Little—House of Jagat Seth, pp 78-80

৩১। Consultations 28 April 1730 ॥ J. H. Little—House of Jagat Seth, pp 62-64

৩২। Consultations 4 May 1730 ॥ ঐ ঐ pp 63-67

৩৩। Consultations 20 & 21 July 1730 ॥ ঐ ঐ p 68

৩৪। Consultations 28 October 1730 ॥ ঐ ঐ pp 71-72

৩৫। ঐ ঐ p 71

৩৬। ঐ ঐ p 81

৩৭। ঐ ঐ p 83

৩৮। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছেদ

৩৯। Seir Ul Mutaqherin, vol I, p 353.

৪০। J. N. Sarkar, ed.—History of Bengal, vol II (Dacca Univ.)

৪১। ঐ — ঐ ॥ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস

৪২। J. H. Little—House of Jagat Seth

৪৩। Calcutta Review, vol 57. (1873). The Territorial Aristocracy of Bengal. (Art. v.) Kasimbazar (Cossimbagar) Raj.

৪৪। C. R. Wilson—Old Fort William, vol. I, p 100

৪৫। ঐ — ঐ p 154

৪৬। ঐ — ঐ p 156

৪৭। ঐ — ঐ p 166

৪৮। ঐ — ঐ p 170

৪৯। ঐ — ঐ p 181

৫০। Seir Ul Mutaqherin.

৫১। J. H. Little—House of Jagat Seth, p 122.

৫২। J. N. Sarkar, ed.—History of Bengal, vol II (Dacca Univ.)

৫৩। J. H. Little—House of Jagat Seth, p 128-134.

৫৪। ঐ — ঐ p 127

৫৫। ঐ — ঐ p 147 ॥ Bengal Consultations. 18 Nov. (1751)

৫৬। J. N. Sarkar, ed.—History of Bengal, vol II (Dacca Univ.) p 459.

৫৭। Bengal Past and Present, vol. 86, Part II, No. 162. (July-Dec. '67), Early Career of Siraj-ud-daulah.

৫৮। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I.

৫৯। কাশিমবাজাররাজ মহাফেজখানা
৬০। J. N. Sarkar, ed.—as in (৫৬)
৬১। Keith Feiling—Warren Hastings (1950), pp 17-25.
৬২। ঐ — ঐ p 21.
S. C. Hill—Bengal : 1756-57, vol. III
৬৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৭২
৬৪। ঐ — ঐ পৃ ১৭১ ও ২৭৩
৬৫। ঐ — ঐ পৃ ১৭৫
J. N. Sarkar, ed.—History of Bengal, vol II, Chap. XXV ॥ ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৬। সিরাজদ্দৌলা—সাহিত্যে ইতিহাসে
৬৬। Keith Feiling—Warren Hastings, p 25.
৬৭। as (৬৫)
৬৮। N. K, Sinha, ed.—History of Bengal : 1757-1905, Calcutta University (1967), p 7.
৬৯। J. H. Little—House of Jagat Seth.
৭০। ঐ — ঐ
৭১। Proceedings of the Board of Trade (Series III, vol III)—7 Jan., 31 Jan., 13 Feb. & 24 Feb. 1774.
৭২। J. N. Sarkar, Ed.—History of Bengal, vol II, p 498.
৭৩। Proceedings of the Board of Trade 6 December 1775 ॥ Proceedings of the Controlling Committee of Commerce, 10 November, 1769
৭৪। Proceeding of the Board of Revenue (Series II vol I) (1765-1773) —15 November, 1766.
৭৫। Major J. Rennell—Atlas of Hindoosthan ॥ Memoirs of the Map of Hindoosthan
৭৬। Stewart's map of Bengal (1813)
৭৭। Major J. Rennell—Memoirs of the Map of Hindoosthan (1793), p 58
৭৮। Keith Feiling—Warren Hastings.
৭৯। ঐ — ঐ p 27.
৮০। ঐ — ঐ Chap. IV
৮১। ঐ — ঐ ঐ
৮২। O'Malley—Murshidabad Gazetteer.
৮৩। Law's Memoirs

৮৩। Keith Feiling—Warren Hastings p 33
৮৫। ঐ — ঐ p 27
৮৬। ঐ — ঐ p 46
৮৭। ঐ — ঐ p 42
৮৮। ঐ — ঐ p 46
৮৯। O' Malley—Murshidabad Gazetteer.
৯০। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), পৃ ২১৩
৯১। ঐ ঐ
৯২। Keith Feiling—Warren Hastings. p 41
৯৩। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I, p 25 & 101
৯৪। কাশিমবাজাররাজ মহাফেজখানা
৯৫। ঐ
৯৬। Philip Woodruff—Men Who Ruled India, vol I, p 112
৯৭। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৬
৯৮। Philip Woodruff—Men Who Ruled India, vol I. Chap. II
৯৯। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I, p 18
১০০। ঐ ঐ ঐ pp 19-20
১০১। ঐ ঐ ঐ ঐ
১০২। ঐ ঐ ঐ pp 22-27, 55, 178-182.
১০৩। ঐ ঐ ঐ p 20.
১০৪। ঐ ঐ ঐ Chap. II, VIII
১০৫। ঐ ঐ ঐ Chap. IV
১০৬। Proceedings of the Board of Trade, 2 Sept. 1788 ॥ N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol. I
১০৭। N. K. Sinha—Economic Histoy of Bengal, vol I, pp 85-86
১০৮। ঐ — ঐ p 101
১০৯। Proceedings of the Controlling Committee of Commerce, 2 Sept. 1773 ॥ Proceedings of the Board of Trade—10 March, 14 April, 18 April, 29 June, 13 Nov. 1775 ; 27 Jan, 6 Mar, 31 Mar, 30 Apr, 31 May, 30 June, 31 July, 31 Aug, 30 Sept, 31 Oct. 1776.
১১০। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I. Appendix A.
১১১। Anne Basil—Armenian Settlement in India (1969).

১১২। K. K. Dutt—K. N. College Centenary Volume : 1853-1953 p 215 ॥ O'Malley—Murshidabad Gazetteer.
১১৩। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I. pp 100-102.
১১৪। ঐ ঐ ঐ
১১৫। ঐ ঐ p 114
১১৬। ঐ ঐ p 117
১১৭। Proceedings of the Controlling Council of Revenue—25 July 1771
১১৮। ঐ —7 Feb, 12 Feb. 1772
১১৯। ঐ —30 March 1772 (foot note)
১২০। General letters, vol II : 1765-1854—27 March 1772.
১২১। ঐ —14 July 1779.
১২২। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I. p 185.
১২৩, ১২৪। ঐ ঐ p 167 ; 166-167
১২৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—সংবাদপত্রে সেকালের কথা : প্রথম ভাগ, পৃ ১৫৯
১২৬। N. K. Sinha—Economic History of Bengal, vol I. p 203
১২৭। N. K. Sinha, Ed.—History of Bengal : 1757-1905, p 119
১২৮। General Letters, vol II : 1765-1853—8 April 1808
১২৯। ঐ —1 June 1808
১৩০। ঐ —3 June 1814
১৩১। N. K. Sinha, Ed.—History of Bengal : 1757-1905, p 119.
১৩২। J. N. Sarkar—Krisnath College Centenary vol : 1853-1953. pp 131-135
১৩৩। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৯
১৩৪। Robert Orme—A History of Military Transactions of the British Nation in Indostan (1803).
১৩৫। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৮-২৫৯
১৩৬। J. N. Sarkar—Krisnath College Centenary vol : 1853-1953. pp 131-135.
১৩৭। J. H. Little—House of Jagat Seth.
১৩৮। Supreme Court. Pleaside, First Term Case No. 0825 of 1825
১৩৯। General Letters, vol III : 1793-1858 (1840)
১৪০। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মুর্শিদাবাদের কথা (১৩৩৯)
১৪১। Calcutta Review, vol 57, 1873 ॥ রাজকৃষ্ণ রায়—কাশিমবাজার রাজবংশের বিবরণ (১২৮২)

১৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৩৭
১৪৩। ঐ ঐ ঐ পৃ ৮৩
১৪৪। J. N. Sarkar—Krisnath College Centenary vol : 1853-1953. pp 131-135
১৪৫। Calcutta Review, vol 57, 1873 ‖ রাজকৃষ্ণ রায়—কাশিমবাজার রাজবংশের বিবরণ (১২৮২)
১৪৬। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ ১১ (১৩২৪) ‖ Calcutta Review, April 1892.
১৪৭। ঐ ঐ পৃ ১১ (১৩২৪) ‖ Holwell—India Tracts, p 269.
১৪৮। Calcutta Review, vol 57, 1873
১৪৯। শ্যামধন মুখোপাধ্যায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৮৬৪)
১৫০। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ ২৫৯
১৫১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৬৯।
১৫২। Calcutta Review, vol 57, 1873, pp 88-100.
১৫৩। নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ ১২
১৫৪। রাজকৃষ্ণ রায়—কাশিমবাজার রাজবংশের বিবরণ (১২৮২), পৃ ৫
১৫৫। C. R. Wilson—Old Fort William, vol I (1906), p 104, 6 Dec. 1718

পরিশিষ্ট—১

Factors of Cossimbazar & Residents at Murshidabad

Year	Factor	Assistant
1640	The factory was probably established	
1654	Stephens (died in Cossimbazar)	
1658	John Kean,	Job Charnok
1680	Job Charnok	
1683	Robart Hedges (officiated during absence)	Robert Hedges
1686	Job Charnok's flight	
1702	Halsay	
1707	William Bugden	Chambers
1711	Robert Hedges	
1715	Samuel Feak	John Dean
1716	William Ange	
1720	John Dean	
1723	Henry Frankland	

Year	Factor	Assistant
1727	Edward Stephenson	
1730	John Stackhouse	
1734	Braddyll	
1742	Francis Russell	
1744	John Forster	
1750	William Watts	Collet/Hastings
		Residents
1757	Warren Hastings (acting)	Scrafton
1759	Do	Warren Hastings (acting)
1762	Warren Hastings	Warren Hastings
1763	Francis Sykes (acting)	
1763	Batson	
1765	A. W. Senior	Francis Sykes
1765 (22 July)	F, Sykes	„
1769	Aldersey	„
1770	Palk	Bechar
1771	Samuel Middleton	Samuel Middleton
1774 (31 Oct,)	J. Rider (acting)	Do
1774 (9 Dec.)	W. Aldersay	Do
1776 (1 Mar.)	T. Lane	Do

[The list is not Complete]

পরিশিষ্ট—২

কাশিমবাজারের সমাধির বিবরণ

কাশিমবাজারে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সমাধিক্ষেত্র পৃথক। ফরাসী সমাধিক্ষেত্র গঙ্গার গর্ভে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্রদ্বয় আজও আছে। মেরামত ও দেখাশোনার অভাবে দুইটি জায়গারই অবস্থা শোচনীয়। গাছের ডাল পড়ে অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু সমাধি ভগ্ন। জঙ্গলসমাকীর্ণ হওয়ায় গাছের শেকড় ঢুকে বহু সমাধি নষ্ট করে দিয়েছে। দিনে এগুলি গবাদি পশুর বিচরণস্থল, রাত্রে দুষ্কৃতকারীদের আস্তানা এবং সন্ধ্যায় অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ। সমাধির বহু পাথর চুরি হয়ে গিয়েছে। সমাধির গেট প্রতিবারই অদৃশ্য হয়। এমন কি কোন সমাধিতে ফুল বা ফুলদানী দেওয়ামাত্র চুরি হয়ে যায়। প্রকৃতই এই সমাধিস্থানগুলি পরিত্যক্ত।

পরপৃষ্ঠায় কালানুক্রমিক সূচী দেওয়া হল।

ইংরেজদের সমাধিস্থল।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে আঠারটি সমাধির কথা লিপিবদ্ধ আছে। এখন সর্বসমেত সতেরটি সমাধি বর্তমান। তার মধ্যে পাঁচটির উচ্চতা পনের থেকে কুড়ি ফিটের মধ্যে। দুটিতে সমাধিফলকের চিহ্ন নাই, অন্য তিনটি সমাধি চার্লস ক্রমলাইন, জন পীক ও লাইয়ন প্রেগারের। হেষ্টিংসসাহেবের প্রথম স্ত্রী ও কন্যার সুন্দর সমাধিটি কিছুদিন হল সম্পূর্ণরূপে গাছের ভার পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছবি ছাড়া হেষ্টিংস-বণিতার সমাধির সৌন্দর্য আজ জানতে পারা কঠিন। বর্তমানে মাত্র আটটি সমাধির ফলক আছে।

১। Mrs. Mary Hastings and her daughter Elizabeth—11 July 1759

২। Male infant of Captain John & Rose Grant born & buried —19 Nov. 1775

৩। Mrs. Eliz. Hartle—9 Oct. 1782

৪। Eliza, wife of Major Edward Clark and Edward Ives (erected by their beloved children)—8 Apr. 1760 and 19 Aug. 1783 (tomb size—5'6" × 4' 3" × 1'9")

৫। Thomas Dugald Campbell Esqr. who departed the *life* in Rangamati aged 32 years—6 October 1784

৬। Charles Cromeline Esq. aged 81 years—23 December 1788 (tomb size—9'10" × 10'.1" base)

৭। John Peack, Esquire. Late Serior merchant, aged 31 years (erected by his 'truly afflicted widow')—24 Aug. 1790

৮। Mr. Lyon Prager
Diamond Merchant and Inspector of indigo and drugs aged 47 years.—12 May 1793 (tomb size—10' × 10' base, Hight about 15')

কতকগুলি কারুকার্যখচিত সমাধি আছে। মাঝখানের বড় স্তম্ভটির কারুকার্য অপূর্ব। অনেকে এটি জোসেফ বার্দ্যু (Joseph Bardieu)-র সমাধি বলে সন্দেহ করেন। কাশিমবাজার কুঠির প্রধান বার্দ্যু ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ডেভিড অ্যান্সট্রাথার (David Anstrathar) ও সারা ম্যাটক (Sarah Mattock)-এর সমাধির কথা নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। রায় মহাশয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের আগে যখন এই সমাধিস্থান দেখেন তখন সম্ভবত এই ফলকদুটি ছিল। ডেভিড অ্যান্সট্রাথার কাশিমবাজারে একদা সুবিখ্যাত ফেলিসিটি হলের (Felicity Hall) স্রষ্টাকর্তা। এই ফেলিসিটি হল কোম্পানির কর্মচারীদের জমায়েত হবার আসর ছিল। সম্ভবত এই ভবনটি আজও বিদ্যমান কিন্তু পরিচয়লুপ্ত হওয়ায় অপরিচিত। সারা ম্যাটক সুবিখ্যাত রাজনৈতিক হ্যামডেনের (Hampden) নাতনী কিনা নিখিলনাথ রায় আলোচনা করেছেন। অ্যান্সট্রাথার ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ও শ্রীমতি ম্যাটক ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে সমাধিস্থ হন। এ ছাড়া মালদহকুঠির অধ্যক্ষের স্ত্রী শ্রীমতি গ্রে ও মেরী চার্লস এডাম্স ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাধির কথা বর্ণিত হয়েছে। সমাধি প্রস্তরের তারিখ যথাক্রমে ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দ ও ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র ॥

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল ১৭টি সমাধিবেদী দেখার কথা লিখেছেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে নিখিলনাথ রায় ২২টি সমাধিবেদী দেখেছেন। বর্তমানেও (১৯৬৯ খ্রী) ২২টি সমাধিবেদী আছে। সম্ভবত ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল জঙ্গল ও ময়লার জন্য পাঁচটি নীচু সমাধিবেদী দেখতে পাননি। বর্তমানে মাত্র পাঁচটি সমাধি ফলক রয়েছে।

১। Daniel Van Der Muyl—16 May 1721 (tomb size—13′9″ × 9′ × 2′3″)

২। Matthias Arnoldus Brahe—20 Aug. 1772 and Johanna Petronela Van Sorgen—Abraham Matinus Brahe born on.........1741 death on—17th BRE. A : 1772

৩। Tamerus Canter Visscher died at Calicapor—31 January 1778 highest tomb (tomb size—15′.10″ × 11′ base)

৪। Gregonius Herklots Van Middelburg, Secunde der Bengalsche Directic—14 Feb. 1787

৫। Johan Gantvoort van Aaften—20 Oct. 1792 inlieven Ondropper Chirurgyn in de Edle Needrlandsche oftindice Compagnief

আর্মেনীয় সমাধিক্ষেত্র ॥

দীর্ঘদিনের অনাদরের পর ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আর্মেনীয়ান সমাজ কর্তৃক সুসংরক্ষিত। মাত্র একটি সমাধিস্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়।

১। Manatsakan Sambat Vardon who died on 13 Oct. 1827 (founder of the Armenian College in Calcutta).

পরিশিষ্ট—৩

কুটিরশিল্প (বর্তমানকালের)

১। কাঁসা-পিতলের বাসন তৈরী—খাগড়া

২। হস্তিদন্তের কারুকার্য—বহরমপুর ও খাগড়া

৩। রেশমের শাড়ী ও থান—বিষ্ণুপুর, সৈদাবাদ ইত্যাদি

৪। বাতিল রেশম হতে—মটকা, তসর, গরদ ও ছালের কাপড় তৈরী—বিষ্ণুপুর, সৈদাবাদ ইত্যাদি

৫। পোড়া ও কাঁচামাটির মূর্তি তৈরী—বহরমপুর, খাগড়া সৈদাবাদ।

৬। মিষ্টান্ন তৈরী (বিশেষ ছানাবড়া ও ওসওয়ালী মিষ্টি)—খাগড়া, সৈদাবাদ ও আজিমগঞ্জ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ৩

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৩
১৩৭৪

রবি দত্ত : বিস্মৃত কবি-অনুবাদক

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

রবি দত্ত বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি বিস্মৃত নাম। ভাষাপথিক আচার্য হরিনাথ দে বিষয়ক গবেষণাকালে আমি রবি দত্তের কার্যাবলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হতে থাকি এবং যথানিয়মে তাঁর রচনাবলী আমাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাৎক্ষণিকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার উপায়ান্তর না থাকায় আমি বিরত থাকি। কিন্তু সামান্য কিছুকাল পরেই এক আকস্মিক আবিষ্কার আমাকে যুগপৎ ভাবিত ও উত্তেজিত করে তোলে। বলা চলে, এটি প্রায় একটি মহাদেশ আবিষ্কার—রবি দত্তের গ্রন্থাগার।[১] গ্রন্থাগারে ঢুকে আমার মতো অনেকেরই মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এই অমূল্য সম্পদ এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদরে আত্মগোপন করে আছে কেন? এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করলে জবাব মিলবে,—গ্রন্থাগারটির মালিক রবি দত্ত তাঁদের স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁদের স্কুলকে এই গ্রন্থাগারটি উপহার দিয়ে গেছেন। গ্রন্থাগারটি কয়েক শত বহুমূল্য পুস্তকের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। এই সংগ্রহে আছে—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ; ভাষাতত্ত্বমূলক বহু মূল্যবান রচনা; বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসের নানাবিধ মৌল গবেষণা ইত্যাদি আরও কত কি। রবি দত্ত-সংগ্রহের কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য :

১. Domenico pezzi : La Lingua Greca Antica.

২. R. S. Conway : The Italic Dialects.

৩. August Fick : Vergleichendes Woerterbuch der Indogermanischen Sprachen.

৪. Georg Bulhler : Grundriss der Indo-Arischen Philologie.

৫. George Bertin : Abridged Grammars of the Languages of the Cuneiform Inscriptions.

---

[১] সবচেয়ে কৌতুকাবহ ব্যাপার হল এই মহার্ঘ সংগ্রহটির অস্তিত্ব আজও বরানগরের একটি পুরনো স্কুলে বর্তমান। 'বরানগর ভিক্টোরিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'-এ এই ধরনের সংগ্রহের কদর কতখানি হতে পারে সে বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৬. A. Samuele Clarke : Homeri Odyssea Graece et Latine.

৭. Paget Toynbee : La Commedia di Dante Alighieri.

৮. J. Muir : Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India.

আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত জাড্যের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে গেলে অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ কবি-অনুবাদক রবি দত্তের বিষয়টি উপস্থিত করা চলে। বিশ্বভাষাপথিক আচার্য হরিনাথ দের পর এদেশে বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসেবে রবি দত্তের নামটি স্মর্তব্য। শুধুমাত্র ভাষাবিদ্ হিসেবেই নয়, আরও অনেক বিষয়ে এই দুই পণ্ডিতের মধ্যে আশ্চর্য সব মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাবতে ভারি অবাক লাগে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে এই দুই অমূল্য জীবন নিঃশেষিত হয়ে গেলেও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে যথাযথ ভাষান্তরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার গুরুভার দায়িত্ব তাঁরা যথার্থ ই অনুভব করেছিলেন।[১]

যতদূর জানা যায়, প্রথমবার (১৯০৪ খ্রী) ইংলণ্ডে গিয়ে রবি দত্ত এক প্রেমে ব্যর্থ হন। তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না। ওই বছরের ৪ জুন এমিলি জর্জেনা অ্যাট্‌কিন্‌সন্ নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে অবশ্য তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও খুব স্থির নিশ্চয় ছিলেন না। যে অন্তর্মুখিনতা এই ধরনের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এই অপ্রকৃতিস্থতা তারই নামান্তর হিসেবে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একটি নিদারুণ মানসিক দুর্যোগে যে রবি দত্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই দুর্যোগে প্রথম গুঁড়িয়ে গেল তাঁর দাম্পত্যজীবন। তথাকথিত সুহৃদ্‌বর্গের সৎ পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই দুর্নিবার বিচ্ছেদ রবি দত্তের শোকাবহ পরিণতিকে হয়তো আরও ত্বরান্বিত করে। এমিলি কিন্তু রবি দত্তকে ভুলতে পারলেন না। ইংলণ্ড থেকে চিঠিতে তাঁকে নিজের কাছে চলে আসার আকুল আহ্বান তিনি জানান। রবি দত্তের তখন যা শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে আর যোজন যোজন লবণ সমুদ্র অতিক্রম করে প্রিয়তমা পত্নীর সান্নিধ্যে নতুন আয়ু, স্বাস্থ্য ও সুখ অর্জন করা সম্ভব ছিল না। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত হ্যাম্‌লেটের মতো তিনি শুধু বারবার এমিলিকে তাঁর কাছে ফিরে আসার হাতছানি দিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবে দুজনেই দুজনের আহ্বানে সক্রিয় সাড়া দিতে শেষ পর্যন্ত অপারগ হলেন।[২]

১ আচার্য হরিনাথ দের সঙ্গে রবি দত্তের সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। কেননা দুজনের মধ্যে অনুবাদ প্রসঙ্গে পত্রাদি বিনিময় হত। হরিনাথের মাতুলপুত্র শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শুনেছি হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন রবি দত্ত তাঁর ফরাসীতে লেখা কবিতা ও অনুবাদ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইতেন।

২ রবি দত্তের মৃত্যুর অনেককাল পরেও তাঁর স্বজনদের সঙ্গে এমিলির পত্রবিনিময় ছিল অব্যাহত। রবি দত্তের ভাগিনেয় অমিয় বসুকে লেখা এমিলির যে সব চিঠি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে (অমিয়বাবুর স্ত্রী শ্রীলীলা বসুর সহযোগিতায়) তাতে এই ইংরেজ রমণীর সহৃদয়তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

রবি দত্তের উদ্বায়ু মনোরাজ্যে অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। সীমাহীন অন্তর্দাহ, অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য, সংশয়, শঙ্কা, নির্বেদ, একদা অতি পরিশীলিত চেতন আর অব্যক্ত অবচেতনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমোঘ নির্মন্থনের পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ারাশি মৃত্যুমুখিনতার ইঙ্গিত দিতে থাকে। প্রথম যৌবনের আবিশ্ব জ্ঞানাভ্যাস জীবন-জিজ্ঞাসার উজ্জ্বলতম সব উপলব্ধি ক্রমেই নিরবচ্ছিন্ন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। মগ্নচেতনার অন্ধকারে অকস্মাৎ আত্মোৎঘাটনের আতঙ্কিত নীল নীল বিদ্যুৎ সামগ্রিক অস্তিত্বের এক মৌল, অস্পষ্ট ছায়াময়ী সর্বনাশ দাবি করতে শুরু করে। কিংবা হয়তো বা মঁসিও তেস্তের মতো শূন্য থেকে শূন্যান্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বা এক অবচেতনা থেকে আর এক অবচেতনায় পৌছনোর প্রস্তুতিতে ক্লান্তচৈতন্য বল্গাহীন হয়ে গেল। প্রজ্ঞার শুদ্ধ আলোকে অথবা বীভৎস এক ঝলকে জীবনের সমগ্র যোগফলকে বুঝি বা কোনও এক মৌহূর্তিক শুদ্ধতায় চৈতন্যে ধারণ করতে চেয়ে এই জীবন, এই রবি দত্ত নিজেকে হারিয়ে ফেললেন নিজেরই হাতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ। রবি দত্তের Epitaph পোল্ ভালেরির ভাষাতেই দেওয়া চলে :

"Syllogisms debased by agony, thousands of joyful images
bathed in pain, fear joined to fine moments of the past.
And yet, what a temptation death is.
An unimaginable thing that enters the mind in forms of
desire and horror, turnabout.
Intellectual end. Funeral march of thought."[১]

দুই

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১ অক্টোবর কলকাতায় মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে (৫ শঙ্কর ঘোষ লেন) রবি দত্তের জন্ম। দত্ত পরিবারের আদিবাস ছিল হাটখোলায়। রবি দত্তের জন্মের অনেককাল আগে হাটখোলার বাস তাঁদের ছিন্ন হয়। রবি দত্তের পিতামহ কাশীনাথ দত্তই সম্ভবতঃ হাটখোলা থেকে বরানগরে গিয়ে প্রথম বসবাস শুরু করেন।[২] একত্রিশ বছর বয়সে রবি দত্তের পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রী)। এবং পরের বছরেই নরেশনন্দিনী পাঁচটি পুত্রকন্যাকে রেখে স্বামী-অনুগামিনী হন (৯ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রী)। পিতামহের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল কাটিয়ে রবি দত্ত ও অন্যান্য ভাইবোনেরা মাতুলালয়ে এলেন। রবি দত্তের মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। আর মাতামহী ক্ষেমদাসুন্দরী হলেন কোন্নগরের স্বনামধন্য শিবচন্দ্র দেবের কন্যা। হৃদয় মাতামহ ও মহীয়সী মাতামহীর স্নেহচ্ছায়ায় রবি দত্তের কৈশোর ও যৌবন কাটে।

---

১ পঙ্‌ক্তিবিন্যাস লেখকের।

২ রবি দত্তের মৃত্যুর পর বরানগরে তাঁর পিতামহের প্রকাণ্ড বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। অবশ্য ওই বাড়িটির সামনের রাস্ত পথটি কাশীনাথ দত্তের নামেই পরিচিত।

মেট্রোপলিটন্ ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) রবি দত্তের শিক্ষারম্ভ। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্‌স্ পাস করেন।[১] এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপও লাভ করেছিলেন।[২] এনট্রান্‌স্ পরীক্ষার পর তিনি জেনর‍্যাল্ অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। মানের ক্রমানুসারে তাঁর নাম পনের জনের পরে দেখা যায়। এই পরীক্ষায় ভাষাসমূহে তিনি ডাফ্ স্কলারশিপ লাভ করেন।[৩] সংস্কৃতে Pachete Prize ছাড়াও তিনি এই পরীক্ষায় একটি সাধারণ স্কলারশিপ পান।[৪] এফ. এ. পরীক্ষায় সফলতার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তিনি যথাক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বা বিভাগে দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ স্থান লাভ করলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, সংস্কৃত অনার্সে এ-বছরে কোনও ছাত্রই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি।[৫] সংস্কৃত অনার্সে নৈপুণ্যের জন্যে রবি দত্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী স্বর্ণ পদক পান।[৬] তাছাড়া তিনি একটি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপও লাভ করেন।[৭] এবং এই বছরেই প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত 'এ' গ্রুপে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই পরীক্ষাতেও কোনও প্রার্থী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হননি।[৮]

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এম. প্রোথেরো একটি প্রশংসাপত্রে রবি দত্ত সম্পর্কে লিখেছেন (১০ আগস্ট ১৯০৪ খ্রী) : "He completed his M. A. lectures in English in this College during the Session 1903-1904."[৯] এই সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে। রবি দত্ত ইংলণ্ডে যাওয়ার তীব্র বাসনা প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্য পড়ার। স্নেহশীল তত্ত্বাবধায়কেরা কিন্তু সেকথা শুনতে নারাজ। বিশেষতঃ মাতামহী তো তাঁর পরম আদরের নাতিটিকে বিলেতে যেতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কেননা তাঁদের বড় ছেলে (ব্যারিস্টার হেমেন্দ্রনাথ মিত্র) বিলেতে গিয়ে 'মেম' (এক ফরাসী মহিলা) বিয়ে করেন। এই সব বিচিত্র আশঙ্কায় কোন মতেই নাতিকে তিনি আর ওই 'মেম'-অধ্যুসিত দূরদেশে পাঠাতে রাজী হচ্ছিলেন না। রবি দত্ত খুব মনমরা হয়ে পড়লেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর ইংলণ্ডে যাওয়া সম্ভব হল।

১ *The Calutta University Calendar* 1900.
২ রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণী থেকে এই তথ্য দেওয়া হল।
৩ *The Calcutta University Calendar* 1902.
৪ রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণীই হল এই তথ্যাদির উৎসমুখ।
৫ *The Calcutta University Calendar* 1904.
৬ *Presidency College Centenary Volume* 1955. Calcutta 1956.
৭ রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণী থেকে এই তথ্যটি দেওয়া হল।
৮ *The Calcutta University Calendar* 1904.
৯ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রবি দত্ত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে যাওয়ার আগে একদা তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন। যদিচ এই সঙ্কল্প বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি প্রথমে কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজের দুরূহ পরীক্ষা মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্‌-এ তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন।[১] * রবি দত্তের শিক্ষাসংক্রান্ত যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে আমি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখি। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৬ অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের এক চিঠিতে (E. 15/2724) আমাকে জানান :

"In reply to you letter of 13 October I confirm that Mr. Rabindra Nath Datta Came into residence at Christ College in the Michaelmas Term 1904 as an Affiliated Student from the University of Calcutta. He was placed in the third class in the Medieval and Modern Languages Tripos in 1906 and admitted to the B. A. degree on 19 June of that year, He proceeded to the M. A. degree on 3 February 1910. For information on Mr. Datta's other activities whilst at Cambridge I am afraid I must refer you to the authorities at Christ College".

এবং ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ পত্রোত্তরে (২৪ অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রী) আমাকে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানিয়েছেন :

"Your letter of 21 October 1969 has been passed to me for attention.

I enclose the extracts from Peile's Biographical Register concerning the late Mr, Datta, This, together with the foot notes by Dr. Peck the Librarian of the College, answers (1) and (3) of your letter,

Mr. Datta became a member of the Senate when he proceeded M, A. in 1910 and was a member of the College Club during 1910-1917. According to their records Mr. Datta was never a member of the Union Society."

"Peile II, 879 f.

Datta, Rebindranth : Son of Ganendra Nath Dutt, landowner ; born at Sankar Ghosh's Lane, Calcutta, India, 1 oct. 1883. Educated at

১ *The Historical Register of the University of Cambridge.* Cambridge 1917.

* আচার্য হরিনাথ দের নামটিও প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে। রবি দত্তের পাঁচ বছর আগে তিনিও কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র হিসেবে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্‌ পেয়েছিলেন।

Calcutta University, Admitted pensioner of Christ's College Cambridge under Mr. Cartmell 5 oct. 1904.

B. A. (Medieval & Modern Languages Tripos 3rd class) 1906; M, A,* 1910 ; Called to the Bar (Gray's Inn) 27 January 1907. Enrolled in the Calcutta High Court as an advocate 1909 (*sic*); Lecturer in Englih & in Comparative Philology in the University of Calcutta 1911 ; Examiner for the M. A. Examination in English and in Comparative Philology from 1912. Author ; *Echoes from East and west.* 1909. Present (i, e. 1912) address : Kasinath House, Kasinath Dutt Road, Baranagore, Catcutta."

*"At Cambridge the M. A. degree is not taken by examination, therefore not in any Subject ; simply by lapse of time & payment."

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্ পাওয়ার পর রবি দত্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। এই সময় তিনি লণ্ডনের রেন্'স ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্র হিসেবে যে সব বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণী মেলে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ টি. এম. টেলরের প্রশংসাপত্রে।[১] ই. জে. ব্রুক্‌স্ তাঁর প্রশংসাপত্রে রবি দত্তকে তারিফ করে লিখেছেন :

"In the Civil Service Examination, Division I, he obtained 241 marks out of a possible 600, a very good achievement considering the severe standard of that examination, and the numerous other subjects that claimed Mr. Datta's attention that time."[২] ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এই পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে তিনি সামরিক শিক্ষানবিস হিসেবে ঔপনিবেশিক চাকরিতে মনোনীত হন।[৩]

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পর তিনি গ্রে'জ ইন্-এ ভর্তি হয়ে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে রবি দত্ত "Was called to the Bar and got enrolled as a Barrister of the English High Court, King's Bench Divison."[৪]

ব্যারিস্টার হওয়ার পর রবি দত্ত আই. ই. এস. লাভ করতে চেষ্টিত হন। আচার্য হরিনাথ দের মতো তিনিও ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতে মনস্থ করেন। এই প্রসঙ্গে কেম্‌ব্রিজ ও অন্যান্য বিদ্যাপীঠের স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদেরা রবি দত্তকে যে প্রশংসা

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
২ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৩ রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের মুদ্রিত বিবরণীতে লেখা আছে : "Passed the Civil Service Examination...and was found eligible for a Colonial Cadetship."
৪ *Ibid*.

পত্রগুলি দিয়েছিলেন তা উল্লেখ্য। ওআল্টর্ ডব্লিউ. স্কিট্, জেম্স্ উইলিয়ম্ কার্টমেল্, কারভেথ্ রীড, টি. এম. টেলর্, ই. জে. ব্রুক্স্ প্রমুখ প্রায় সকলেই তাঁদের শংসাপত্রে আই. ই. এস. লাভের পক্ষে রবি দত্তের যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১] অবশ্য যে কোনও কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত আই. ই. এস. লাভে তিনি সমর্থ হলেন না। অত্যধিক পড়াশুনো ও কাজকর্মে তাঁর শরীর এই সময় ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি কয়েক মাস হাসপাতালে বিশ্রাম নিতে হল তাঁকে।[২]

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে শরীর একটু ভাল হলে রবি দত্ত স্বদেশে ফিরলেন। এই সময় তিনি কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসেবে যোগদান করেন।[৩] কিন্তু আইনের চেয়ে ভাষা ও সাহিত্যেই যেকালে ছিল তাঁর অধিকতর আসক্তি; তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কুলীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার প্রতি মোহও খুব স্বাভাবিক। সুযোগও মিলল রবি দত্তের বলা চলে, অযাচিত ভাবেই। আচার্য হরিনাথ দে এই সময় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা তৌলনিক ভাষাবিদ্যার উপাধ্যায়ের পদে ইস্তফা দিলেন।[৪] প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে আচার্য হরিনাথ উক্ত পদে প্রথম বহাল হন।[৫] সিণ্ডিকেটের মিটিংয়ে রবি দত্তের নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত তথ্যাদি মেলে :

"Considered the question of appointing a University Lecturer in Comparative Philology,

RESOLVED—

That the Syndicate recommend to the Senate that Mr. Rabindranath Dutt, M. A. (Calcutta and Cambridge), be appointed University Lecturer in Comparative Philology.

RESOLVED ALSO –

That in case of the appointment being sanctioned, the honorarium of Mr. Rabindranath Dutt be at present fixed at Rs. 150 a month."[৬] এবং পরের বছরেই (১৯১১ খ্রী) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের উপাধ্যায় নিযুক্ত হন।[৭]

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ *Poems, Pictures and Songs to which is prefixed the Philosophy of Art* (Das Gupta & Co., Calcutta 1915)-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত রবি দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীই হল এই তথ্যের উৎসমুখ।

৩ *Ibid.*

৪ "Read a letter from Mr. Harinath De, M. A., resigning his appointment as University Lecturer in Comparative Philology."—*Minutes of the Syndicate.* May 14, 1910,

৫ *Hundred Years of the University of Calcutta.* Calcutta 1957.

৬ *Minutes of the Syndicate.* April 30, 1910.

৭ *Poems, Pictures and Songs to which is prefixed The Philosophy of Art* (Das Gupta & Co., Calcutta 1915)-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত রবি দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে এই তথ্য দেওয়া হল।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রবি দত্ত হঠাৎ আবার ইংলণ্ডে যান। আগেই বলা হয়েছে, এই বছরের ৪ জুন স্কার্বোর‍্যাতে এমিলি জর্জেনা অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ নামে এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি বিবাহ করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বিদুষী ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করার কারণটি হয়তো ছিল তাঁর মনের মতো জীবনসঙ্গিনী লাভের বাসনা। স্ত্রী তাঁকে তাঁর কাজে সদাসর্বদা সাহায্য করতে পারবেন এমতো আশা রবি দত্ত নাকি মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন।[১] য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে গেলেও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আত্মিক ক্ষেত্রগুলিতে য়ুরোপকে আমরা কোনদিনই সমগ্র মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি। তাই মাইকেলের বিবাহ আমাদের কাছে কটাক্ষের বস্তু। যে কোনও বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ মাত্রেই 'মেম' বিবাহ ; অর্থাৎ প্রায় ব্যাভিচার—এই ধরনের গোঁড়ামি বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক পর্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় পায়। মানবেন্দ্রনাথ রায়, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখেরা তাঁদের জীবনচর্যায় প্রমাণ করেছেন এইসব গোষ্ঠীচিন্তার অসারত্ব।

স্বদেশে ফিরে রবি দত্ত কিছুদিন চৌরঙ্গির 'সমবায় ম্যান্‌সন্‌' (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে অবস্থিত ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ.-র সামনে 'ওল্ড্‌ হিন্দুস্থান বিল্ডিং')-এ অতিবাহিত করেন। 'সমবায় ম্যান্‌সন্‌' থেকে তিনি এলেন মাতুলালয়ে।[২] প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, রবি দত্তের স্বদেশে ফেরার আগের বছরে তাঁর মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্র গত হয়েছেন (৩ মে ১৯০২ খ্রী)। কয়েক মাস বেশ কাটল। তারপর তাঁর জীবনে নেমে এল কৃষ্ণময় সব দিন। নিঃসাড় নৈরাশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করল। যদিচ তাঁর বিদ্যাচর্চা, কাব্যরচনা সবই চলল নিষ্ঠুর মানসিক অবসাদকে উপেক্ষা করে। এদিকে তাঁর পরিবারের লোকেরা সঠিক পরিচর্যার জন্যে রবি দত্তকে বরানগরের বাড়িতে আনলেন। আগেই বলা হয়েছে, এই সময় তাঁর স্ত্রীকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে হিতে হল বিপরীত। মানসিক দিক থেকে রবি দত্ত আরও বিপন্ন হলেন। তারপর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মঙ্গলবারে ঘটল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! মঙ্গলবার বিকেল বেলা থেকে রবি দত্তকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল ; কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। পরের দিন তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল—শব হিসেবে। সমস্ত অবসাদ, বিষাদ শেষবারের মতো মৃত্যুর অতলে তলিয়ে দিয়ে রবি দত্ত খড়কুটোর মতো ভাসছিলেন তাঁরই বাড়ির পুকুরে।[৩] সম্ভবতঃ এই মুহূর্তে ভ্লাদিমির্‌ ভ্লাদিমিরোভিচ্‌ মাইআকভ্‌স্কির মতো

---

১ রবি দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপ্রশান্তকুমার দত্তের মুখে আমি একথা শুনেছি।

২ রবি দত্তের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীবিভাবতী বসুর স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই এই বিবরণী দেওয়া হল।

৩ **"The body of Mr. R. Datta, M.A. (Cantab.), was found floating in a tank near his home at Kasinath Dutt's Road, Baranagore, on Wednesday. Mr. Datta, who was formerly professor of Comparative Philology and English Literature at the Calcutta University had been suffering from mental derangement for some time, and had been missing since Tuesday afternoon. He had a distinguished scholastic career in Calcutta and at Cambridge, and was only thirty-four."—*The Amrita Bazar Patrika*. Saturday, December 1, 1917.**

রবি দত্তও বলতে চেয়েছিলেন : "No more tittle-tattle, the dead man abhored that." বস্তুতঃ এই নিষ্ফল মৃত্যু আমাদের সেই প্রাচীন প্রবাদটির যাথার্থ্য স্মরণ করায়—"Quem di diligunt, adolescens moritur" যার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছিলেন লর্ড বায়রন্ "Whom the gods love die young."

তিন

ইঙ্গ বঙ্গীয় তথা ইঙ্গ ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের ধারায় রবি দত্তকেও এক অন্যতম দিশারী বলা চলে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই এদেশে ইংরেজীতে কাব্যরচনার সূত্রপাত।[১] তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, সারোজিনী নাইডু, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হলেন রবি দত্তের পূর্বসূরী। বলা যায়, তরু ও অরবিন্দের মতো তিনিও ভারত-মাহাত্ম্যকেই মুখ্যতঃ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে অব্যাহত রাখেন। তাঁর এই স্বদেশপ্রেম কৈশোরেই অঙ্কুরিত হয়। বৃহত্তর বিশ্বের সামনে স্বদেশ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির উপস্থাপনে তিনি ছিলেন যত্নবান্। যদিচ এমতো গুরুভার দায়িত্বে যে স্থৈর্য ও নিদিধ্যাসন অপরিহার্য ; জীবনচর্যার আকস্মিক বিপর্যয় বুঝি বা তাঁকে শেষাবধি প্রশান্তির পরিবর্তে বিভ্রান্তির দিকে অধিকতর ঠেলে দেয়। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিমিতি ও পরিপুষ্টির কথাটিও স্মর্তব্য। অতএব অভিজ্ঞতার আততি তথা অতীন্দ্রিয় অন্বেষণের অমেয়তা রবি দত্তে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।

বারো বছর বয়স পূর্ণ না হতেই রবি দত্ত ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা রচনায় নিরত হন। উনিশ বছরের আগেই লাতিন ও ফরাসীসে কবিতা লেখার এক দুর্মর লোভও তাঁকে পেয়ে বসে।[২] রবি দত্তের কাব্যার্চনার কাল কার্যতঃ ১৮৯৬-১৯০২ খ্রীস্টাব্দ ; অর্থাৎ তেরো থেকে উনিশ বছরের মধ্যেই তাঁর কবিকল্পনা শান্ত ও অবসিত হয়। ১৮৯৬ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে লেখা সাতাশটি গীতিকবিতার একটি সংকলনে[৩] কবির বিভিন্ন সময়ের মানসিকতা, উপলব্ধি ও চিত্তবৃত্তির পরিচয় মেলে। এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ তথা নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন :

"Some are what I call 'pure poems', others are intended to show 'word-painting', and others again are designed to produce 'word-singing' ; hence the name given to the volume, and hence the idea of prefixing 'The Philosophy of Art' to it."

---

১ উৎসুক পাঠক এ প্রসঙ্গে লেখকের 'মনোমোহন ঘোষ : শতবর্ষের আলোকে' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬) প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

২ রবি দত্তের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুটিতে সন্নিবিষ্ট তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এই তথ্যাদি মেলে।

৩ Roby Datta : *Poems, Pictures and Songs to which is prefixed. The Philosophy of Art.* Das Gupta & Co., Calcutta 1915.

নৈসর্গিক শোভা, দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চেতনা, নারীর সৌন্দর্য, শিব ও সত্যের অনুভূতি এবং আত্মার অব্যক্ত সব জিজ্ঞাসা – সংবেদনশীল কবিস্বভাব স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে বলা যায়, শুদ্ধ করে তুলেছে। রবি দত্তের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস এবং কবিমানসের বৈচিত্র্য ও বৈভবে সাম্প্রতিক পাঠক প্রলুব্ধ হবেন কচিৎ ; তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে, বিভিন্ন প্রকারের আঙ্গিক ও ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও উৎকর্ষ কবিতাপ্রেমিক পাঠকের ঔৎসুক্য জাগায়। অনেক সময় তাঁর কবিতার বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক নৈপুণ্য বাংলা ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ করায়।[১] শব্দ তথা অভিধার অন্তঃশীলা সংযোগ, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ছন্দের শোভনতা কোনও কোনও সময় তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে ধ্বনি ও বর্ণময়ী। প্রসঙ্গতঃ *The Philosophy of Art*[২] প্রবন্ধে কবিতার ধর্ম সম্পর্কে রবি দত্তের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

"A keen emotion, a lively fancy, a fervid yearning for the good, true, and the beautiful ; the power of assimilating and collocating beauties ; a grasp of the *enjoyable* and *instructive* element in what we see, hear, feel around us ; a ken deep as philosophy, intangible as a dream, yet vivid in the perception of what it creates for itself ; a faculty of *Communion* with nature physical and human..."

কবির উপর্যুক্ত ব্যক্তব্যটি তাঁর স্বরচিত কবিতা বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করা চলে। তাঁর বিভিন্ন গীতিকবিতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"Athwart the orchard, line on line,
New lustre, life and vigour shine ;
Mad Flora waking opes her eyes
To greet young Zepyr in her dyes."

[On the High Hills]

"Was man for war alone created ?
Or did his Maker give him eyes
That he, his sight thus satiated,
Might take a rifle's aim precise ?

[The War-Hater]

"Boating with the Stream,
Like a floating dream,
O whither away so fast ?—

১ শ্রীপ্রশান্তকুমার দত্তের মুখে শুনেছি রবি দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল।

২ রবি দত্তের *The Philosophy of Art* প্রবন্ধটি *The Calcutta University Magazine* (মতান্তরে ১৯০২)-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

Whither, with the gleam
Of tangled hair
About thy Spangled bosom cast ?"
[The River-Daughter

"O deck his hearse with bloom, and drawn the day
In tears : alas, dread Time's unpiteous wheel
Knew not the flower of life it cut away ?"
[A Sonnet on the Death of a Songster]

রবি দত্তের *Stories in Blank Verse*-এ মহাকাব্যের এক অসমপূর্ণ অংশ হিসেবে 'The Ceylaniad' সংযুক্ত হয়।[১] এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকালও মূলতঃ ১৮৯৭-১৯০১ খ্রীস্টাব্দ। 'গ্রেস্ ডালিং'-এর মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত হল 'The Heroic Maid'; 'রামায়ণ'-কে কেন্দ্র করে চিত্রিত হয়েছে 'The Exile of Sita' ও 'The Spirit of Valmiki'; 'কাদম্বরী'-র কাহিনী থেকে মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের প্রণয়বৃত্তান্ত রূপ পেল 'The Story of Mahasveta' ও 'The Story of Pundarik' কাব্যাকৃতিতে। শেষোক্ত কবিতা দুটি যথাক্রমে *The New India* (১৯ ও ২৬ জুন ১৯০২ খ্রী) ও *The dawn* (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রী)-এ প্রকাশিত হয়। সুপরিচিত আখ্যানগুলির নবতর কোনও ব্যাখ্যান, বৈচিত্র্য ও বিস্তারে যদিচ কবিকল্পনার মুক্তি মেলে না; তৎসত্ত্বেও বলা চলে, গীতিকবিতায় আবেগকল্পিত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহজ, সরল ভঙ্গিতে গল্প বলায় তাঁর ছিল অধিকতর আসক্তি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতিতে জন্ মিল্টনের চেয়ে লর্ড টেনিসনের প্রভাবই রবি দত্তে প্রকটিত। 'The Ceylaniad'-এর উৎস হল 'মহাবংশ'-এর আখ্যান। 'আইনেঙ্গিস্' ও 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' অনুসরণে দ্বাদশ সর্গে একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা কবির ছিল। বলা বাহুল্য 'The Ceylaniad'-এর অসম্পূর্ণতার সঙ্গে তাঁর সে সাধ অপূর্ণই থেকে গেছে।

Poems, Pictures and Songs এবং *Stories in Blank Verse* সম্পর্কে দুজন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্বের দুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধার করছি। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ উইলিয়ম আর্চার কবিকে জানান: "They seem to me to show a great deal of imagination, and remarkable fluency and facility of expression.[২] উইলিয়ম্ ব্যট্লর্ য়েট্স্ (১৩ জুন ১৯১৬ খ্রী) রবি দত্তকে লিখলেন: "You have a beautiful land I write of, and you write of it with ardour and affection, and I thank you for your little works. You have an admirable mastery of English." [৩]

১ Roby Datta: ***Stories in Blank Verse to which is added An Epic Fragment.*** **Das Gupta & Co., Calcutta 1915.**

২ রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণীতে উদ্ধৃত।

৩ ***Ibid.***

'কৈশোরক'[১] কাব্যগ্রন্থে রবি দত্তের ছটি বাংলা কবিতা (স্বপ্ন, প্রভাত, আশা, ভারতের দশা, মধুমাস ও মেঘের বারতা) ঠাঁই পেয়েছে। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৯৭-১৯০২ খ্রীস্টাব্দ। কবির তেরো বছর বয়সে সংস্কৃতে লেখা 'নন্দসংহারং মহাকাব্যম্'-এর প্রথম সর্গটিও এই কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হয়। 'কৈশোরক'-এর পিছনের মলাটে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, 'রামের বনগমন,' 'রাবণবধ,' সীতার পাতালপ্রবেশ,' 'পাণ্ডবনির্বাসন,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'স্বর্গারোহণ' নামে ছখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রকাশনের পরিকল্পনা রবি দত্তের ছিল। প্রস্তুতিপর্ব নিঃসন্দেহে চলেছিল কিছুকাল। তবে বেশিরভাগ নাটকই 'নন্দসংহারং মহাকাব্যম্'-এর মতো তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন।

চার

পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাগুলি থেকে রবি দত্ত কর্তৃক অনূদিত বৃহৎ এক কবিতার সংকলন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; কবিতা অনুবাদ ছাড়াও এই সংকলনে সংযুক্ত হয়েছিল কবির স্বরচিত চোদ্দটি কবিতা।[২] বস্তুতঃ চোদ্দ থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত রবি দত্ত যে সমস্ত দেশীবিদেশী কবিতার তরজমা করেন এই সংকলনে সেগুলি স্থান পায়। সংস্কৃত, পালি বাংলা, জন্দ্, গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, প্রভঁসাল, ফরাসীস, হিস্পানী, পর্তুগীজ, গের্মনীয় ফ্রিজিক, ডচ্, আইস্ল্যাণ্ডিক ও ইংরেজী এই ষোলটি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা থেকে দু'শ তেইশটি কবিতা তিনি উপহার দিলেন কবিতাপ্রেমিক পাঠককে। অনুবাদে মূলকাব্যের রসসঞ্চার, বৈদগ্ধ্য ও সৃজনশীল সঙ্গতি যে কোনও দেশের পাঠকই বিস্মিত হবেন। সংকলনটির মুখবন্ধে রবি দত্ত লিখেছেন:

"The aim of the 'Echoes from East and West' is to produce on an English gramophone some of the finest records of Indo-European songs It is to wake up at a grind the 'music of the moon' that slept 'in the plain eggs' of that 'nightingle' enveloped in the mist af ages, primitive Aryan of Mid-Asia, whose natural and adopted offspring are scattered over five continents. It is to bring together the voices of some of the Indic, Persic, Hellenic, Italic, Romance, and Teutonic makers of melodies, so that the only notable nestlings here silent are those that chirped through Celtic and Slavonic tongues,"[৩] এই প্রকাণ্ড সংকলনটির

১ রবি দত্ত: কৈশোরক। দাসগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯১৫।

২ Roby Datta: *Echoes from East and West to which are added Stray Notes of Mine Own.* Galloway and Porter, Cambridge 1909.

৩ *Echoes from East and West*এর শুদ্ধিপত্রে অপ্রকাশিত যতিচিহ্নের যথাযথ উল্লেখ মেলে রবি দত্তের ব্যক্তিগত কপিটিতে। অতএব এই সংকলনটির উদ্ধৃতিগুলি উক্ত কপিটি থেকেই দেওয়া হল।

একটি বৈশিষ্ট্য হল অনুবাদক প্রতিটি অনুবাদের শেষে কিছু কিছু মন্তব্য যোগ করেছেন। অনুবাদকের এই ভাষ্য অনুধাবন ব্যতিরেকেই বলা যায়, এই সংকলনে বিশ্বকবিতার তুলনামূলক পরিচয় পাঠকের কাছে এক প্রেয় অভিজ্ঞতা।

দেশীবিদেশী বহু বিদ্বজ্জন এই সংকলনটির তারিফ করেন। রবি দত্তের অনুবাদ সম্পর্কে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছিলেন (১৬ ফেব্রুআরি ১৯১৫ খ্রী) :

"চূড়ান্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং দুরূহ ছন্দ প্রকরণের ওপর তাঁর দখল ও নিপুণ ব্যবহারের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র ছন্দঃতত্ত্বের কলাকৌশলে তাঁর নৈপুণ্য পাঠককে চমৎকৃত করে না, তিনি মূলের প্রাণ আর প্রাণের ক্রিয়াটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছেন ; বিশেষতঃ যেখানে মূলের মধ্যে প্রাচীন ঋজুতা বা মধ্যযুগীয় মাধুর্যসঞ্চার নিঃশ্বসিত সেখানে তিনি সফল।" [১]

কেমব্রিজের এম্যানুএল্ কলেজের ক্ল্যাসিক্যল স্কলার ই. জে. টমাস্ (২০ ফেব্রুআরি ০৯ খ্রী) অনুবাদককে লিখলেন :

"আপনার এই অনুবাদ-সংগ্রহ বিস্ময়করভাবে আকর্ষণীয়। এখন বেদগান আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। বাংলা কবিতাবলীর মূলগুলি সম্বন্ধেও আমি কথঞ্চিৎ জানতে উৎসুক। আপনার 'The Weird Wheel of Simaetha' অনুবাদের পরিকল্পনা হেডল্যামের পরিকল্পনার থেকে আমার বেশী ভাল লেগেছে। আর আমার এই ভাল লাগার অর্থ হেডল্যামের মতামত অপেক্ষা অনুবাদকরণের যে সাধারণ তত্ত্ব আপনি উপস্থাপিত করেছেন সেটির সঙ্গে আমি আরও বেশী একমত।" [২] *The Cambridge Daily News* ১৯ জুন ১৯০৯ খ্রী) মন্তব্য করেন :

"Recent issues of Cambridge talent are mostly poetical, and among he versifiers, presumably *in statu pupillari*, the chief honour must undoubtedly be given to Mr. Roby Datta, an Indian student, whose voluminous 'Echoes from East and West' (Galloway and Porter) reveals to the full that amazing genius for adaptability which has long been so salient a characteristic of Eastern minds. One would be tempted to say that our poet had read everything and assimilated more than he has read." [৩]

দীনবন্ধু সি. এফ. এনড্রুজের অভিমতটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :

"আমার চোখের সামনে একটি বই দেখছি ; এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে (*Echoes from East and West* অবশ্য মুদ্রিত হয়েছে ১৯০৯ খ্রী) ; এবং এটা খুবই অবাক

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ রবি দত্ত অনুদিত *Sakuntala and Her Keepsake* (Das Gupta & Co., Calcutta 1915) গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত।

৩ *Ibid.*

ব্যাপার যে এই বছর কেম্‌ব্রিজে আসার আগে এর অস্তিত্বই আমি জানতাম না। এবং এটাও অবাক ব্যাপার যে আমি যতদূর জানি, ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলিও এর কোনও খবর জানত না। এর কারণ এই নয় যে এই তরুণ রবি আদৌ স্বাজাত্যচ্যুত হয়েছেন অথবা বিদেশী শ্রোতৃবর্গের জন্য সখের কাব্যবিলাসে রত। এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় ভারতভক্তি প্রকাশিত। বৃহত্তর বিশ্বের সামনে স্বদেশকে উপস্থিত করার জন্য তিনি প্রেমিকের প্রযত্নে এই কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন। যখন ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি এসেছেন তখনই তাঁর কবিতা শিখার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই সংকলন আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে তার প্রতিদানস্বরূপ এই বিলম্বিত শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে আমি তৎপর হতে চাই। ইংলণ্ডে এই গ্রীষ্মে সংকলনটি আমার সঙ্গী হয়েছে; সূর্যহীন মেদুর দিনগুলিতে এই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমার যাত্রায় এটির সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য, বেদনা ও মাধুর্যমিশ্রিত স্বপ্নলোকটি এই সংকলনের মধ্যে দিয়ে বারবার আমার মনে জাগরূক থেকেছে।" [১]

এবার রবি দত্তের অনূদিত কতিপয় কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব বা ভগবদ্‌গীতার একটি অতিপরিচিত অংশ এইভাবে অনূদিত হয়েছে :

"He who deems the soul a Killer, he who deems it kill'd again,
Neither of them seeth rightly, for it slays not, nor is slain.
And 'tis never born, it dies not ; was not born, nor will be so ;
Birthless, changeless, prime, eternal, deathless, tho' the frame may go.
How can he who knows it to be deathless, birthless, free from wane
How can he O son of Pritha, stay one, cause one to be slain ?
As a man leaves ragged garments and resorts to newer clothes,
So the soul leaves worn-out bodies and to newer bodies goes.
It cannot be cleaved by weapons, it cannot be burnt by fire,
It cannot be spoilt by water. it cannot be dried by air ;
It cannot be cleaved or burnt out, it cannot be spoilt or dried,
Present ev'rywhere, eternal, firm, unmoving, sure to bide ;
It cannot be felt or thought of, it cannot be changed, 'tis shown ;—
Wherefore, knowing thus its nature, it behoves thee not to groan."

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ মাত্র ষোল বছর বয়সে রবি দত্ত এই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন। তরজমা সত্বেও শুধু বিষয়মাহাত্ম্যে নয়, প্রকাশভঙ্গীর অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্যেও ম্যাসেলস্ অ্যাকরক্রম্বীর সংজ্ঞায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রচনাটি high poetry-র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

---

১ C. F. Andrews : *A Young Bengali Writer*. The Modern Review, February 1916.

কিংবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাটির প্রথম স্তবকটি :

"No mother thou, no daughter thou, thou art no bride
O maiden fair and free,
O habitant of Nandan Urvasi !
When Eve on cattle-folds doth light, her frame all tired,
with down-drawn golden veil,
Thou, in a corner of some home, dost never light the lamp
of even pale ;
With feet in doubt all faltering, with trembling breast,
with lowly-fallen sight,
With smiles all soft, thou goest not, in bashfulness,
to bridal couch bedight
In the still heart of night.
As is the early rise of Dawn, a veilless maiden fair,
Thou art untroubled e'er."

বাংলা কবিতার আদি ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস অনুবাদে অনুবাদকের দুঃসাহস মুন্সীয়ানা চোখে পড়ে। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই রবি দত্ত এই ভাষান্তর করতে বসে স্কটল্যাণ্ডীয় বাচনের বিশেষ রীতি ও ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন বাঙালী কবির সুললিত পদাবলীর অনুবাদে :

"Shame O' mammie, Shame O' dad,
Shame O' people an' O' clax,
Come atween me an' my lad,
Whisper 'Lea'e thy dautit man'.
O the heavy heavy smart,
For wadna cease to feel
Something knockin' at my heart
For the lad I lo'e sae wheel !"

অনুবাদকের মুখবন্ধ পাঠে জানা যায়, পাঁচজন স্কটল্যাণ্ডবাসী অধ্যাপকের সহায়তায় কলকাতায় বসেই রবি দত্ত স্কটল্যাণ্ডীয় সাহিত্যের অনুশীলনে রত হয়েছিলেন। এবং সেই চর্চার ফলস্বরূপ আমরা পাই চণ্ডীদাসের কাব্যরস পরিবেশনের এই বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা।

রবি দত্তের *Echoes from East and West*-এ ঋগ্‌বেদ, কঠোপনিষদ্, রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, কালিদাস, ভবভূতি, ধম্মপদ, জয়দেব, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, অবেস্তা, হোমেরোস, আল্‌কায়স্, সাপ্‌ফো, আনাক্রেওন্, সিমোনিদেস্, পিন্দারোস্, সোফোক্লেস্, থেওক্রিতোস্,

প্লাউতুস্, লুক্রেতিউস্, কাতুল্লুস্, ইত্রগিলিউস্, হোরাতিউস্, ওভিদিউস্, দান্তে, পেত্রার্কা, আরিওস্তো, তাস্সো, ভিল, র্সার, কর্নেঈ, রাসিন্, মলিয়ের্, উগো, থের্বানতেস্, কামোঙ্শ, নিবেলুঙ্গেনলিট্, গোয়্টে, শিলর্, হাইনে, ফোগেল্, ক্যাড্মন্, কিনেবুলফ্, চসর্, স্পেনসর প্রভৃতি থেকে কাব্যরত্নরাজির কবিত্বসম্পন্ন অনুবাদ বর্তমান। এই বৃহদায়তন সংকলনটি পাঠান্তে পাঠক যুগপৎ উৎফুল্ল ও বিব্রত হন। উৎফুল্ল হওয়ার নজির ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ মিলেছে। অতএব এক্ষণে বিব্রতবোধের কারণ অনুসন্ধেয়। এমতো প্রয়াসে যে প্রক্রিয়া বা বলা যায়, পারম্পর্যপূর্ণ সংহত বিন্যাস অনিবার্য ; অনুবাদকের পরিকল্পনায় তা ছিল অনুপস্থিত।[১] বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এই ধরনের সংকলন যে আকার গ্রহণ করে *Echoes from East and West* তারই এক নিদর্শন। নিছক বহিরঙ্গের কতিপয় জরুরী নির্দেশাদির অনুপস্থিতিই এক্ষেত্রে প্রকট নয় ; কবিতা নির্বাচনের বিষয়ে অনুবাদকের অবহিতির অভাব অবিচ্ছিন্ন অনুভূত হয়। যদিচ রবি দত্ত উক্ত সংকলনের মুখবন্ধে আমাদের অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন, সন্দেহ নেই ; তৎসত্ত্বেও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করেই বলা চলে, এই সংকলন পাঠককে প্রাণিত করার চেয়ে চমকিত করে অনেক বেশি। বলা বাহুল্য এই বিস্ময়ের কারণ হল প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহুবিধ কবিতার সুললিত ছন্দোবদ্ধ অনুবাদের বিচিত্র সমাবেশ। অধুনা সচেতন পাঠকের তাই এমনতর ভাবনা অযৌক্তিক নয় যে সৎকবিতার একটি পরিচ্ছন্ন চয়নিকা সম্পাদনা অপেক্ষা অনেক অনুজ্জ্বল-অত্যুজ্জ্বল কবিতার এক প্রকাণ্ড সংকলন প্রকাশনাতেই তাঁর ছিল অধিকতর আগ্রহ। অতএব নির্বাচিত পঙ্ক্তিগুলিতে পাঠক আদৌ আক্রান্ত হবেন কিনা সেকথা বুঝি বা রবি দত্ত কদাচ ভাবেন নি। কার্যতঃ এই অনুবাদ সংকলনকে বিভিন্ন প্রধান ভাষার কাব্যসম্পদের ইংরেজীতে তরজমারই এক বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। সর্বোপরি সংকলনটির পরিণত পর্যায়ে উন্নত না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ অনুবাদকের অপরিণতবুদ্ধির অস্থিরতা। কবিতার দৈহিক শোভাবর্ধনে রবি দত্তের অত্যধিক আসক্তি মূল কবিতার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকে করেছে বিপর্যস্ত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই সংকলনের শুরুতে যে কবিতাটি (মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ থেকে) ঠাঁই পেয়েছে তার অনুবাদ রবি দত্ত মাত্র চোদ্দ বছরেই সম্পন্ন করেন। কৈশোরে নিষ্পন্ন আরও কিছু কবিতাও এই চয়নিকায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ অনুবাদকর্ম অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে। আগেই বলা হয়েছে, এই বছর তিনি আইনশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। সুতরাং শিক্ষায়তনগত সাফল্যলাভ করাকালীন মানসিক উত্তেজনা তথা তরুণ অস্তিত্বাশ্রিত উত্তাপের উপর্যুপরি উপসর্গে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে রবি দত্তের ধ্যানধারণা আরও কিঞ্চিৎ শোধিত হলে ভাল হত। কেননা

১ "It shows Roby Dutt (sic)'s wonderful scholarship and linguistic abilities, but the book lacks order and sequence, and the translations from different languages in different kinds of verse are presented pell-mell. Besides the translations are too short to give an adequate idea of the original."—Lotika Basu : *Indian Writers of English Verse.* Calcutta 1933.

ক্বচিৎ তিনি ভেবেছিলেন যে ইংরেজী ভাষার ঐশ্বর্য যতই থাকুক না কেন প্রাচ্যপ্রতীচীর তাবৎ কাব্যার্চনার মাধ্যম হওয়ার সামর্থ্য ইংরেজী বা আধুনিক য়ুরোপীয় কোনও একটি ভাষার নেই। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও *Echoes from East and West* বিশ্বকবিতা সংকলনের ধারায় এক স্তম্ভস্বরূপ। ফলতঃ বিশ্বভাষায় উৎসুক, কবিতাপ্রিয় পাঠকের কাছে এই সংকলন আজও আকর্ষণে ভরা।

Echoes from East and West প্রকাশিত না হলেও জানা যায়, প্যার্সি বিশ্ শেলীর 'Lines (*sic*) written in Dejection near Naples' কবিতাটির একটি লাতিন অনুবাদ রবি দত্ত করেন (জুলাই ১৯০৭ খ্রী)। এবং তাঁর ওই প্রকাণ্ড অনুবাদ সংকলনটির পরিশিষ্টে পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের কিছু তরজমা সংযুক্ত করার সাধও সম্ভবতঃ রবি দত্তের ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত কপিটি পরীক্ষা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি। শেলীর অমর গীতি-কবিতাটির রবি দত্ত-কৃত এই লাতিন অনুবাদের সার্থকতা বিচার করা বর্তমান লেখকের বিদ্যায়ত্ত নয়। লাতিনের মতো সুপ্রাচীন দুরূহ ভাষাতে এই স্বচ্ছন্দ বিহারের যথাযথ মূল্যায়ন যাঁরা করতে পারেন তাঁদের জন্যে এই অনুবাদটির কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি :

"Fervida lux solis caeli per clara refulget,
In laeto Thetidis corruit unda sinu.
Caerula cincta mari terra ac nive candida rupes
Purpureum medio sole micante madent.
Humidus en Florae Zephyrus suspiria tractat,
Quamvis infanti languidus ipse procus.
Voces ut vocem multae miscentur in unam,
Sic venti volucres aequora dulce sonant."

পূর্বেই বলা হয়েছে রবি দত্তের অনুবাদ সংকলনে তাঁর স্বরচিত চোদ্দটি কবিতা স্থান পায়। কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির পক্ষপাত স্বাভাবিক। এবং সংকলনটির মুখবন্ধ পাঠে পাঠকের এই ধারণা স্পষ্টতর হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, পরবর্তীকালে ই. এ. হেল্পস্ সম্পাদিত *Songs and Ballads of Greater Britain*-এ তাঁর অনূদিত দুটি কবিতা 'Good and Bad Thoughts' ও 'A Song of Ind' (রবীন্দ্রনাথ) এবং স্বরচিত 'On Tibet' কবিতাটি নির্বাচিত হয়।[১] আর রবি দত্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে থেওডোর্ ডাগ্‌লাস্ ডান্ সংকলিত *The Bengali Book of English Verse* গ্রন্থে তাঁর স্বরচিত 'On Tibet' কবিতাটিসমেত চারটি কবিতা ঠাঁই পায়।[২] প্রসঙ্গক্রমে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে লেখা রবি দত্তের 'An Idea' (*An acrostic on an imaginary name*)-র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"M eek and true thou art, O Marie,
A nd thy dear dominion's sweet ;

১ E. A. Helps : *Songs and Ballads of Greater Britain.* London 1918.
২ Theodore Douglas Dunn : *The Bengali Book of English Verse.* Calcutta 1918.

R ustling thro' my heart, O fairy,
I can hear thy pinions beat,
E ven I, so nigh they meet.
F ree thy gaze ; intense the kiss is
O f thy tempting lips aflame ;
R are thy ways ; immense the bliss is,
S o exempting slips from blame,
T o be by and sigh thy name.
E ver should divine devotion
R ouse my mood to thine emotion."

নিছক একটি কাল্পনিক নামকেই কেন্দ্র করে এই চিত্রকাব্য বা ছন্দোবদ্ধ ধাঁধা রচিত ; কিংবা যথার্থই ম্যারি ফস্টর্ একদা কবির জীবনে এসেছিলেন সে রহস্যময় তথ্য জানার উপায় আজ আর নেই। অবশ্য একথা আগেই বলা হয়েছে যে প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি এক প্রেমে ব্যর্থ হন।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের রবি দত্ত কর্তৃক কাব্যময় গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১] অনুবাদকের মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনালয় আর্থার সাইমন্সের মারফত রবি দত্তকে এই অনুবাদকর্মের অনুরোধ জানান। মাত্র তিনমাসের (১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯০৮-এর জানুআরি) মধ্যেই তিনি শকুন্তলার অনুবাদ সমাপ্ত করলেন। আর অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে সাইমন্স্ সাহেব সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করে একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে এই অনুবাদের প্রকাশনা সে সময় সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গতঃ আচার্য হরিনাথ দে-র শকুন্তলার দুটি অঙ্কের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদের কথা মনে পড়ছে।[২] রবি দত্তের এ-বিষয়ে মনোনিবেশ করার কয়েক মাস আগে হরিনাথ তাঁর এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। হরিনাথের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা পাঠে জানা যায়, মূলতঃ দুটি কারণে তিনি এই অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছিলেন। হরিনাথের মতে শকুন্তলা একখানি গীতধর্মী নাটক যার সঙ্গে তাস্সোর আমিনতা বা গুআরিনির পাস্তর্ ফিদোর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যদিচ এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের কেউই অবহিত ছিলেন না। সর্বোপরি শকুন্তলার দুটি ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে হরিনাথ ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। কেননা জোন্সের তরজমা বর্তমানে অচল ; আর মনিয়র্-উইলিয়মসের ভাষান্তর মিকলের অস্ লুসিআদাস্ অনুবাদের মতো মারাত্মক সব ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। অতএব ইংরেজীতে নির্ভরযোগ্য শকুন্তলা অনুবাদের অভাব অনুভব করেই হরিনাথ এ বিষয়ে যত্নবান হন।

১ **Roby Datta : *Sakuntala and Her Keepsake* (Rendered from the Sanskrit Play of Kalidasa). Das Gupta & Co., Calcutta 1915.**

২ **Harinath De : *Kalidasa's Sakuntala : A Metrical version* (Act I & II with an introduction). Calcutta 1907.**

অনুবাদসংলগ্ন টীকাগুলিও তাঁর মূল্যবান্। রবি দত্তের অনুবাদে বলা বাহুল্য, এই ধরনের কোনও ভূমিকা বা টীকা নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা একথা ভেবেই উৎফুল্ল যে তিনি শকুন্তলার অনুবাদটি সম্পূর্ণ করে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই অনুবাদ সম্পর্কে সাইমন্স্ সাহেব অনুবাদককে লিখেছিলেন (১৯০৮ খ্রী):

"You are a real poet, and have a wonderful command of the English language. Your 'Sakuntala' is far superior to the two English versions [of Jones and Monier-Williams]...It will take rank among the best translations in English literature.

"Your work is a masterpiece."[১]

সাইমন্স্ সাহেবের ফরাসীসে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোনও প্রতর্কের অবকাশ নেই ; তবে সংস্কৃতে আদৌ তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই হয়তো সন্দেহ আছে। এবং প্রথাসিদ্ধ প্রশংসাবাদেরই সম্ভাবনা এক্ষেত্রে অধিক। কারণ ইঙ্গবঙ্গীয় তথা ইঙ্গভারতীয় কবিকুল সম্বন্ধে সহৃদয় কতিপয় ইংরেজ বিদ্বজ্জন এলোমেলো সব বিশেষণে বিভূষিত করে যেভাবে সহজে দায় চুকান তাতে যথার্থই সংশয়ী হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে সাইমন্স্ সাহেবের উক্তি সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও অংশতঃ সত্য।

শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদেরও বিস্ময়ের বস্তু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই অঙ্কের আশ্চর্য নাটকীয় সৌন্দর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই অংশের রবি দত্ত কৃত অনুবাদ কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি :

"**Veikhanasa** (*Lifting up his hand*). [Ho ! ho !] thou King !
this deer of the hermitage must not, must not be killed !

Thou must never, never surely,
let fall thy dart on yonder
Deer's all easy-yielding body,
like fire on down in masses !
Where, alas, the life all fickle
of hapless stags ! and ponder
Where, again, thy shafts sharp-falling,
whose strength no thunder passes !
So, duly join'd unto the bow,
O put away thine arrow bright ;
Thy weapon is to succour woe,
And never innocence to smite."

১ *Sakuntala and Her Keepsake* গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত।

উপর্যুক্ত অংশটির অনুবাদ আচার্য হরিনাথ দে এইভাবে করেছিলেন :

"**Hermit**

[*Raising his hand.*]

Here me, O noble king, this deer
Comes from our hermitage. From frame
So tender, pray, avert your showers
Of arrows. Were it not the same
To pour hot flames on a heap of flowers ?
To think that a feather'd steel-head dart
Should transfix a gentle hart !
'T were better, sure, your arrows went
Back to their quiver. Those arms are meant
To champion sufferers, not to torment
The creatures that are innocent."

টমাস্ স্ট্যার্নস্ এলিয়ট একদা মন্তব্য করেছিলেন, মাঠো কবিদের পক্ষে সমালোচক হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্ম। কবি হিসেবে যথার্থ প্রতিভার অধিকারী যাঁরা নন অথচ কাব্যরচনার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে শক্তিধর অনুবাদক হিসেবে তাঁরা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করতে পারেন। রবি দত্তের সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ এই বক্তব্য প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় তাঁর কাব্যার্চনার কৃতিত্ব সামান্যই। তার ইংরেজী কাব্যরচনাও কালের বিচারে সার্থকতার দাবী করতে পারে নি। তাঁর কাব্যরচনার প্রয়াসের মূলে ছিল সাহিত্য ও ভাষাচর্চার প্রেরণা। তবে অনুবাদক হিসেবে রবি দত্ত অনুবাদ-সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গৌরবময় স্থান পাওয়ার যোগ্য।

পরিশিষ্ট

[১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রবি দত্ত লিখিত তাঁর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এই প্রশংসাপত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। দাসগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং থেকে তাঁর প্রকাশিতব্য কোনও গ্রন্থের পরিশিষ্টে এগুলি ব্যবহার করার বাসনা রবি দত্তের ছিল। মূল শংসাপত্রগুলির অধুনা হদিস মেলা ভার। তবে এ বিষয়ে শ্রীপ্রশান্তকুমার দত্তের সঙ্গে আলোচনা-সূত্রে জানা যায় যে একদা তিনি কতিপয় মূল প্রশংসাপত্রের দর্শনলাভ করেছিলেন।]

SENATE HOUSE, the 4th August, 1904.

This is to certify that Rabindranath Datta, a matriculated student of this University, has in accordance with the Regulations (1) Studied for four academical years at two institutions for the education of adult students affiliated up to the B. A. Standard ; (2) Passed the

Entrance Examination and the First Examination in Arts in the First Division, and also the Examination for the degree of Bachelor of Arts with Honours in English and Sanskrit. He has also passed in Sanskrit at the Examination for the degree of Master of Arts.

In all the aforesaid examinations he satisfied the examiners in Sanskrit, having stood first in the subject at the First Examination in Arts, second at the Examination for the degree of Bachelor of Arts, and first at the Exmination for the degree of Master of Arts of this year.

Sd. K. C. BANURJI,
Registrar,
Calcutta University.

10th August 1904.

Certified that Rebindranath Datta, M. A., was a student of this College for a period of 3 years. He passed the B. A. examination of the Calcutta University from this College in the year 1903 with Honours in English and Sanskrit and obtained a graduate scholarship of Rs. 40 a month. He passed the M. A. examination in Sanskrit as a Private candidate in the same year in which '.e passed the B. A. examination, He completed his M. A. lectures in English in this College during the session 1903—1904.

His character and conduct while a student here were always good.

Sd. M. PROTHERO,
Principal, Presidency College

2, Salisbury Villas,
Cambridge.
Nov. II, 1909.

I beg leave to certify that Mr. R. Datta, B. A., of Christ's College, is known to me as a student of English literature, not only of the Elizabethan Drama, but of the middle English and Oldest English periods.

Whilst an undergraduate, he attended my lectures on Anglo-saxon, and he took the degree of B. A. in the Medieval and modern lenguages Tripos of 1906.

He has, further, a considerable acquaintance with the literature of various foreign countries, as shown by the numerous translations and adaptation given in his book entitled "Echoes from East and West."

I believe him to be well qualified to teach English literature.

Sd. Walter W. Skeat, Litt. D., D. C. L.,
LL. D., PH. D., F. B. A.

Elrington and Bosworth Professor of Anglo-Saxon in the University of Cambridge, and Fellow of Christ's College.

16th December, 1909.

I have much pleasure in stating that Mr. Rabindranath Datta was in residence at Christ's College from October 1904 to June 1906 and also during the Michaelmas Term 1908 and that his conduct during residence was in all respects very satisfactory.

He obtained his B. A. degree In June 1906 with Honours in the Medieval and Modern Languages Tripos.

I believe Mr. Datta to be a man of high principle and character, hardworking and conscientious and possessing considerable ability. I understand that he wishes to obtain a post in the Indian Educational Service and I desire heartily to recommend him as well fitted for such a post.

Sd, J. W, Cartmell, M. A,,
Tutor of Christ's College, Cambridge.

19th October, 1908.

Mr. R. Datta studied English Literature, Logic and Psychology with me during the autumn and spring of 1906-7 ; and left upon me an impression of great industry and good intelligence. He writes English very clearly and correctly, and ought to be quite capable of teaching Literature and composition.

Psychology is very difficult subject ; Mr. Datta, lernt more Logic and Psychology than most students are able to acquire ; and the knowledge he has of them should be very useful to a teacher or in the supervision of teachers.

To the best of my belief he would make a competent official in the Indian Educational Service.

Sd. Carveth Read. M. A. (Cantab.)

3, Powis Square, W.
14. 10. 1908.

Mr, R. Datta was my pupil from Michaelmas 1906 to Easter preparing for the I. C. S. Examination. He was a most satisfactory pupil in every way—very regular and diligent and of marked ability, His subjects were English, composition and Literature, Latin, French, Sanskrit, Logic and Psychology, Political Science, English and Roman Law, English and Roman History. The marks he gained in the I. C. S, examination are sufficient testimony to his knowledge of

most of these subjects. His knowledge of Franch, English Literature, Sanskait, Law and Political science is especially sound.

I shall be glad to answer any questions about Mr. Datta.

Sd. T. M. Taylor, M. A. (contab.),
Principal of Wren's
Late Fellow of Caius coll., (camb.)

20, Cornwall Road,
West Bourne Park, W.
October 18, 1908,

I am pleased to be able to say that R. Datta esq, read Latin with me at Wren's Powis Square, from Michaelmas 1906 to Easter 1907. During that time he showed himself uniformly diligent, intelligent and courteous. In the Civil Service Examiniation, Division I, he obtained 241 marks out of a possible 600, a very good achievement considering the severe standard of that examination, and the numerous other subjects that claimed Mr. Datta's attention at that time. From what I know of Mr. Datta I feel sure that he would prove a conscientious and trustworthy official in the educational Service ; and his politeness and considerateness would make him a very pleasant colleague to work with. I wish him every success, for I believe he deserves it.

Sd. E. J. Brooks, M. A.,
Once Fellow of St. John's College, Cambridge,
Classical Lecturer at Wren's, Powis Square, W.

Senate House. Calcutta.
The 16th February, 1915.

Mr. Roby Datta's "Echoes from East and West" and "Sakuntala rendered into English from Sanskrit play of Kalidasa" show that he is an adept in the art of metrical rendering. His wide command and deft handling of metrical forms, the most varied and the most difficult, cannot fail to be admired. But it is not merely his skill in the technique of versification that strikes the reader ; he is able to reproduce the life and breath of the original, especially where the latter breathes an air of archaic simplicity or mediaeval quaintness. The highest gift of scholarship is undoubtedly his : imaginative insight and an accomplished and catholic taste formed by familiarity with many models, oriental as well as classical, mediaeval as well as modern.

Sd. Brajendranath Seal.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ৪

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৪
১৩৭৪

গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

মধ্যযুগ এবং প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে প্রাক্-আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমস্ত সাহিত্যকীর্তির পশ্চাতেই, ধর্মীয় প্রত্যয় আবশ্যিক ভাবেই উপস্থিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের ভাব-উৎস এবং কাব্যরীতির প্রেরণার অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায় সকলেই সাধারণ ভাবে ভক্তি-ভাব সমন্বিত ধর্মীয় প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধর্মীয় প্রেরণার স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দাবী ও কয়েকটি অনুমান-ভিত্তিক আলোচনা ছাড়া সুষ্ঠু তথ্যভিত্তিক আলোচনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য নিবেদনের ও একটি বক্তব্যে পৌছবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনেকের মতে গীতগোবিন্দ রচনার পশ্চাতে কেবল শৃংগার রসাত্মক কাব্য রচনার ইচ্ছাই সক্রিয়। ভক্তি প্রেরণা, বিশেষ ভাবে কৃষ্ণভক্তি এক্ষেত্রে আশ্রয়-আলম্বন স্বরূপ। সমগ্র কাব্যের মধ্যে আদি রসের পরিপোষক আবহাওয়া ও বর্ণনার জন্যই এঁদের এবম্বিধ অনুমান। মঙ্গলাচরণ, দশাবতার বন্দনা ও হরিবন্দনার পর গীতগোবিন্দকার যখন মূল কাহিনী বর্ণনায় প্রবেশ করছেন, তখন কবি বলছেন :

> বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
> র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণম্।
> অমন্দকন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
> বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ১।২৭

বসন্তকালে [একদিন] বাসন্তী ফুলের মত সুকুমার অবয়বা রাধা প্রবল কন্দর্পজ্বর-জনিত চিন্তায় আকুল হ'য়ে কান্তারে বহুবিধভাবে কৃষ্ণানুসন্ধান করছিলেন, এমন সময়ে এক সহচরী সরসভাবে রাধাকে বললেন।

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণানুসন্ধানের কারণ 'অমন্দকন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তা'। আসলে প্রথমসর্গে প্রস্তাবনাতেই কবি বলে রেখেছিলেন যে, তিনি এই 'প্রবন্ধ'-গীত রচনা করছেন যার মূল কথাই 'বাসুদেব-রতিকেলি কথা'। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-গীতবিহার বর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, বিরহে অনঙ্গের আক্রমণ-বর্ণনা—মান ও অনুনয়েও অনঙ্গপীড়ার উল্লেখ, এবং শেষ পর্যন্তও সমৃদ্ধিমান

সম্ভোগের মিলনোল্লাস বর্ণনার জন্য ভক্তিভাবের চাইতে আদি রস সম্ভোগেচ্ছাই প্রবলতর বলে অনেকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এর জন্য দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। তবু দু একটি উদাহরণ আবশ্যিক ভাবেই তুলতে হয়। যেমন দ্বাদশ সর্গের মিলনোল্লাস বর্ণনা-কালে দ্বাদশ সর্গের দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকটি :

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্বল্লিরুৎ কম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসং স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২।১২

'রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে [শ্রীরাধা] তাঁহার বক্ষে আরোহণ পূর্বক সাহসভরে যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং নেত্র নিমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনও পুরুষোচিত কার্য সাধন করিতে পারেন?' [১]

কোনও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাই এই শ্লোকটি থেকে নির্গলিত করতে পারা যায় না। বিশেষত 'পৌরুষরসং স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি' এই মন্তব্যের ও কামকেলি পক্ষ ছাড়া অধ্যাত্ম পক্ষের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

এই সব কারণেই বহু বিদগ্ধ পাঠক গীতগোবিন্দকে নেহাৎই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন এক্ষেত্রেও ভক্তিভাব পরবর্তীকালে আরোপিত। বলা বাহুল্য, প্রথমে গীতগুলি রচনা করে পরবর্তীকালে শ্লোক সংযোজন করে গীতগোবিন্দ কাব্যখানি রচিত হয়েছে এই ধারণার মত আমরা পূর্বোক্ত ধারণাতেও সায় দিতে রাজি নই।

প্রথম সর্গের আরম্ভেই রাধামাধবের বিজনকেলির জয়যুক্ত হওয়ার প্রার্থনা, হরিস্মরণে মনকে সরস করার বাসনা থাকলে এই সুন্দর পদাবলী শ্রবণের উপদেশ, দশাবতার বন্দনায় ধৃত দশবিধরূপ জগদীশ কৃষ্ণকে নমস্কার, 'হরিবিজয় মঙ্গলাচারে'[২]—কৃষ্ণের জয়গান এইগুলি কাহিনীর সূচনা হ'লেও কবির ভক্তিভাবের অবিসংবাদী সাক্ষ্য। কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আরাধ্য দেবতার রতিকেলিকথায়—সুতরাং সেই কেলিকথার পোষক বসন্ত-বর্ণনা ও শৃঙ্গার প্রযত্ন বর্ণনা বিশেষ নিপুণতার সঙ্গেই করা হয়েছে। শৃঙ্গাররসমিশ্র ভক্তিভাবই তাই পরবর্তী বর্ণিতব্য বিষয়সমূহে প্রধান হয়ে ধরা পড়েছে। তাই দেখি তিনি 'অদ্ভুত কেশবকেলিরহস্যম্' সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বলছেন যে, 'সামোদ-দামোদর' হরি এই বসন্তকালে বিশ্বকে অনুরঞ্জনের

১ দ্রষ্টব্য : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ, 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্।' পৃ ১৪৯

২ মহারাণা কুম্ভ তাঁর 'রসিকপ্রিয়া' নামক গীতগোবিন্দের টীকা গ্রন্থের সমস্ত গান ও শ্লোকগুলির আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন। নামগুলি যেমন সুন্দর তেমনি তাৎপর্যবোধক। যেমন 'প্রলয়পয়োধি জলে' এই প্রথম গীতটির নাম 'দশাবতার কীর্তিধবল', দ্বিতীয় গীত 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' গানটির নাম 'হরিবিজয় মঙ্গলাচার', তৃতীয় গীত 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' গানটির নাম 'মাধব মহোৎসবকমলাকর'। তেমনি 'প্রত্যূহ পুলকাঙ্কুরেণ' শ্লোকের নাম 'সুরতারম্ভ চন্দ্রহাস', 'তস্যা পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো' ইত্যাদি শ্লোকের নাম 'কামাদ্ভুতাস্তিনব মৃগাঙ্ক লেখা'।

দ্বারা [স্ব-স্ব-বাঞ্ছাতিরিক্তরসপ্রদানপ্রীণনেনানন্দং হনয়ন][৩] আনন্দদান করতে এবং ব্রজ-সুন্দরীদের দ্বারা স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গিত হয়ে মূর্তিমান শৃঙ্গাররসের ন্যায় বিলাস করছেন।[৪]

সর্বদাই শ্রীরাধার প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ ক'রে তিনি প্রার্থনা করছেন স্মিত মনোহারী হরি আপনাদের রক্ষা করেন।[৫] এ প্রার্থনা নিছক কাব্যচাতুর্যমাত্র নয়। দ্বিতীয় সর্গেও দেখি 'অক্লেশকেশবের' পূর্বরাগ স্মরণ ক'রে এ কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধাও কেশবের লোকাতি-ক্রান্তি গুণাবলী স্মরণ করে বলছেন যে, কপোলে যাঁর মনোহর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডল সেই পীতাম্বরের আনুগত্য করেন মুনি, মনুসন্তান [=মানব], দেবতা ও অসুরকুলের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীগণও।[৬] 'কলিকলুষভয়' প্রশমনের ক্ষমতাও এঁর রয়েছে।[৭] আর কবিও ঘোষণা করছেন এই মোহন রূপ বর্ণনা পুণ্যবানদের হরিচরণ স্মরণেরই তুল্য।[৮] আমরাও বিশ্বাস করি যে এই কাব্যের প্রতিটি পদ, প্রতিটি গীত, প্রতিটি অলংকার ও ধ্বনিঝঙ্কার সবই যেন কৃষ্ণভক্তির থেকে উৎসারিত হয়ে কৃষ্ণপ্রণাম জানাচ্ছে বা কৃষ্ণপ্রশস্তির অনুকূলে অনন্য-মনোযোগে ধাবিত হয়ে চলেছে।

'অক্লেশ-কেশবে'র এই কীর্তি বর্ণনাকালেও জয়দেব জানাচ্ছেন যে উৎকণ্ঠিতা গোপবধূ বর্ণিত অতিশয়-নিধুবনশীল মধুরিপুর চরিত্র-গীতি সকলের হৃদয়ে সলীল সুখ বিস্তার করুক।[৯] আরও বললেন 'গমিতাকাঙ্ক্ষী' কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন।[১০]

রাধাবিরহে 'মুগ্ধ-মধুসূদন' ক্ষণিক বিচ্ছেদে নিবিড় চিন্তায় যেন সম্মুখেই তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন [দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি]।[১১] কংসারির এই রোদন বর্ণনা ক'রে কবি আবার প্রার্থনা করছেন তাঁর কটাক্ষ-ঊর্মি 'দধতুবঃ ক্ষেমং',—আপনাদের মঙ্গলবিধান করুন।[১২]

চতুর্থ সর্গে স্নিগ্ধ মধুসূদন সমক্ষে সখীবচন নিবেদন শেষেও তিনি বলছেন: কেশবপদে উপনীত ব্যক্তিদের সুখ প্রদান করুক তাঁর গান।[১৩] কৃষ্ণের যে বাহু বৃষ্টিব্যাকুল গোকুল-বাসীদের রক্ষার জন্য বীররসভরে গোবর্ধন ধারণ করেছিল, যে বাহু গোপিনীদের আনন্দচুম্বনে ললাটের সিন্দুরে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল সেই বাহু 'ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু',—আপনাদের মঙ্গল দান করুন।[১৪] রাধামিলনাকাঙ্ক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষের লীলাপ্রকাশক এই গানে সুকৃতকারীদের মনে হরি উদিত হোন, এই কামনা পঞ্চম সর্গেও করেছেন।[১৫] বলছেন: 'হরিসেবক' জয়দেবের বর্ণিত পরম রমণীয় এই গান আহ্লাদিত মনে সুকৃতকারীদের বাঞ্ছিত অতি সদয় হরিকে বন্দনা করুক।[১৬] প্রার্থনা করেছেন: 'অবতু ত্বং দেবকীনন্দন'।[১৭] জয় প্রার্থনা

---

৩ দ্রষ্টব্য: বালবোধিনী টীকা: পূজারী গোস্বামী: ১।৪৭ গীতগোবিন্দ।

৪ দ্রষ্টব্য: গীতগোবিন্দ, ১।৩৭ সংখ্যক শ্লোক।
৫ ঐ ১।৪৯ ,,
৬ ঐ ২।৭ ,,
৭ ঐ ২।৮ ,,
৮ ঐ ২।৯ ,,
৯ ঐ ২।১৮ ,,
১০ ঐ ২।২১ ,,

১১ দ্রষ্টব্য: গীতগোবিন্দ, ৩।৮ সংখ্যক শ্লোক।
১২ ঐ ৩।১৬ ,,
১৩ ঐ ৪।১৮ ,,
১৪ ঐ ৪।২৩ ,,
১৫ ঐ ৫।৬ ,,
১৬ ঐ ৫।১৬ ,,
১৭ ঐ ৫।২১ ,,

করছেন কৃষ্ণের অভিপ্রায়যুক্ত বাক্যাবলীর।[১৮] 'হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী'—স্বয়ং ব্যবহৃত এই স্ব-বিশেষণও কি পূর্বোদ্ধৃত বিষয়ের মত তাঁর একান্ত ভক্তিভাবের প্রকাশ নয়?[১৯] ঠিক তেমনি ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়—তাঁর গান কলিকলুষকে পরিশমিত করুক এই প্রার্থনায়।[২০] মাঝে মাঝে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে :

ইহ রসভণনে কৃতহরি গুণনে মধুরিপুপদ সেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে।। ৭।২৯

'মধুরিপুর পদসেবক' কবিনৃপ জয়দেবের এই রস [শৃঙ্গার রস] বর্ণনাও হরির গুণবর্ণনাকে কলিযুগোচিত পাপ স্পর্শ করতে পারে না। ৭।২৯

কখনও বলছেন শ্রীরাধার গানের সঙ্গে হরিও আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন।[২১]

সপ্তম সর্গে 'নাগরনারায়ণ' কথা দিয়েও রাধামিলনার্থে এলেন না। এই কারণে খণ্ডিতা রাধার বিলাপ বর্ণনা করে সর্গ শেষের মঙ্গল প্রার্থনা করছেন রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করে। এ প্রসঙ্গে পূজারী গোস্বামী তাঁর 'বালবোধিনী' টীকায় সুন্দর করে বলেছেন :

'অথৈতৎ দুঃখবর্ণনমসহিষ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্যায়েন[২২] সাধারণ কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ রাধামাধবয়োঃ প্রাক্তন কেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ।

দুঃখ বর্ণনায় অসহিষ্ণু কবি সিংহাবলোকন ন্যায়ের দ্বারা সাধারণ কেলিকালে প্রাতশ্চরিত বর্ণনা করেছেন, এবং তাই রাধিকার খণ্ডিতাবস্থা বর্ণনা করে অনন্তর রাধামাধবের পূর্বকেলির কথা বলছেন।

শ্লোকটি এই :

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতিস্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ॥ ৭।৪২

প্রভাতে নীলনিচোলপরা কৃষ্ণ ও রাধার বক্ষে আবৃত পীতবস্ত্র চকিতে দেখে সখীরা হেসে উঠলে যিনি শ্রীরাধার লজ্জাযুক্ত মুখে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন সেই নন্দাত্মজ জগতকে আনন্দিত করুন।

খণ্ডিতাবস্থা বর্ণনার পর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এই পূর্বকেলি বর্ণনায় তাঁর কাব্যচাতুর্য না ভক্তিভাবাতুর হৃদয়ের দুঃখ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তা রসিকজনেরা সহজেই বিচার করতে সমর্থ হবেন। বস্তুতঃ শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ও ভক্তিভাবাতুর হৃদয়ের স-গীত উচ্ছ্বাস পরস্পর এখানে যুক্তবেণী রচনা করে কৃষ্ণময়তার সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

---

১৮ দ্রষ্টব্য : গীতগোবিন্দ, ৬।১২ সংখ্যক শ্লোক।
১৯ ঐ ৭।১০ „
২০ দ্রষ্টব্য : গীতগোবিন্দ, ৭।২০ সংখ্যক শ্লোক।
২১ ঐ ৭।৩৮ „
২২ সিংহ চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখে নিয়ে আবার চলে। এই পিছন ফিরে তাকানোকে 'সিংহাবলোকনন্যায়' বলা হয়েছে ন্যায়শাস্ত্রে।

অষ্টম সর্গের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় বংশীধ্বনির জয়গান গেয়েছেন কবি :

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্বার দুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি কেশব।। ৮।১১

কংসারির যে বংশীরব গীতিমুগ্ধা কুরঙ্গীনয়নাদের মনোমোহনে, শিরোঘূর্ণনে, দৃষ্টি আকর্ষণে, কেশপাশ থেকে মন্দারকুসুম বিস্রস্তকরণে, তাদেরকে স্তব্ধ, আকৃষ্ট ও বশীকরণে মহামন্ত্রস্বরূপ, এবং সেই সঙ্গে দানবগণকর্তৃক উপদ্রুত দেবতাদের দুঃখরাশি বিনাশে দক্ষ, সেই বংশীধ্বনি আপনাদের কল্যাণ প্রদান করুক। ৮।১১

এই বংশীধ্বনির প্রশংসা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যযুক্ত চরিত্রের প্রতি দ্বাদশ শতকোচিত শ্রদ্ধামিশ্র ভক্তিরই পরিচায়ক। নবম সর্গেও তাঁর প্রার্থনা যে তাঁর গান রসিকজনের সুখোৎপাদন করুক।[২৩] দশম সর্গে মানিনী রাধার পা ধরে কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান—তাঁর মান ভেঙেছেন —এই আশ্চর্য ব্যাপারটির পূর্বে নাটকীয় তাৎপর্য বহন করছে নবম সর্গের শেষ শ্লোকটি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রকাশক এই শ্লোকটি সাধারণ নায়কোচিত কার্য বর্ণনাকে বিশিষ্টতামণ্ডিত করেছে :

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা—
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দর গলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে।। ৯।১১

পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ অশেষ আদরে ও গভীর আনন্দে প্রণত হ'লে তাঁদের মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমূহ যে চরণে ভ্রমরদের শোভাধারণ করে, এবং বিগলিত মকরন্দসুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেদুর হয়, অশুভ বিনাশার্থে সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দকে আমি বন্দনা করি।

যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাঁর পায়ে ইন্দ্র প্রভৃতি অধস্তন দেবগণের প্রণাম কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু কৃষ্ণের মহত্ত্ব, বৃহত্ত্ব, ঐশ্বর্য এই প্রণামের মধ্য দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সর্গশেষের এই শ্লোকে। তার কারণ পরবর্তী সর্গে এই পরমৈশ্বর্যময় পরম পুরুষই ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁর পা নিজ মস্তকে ধারণ করার কথা বলেছেন।

যাঁরা বলেন গীতগোবিন্দ কাব্যে গান আগে রচনা ক'রে পরে শ্লোকযোজনার দ্বারা একে কাব্যাকার দান করা হয়েছে তাঁরা এইখানে এসেই অনুভব করবেন ভক্তিভাবের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নির্দেশেই সমগ্র কাব্য রচিত না হলে এই ব্যঞ্জনা জোড়াতালির সূত্রে প্রকাশিত হতে পারে না।

---

২৩ দ্রষ্টব্য : গীতগোবিন্দ ৯।৯।

দশম সর্গের শেষে কৃষ্ণপ্রীতিবিধান করুন এই প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে। একাদশ সর্গেও জয়দেব প্রার্থনা করেছেন তাঁর এই গান যা হারের চাইতেও সুন্দর, রমণীর চেয়েও মনোহর, তা হরি-বিনিহিত-মানস [কৃষ্ণার্পিত চিত্ত] ভক্তদের কণ্ঠতটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক।[২৪] জয়দেব ভক্ত এবং কবি। তাঁর কাব্যের অমরতা তিনি চান এবং অপর ভক্তগণকর্তৃক স্বীকৃতির পুরস্কারও কামনা করেন। এই দুটি কামনাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভক্ত-স্বীকৃতি প্রাপ্তির কামনা যাঁর সর্বদাই প্রকাশিত হয় তিনি যে তাঁর কাব্যকে ভক্তিবিহীন ধর্মভাবনাহীন শৃঙ্গার কাব্য করে তুলবেন না, তা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা সম্ভব। তাই এই সর্গেই দেখি তিনি হরিকে পুণ্যফলের সারভূত বলে বর্ণনা করে সকলকে হরিপ্রণামের আহ্বান জানিয়েছেন।[২৫]

দ্বাদশ সর্গের দ্বাদশ শ্লোকে যেখানে আমরা একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলাম এবং 'পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি' কবির এই মন্তব্যে কামসূত্র বর্ণিত বিপরীতরতারম্ভে রাধিকার অল্পায়াসে সুখপ্রাপ্তির শিথিলতার দ্বারা রতিরণে পরাজয় ঘোষণার সংবাদে ভেবেছিলাম যে এর কোনও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা বার করা যায় না—সেই শ্লোকের তাৎপর্যও প্রতীয়মান হবে যদি এর পূর্বের, নবম সংখ্যক শ্লোকের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত নয়। তিনি বলছেন :

> প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাশক শ্রীজয়দেব-কবি বর্ণিত এই গান রসিকজনের চিত্তে [শ্রীকৃষ্ণের] মনোরম রতিরসাস্বাদজনিত বিনোদভাব জাগ্রত করুক।[২৬]

বিপরীত রতিতে যদি মধুরিপুর আহ্লাদ প্রকাশ হয় তবে প্রাচীন রীতি অনুসারে তার বর্ণনাতেও দোষ নেই। কৃষ্ণের যাতে সুখ, রাধিকার যাতে উদ্যোগ, তার বর্ণনায় কবিরও আনন্দ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুররসাত্মক লীলাই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। শৃঙ্গার-বর্ণনায় যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ করলেও আমরা লক্ষ্য করব যে উপাস্য দেবতার মধুররসাত্মক লীলা-বর্ণনার আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত শৃঙ্গার-বর্ণনার পশ্চাতে সক্রিয় থেকেছে। নিতান্ত ধর্মীয় প্রেরণা ও ভক্তিভাব ছাড়া এ-কাব্য বিশুদ্ধ আদিরসময় হ'লে পূর্বোদ্ধৃত অন্তঃসাক্ষ্যগুলি অনুপস্থিত থাকত। আর সারা ভারতে কাব্য হিসাবে যতটা নয়—ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অতি আদরণীয় গ্রন্থ হিসাবেও এ কাব্য তার চেয়ে বেশি স্বীকৃতি পেত না। তবে লক্ষণীয় এই যে, বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারা প্রেরণা লাভ করে রচিত হলেও সর্বদাই কাব্যশিল্পের সমস্ত উপকরণ-উপাদান সযত্নে চয়িত হয়েছে ; তাই এ কাব্য একাধারে বিলাসকলায় কৌতুহলী পাঠকের হৃদয়হরণ ও হরিস্মরণে চিত্তসরসতাকামীকে তৃপ্ত করেছে। তাই দেখি দ্বাদশ সর্গে তিনি সচেতনভাবেই ঘোষণা করেছেন :

২৪ দ্রষ্টব্য : গীতগোবিন্দ : ১১।৯।
২৫ ঐ, ১১।৩১
২৬ দ্রঃ শ্রীজয়দেবভণিত মিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরস ভাব বিনোদম্॥ ১২।৯

যদ্‌গান্ধর্বকলাসুকৌশলমনুধ্যানঞ্চযদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতনাত্মনঃ
সানন্দা পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥ ১২।২৭

হে সুধীগণ! যদি গন্ধর্বদের কলাতে [সঙ্গীতে], যদি বৈষ্ণবদের অনুধ্যানবিষয়ক কৌশলে, যদি বিবেকতত্ত্বে এবং যদি শৃঙ্গাররসকাব্যে আগ্রহ থাকে তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ পণ্ডিত শ্রীজয়দেব কবির শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা করুন।

'কৃষ্ণৈকতনাত্মন' কবি জয়দেবের এই কাব্যের অন্তরালে ধর্মীয়ভাব ও ভক্তিভাবই প্রেরণা-স্বরূপ। শৃঙ্গাররস আছেই, তবে তা ভক্তির দ্বারা পরিশুদ্ধ—ধর্মীয় ভাবনা দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রিত, সংযমিত ও শৃঙ্গার বর্ণনা থেকে ভক্তিমিশ্র মধুররসে উন্নীত এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

২॥

প্রশ্ন জাগে কবির এই কৃতিত্ব কি তাঁর একক ভক্তির ফলশ্রুতি অথবা মধ্যযুগের বিশেষত্ব অনুযায়ী তাঁর এই কাব্য ও গীত কোনও বিশেষ ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা অনুপ্রেরিত।

মধ্যযুগীয় বিশেষত্বটি যদি ঐতিহাসিক সত্য হয় তবে ইতিহাসের সূত্র অবলম্বন করে এ ব্যাপারে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

এ ব্যাপারে মুস্কিল এই যে, ভারতবর্ষে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সঠিক ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ই আপন আপন মতের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকে ও সমস্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাত্মপথের পথিকদেরই আপন আপন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করে। এই রকম বিচিত্র জটিল বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোনও বিশেষ দাবীর বিচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। জয়দেবকেও সব সম্প্রদায়ই আপনদলভুক্ত বলে দাবী ক'রে থাকেন। জয়দেবের তিনশো বছর পর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁর অনুবর্তীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠা ক'রে জয়দেবের কাব্য থেকে আপন দার্শনিক প্রত্যয়ানুকূল ভাবনা আবিষ্কার করেছেন এবং তিনশো বছরের পূর্বেই গৌড়ীয় মতের ইঙ্গিত প্রদায়ক বলে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

আমাদের দেখতে হবে দ্বাদশ শতকের পূর্বে বৈষ্ণব উপাসকদের মধ্যে কারা প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং কাদের মতের সঙ্গে জয়দেবের কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে।

একথা সর্বজনপ্রসিদ্ধ যে, ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মূলত চারটি ধারায় বিভক্ত। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় নামে এই ধারাগুলি পরিচিত। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যোগ দিলে মোট পাঁচটি ধারা বলতে পারি। যদিও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের [মাধবাচার্যের প্রবর্তিত ধারা] অনুবর্তী বলে মনে করা হত কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তা মানেন না। পরবর্তীকালের সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং শাখা আসলে এই চার সম্প্রদায়েরই

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানুজাচার্য [আনুমানিক ১০১৭ খ্রীস্টাব্দ]। বাদরায়ণ মুনি রচিত 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষ্যই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি। শ্রীসম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি তেমনি রামানুজাচার্য প্রণীত ভাষ্য। 'শ্রীভাষ্য' নামে তা সাধারণ্যে পরিচিত। শ্রীসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা নারায়ণ মূর্তি ও শেষ অনন্তদেব। ব্রহ্ম ও জীব এবং জগতের সম্বন্ধকে 'শরীর শরীরী' সম্বন্ধ আখ্যা দিয়ে ব্রহ্মকে সগুণরূপে এঁরা মেনেছেন। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্বিকল্প চৈতন্যস্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করে তাঁর ভাষ্য [শঙ্করভাষ্য রূপে যা পরিচিত] রচনা করেছিলেন। রামানুজাচার্য তা খণ্ডন করে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ সর্ব শক্তিমান সগুণরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবজগৎ রূপ বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে ব্রহ্ম এক অদ্বৈত রূপে প্রতিষ্ঠিত—এই এঁদের মত। শঙ্করের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। রামানুজের আবির্ভাব হয়েছে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে। চতুর্দশ শতকের রামানন্দ রামানুজের অনুবর্তী ছিলেন। কিন্তু পরে ইনি স্বতন্ত্র অনুবর্তী দল গঠন করেন যাঁরা রামানন্দী বলে পরিচিত হন। ব্রহ্ম বা মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমধ্বাচার্য। এঁর জন্মস্থান মাদ্রাজ, বর্তমান তামিলনাড়ুর মঙ্গলুর নামক প্রান্ত জিলায় অবস্থিত বেললি গ্রাম। জন্ম সময় ১২৬৫ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ ১২০৮ খ্রীস্টাব্দ। এঁর গুরু অদ্বৈতমতের সন্ন্যাসী অচ্যুত পক্ষাচার্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এঁর নাম হল পূর্ণপ্রজ্ঞ। উড়ুপীতে [রজত পীঠপুর-এ] এঁর প্রাপ্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য ইনি রচনা করেন তা 'পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন' নামে পরিচিত। মধ্বাচারীগণ দ্বৈতবাদী। এঁদের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ ও অধীন ও ব্রহ্ম থেকে আলাদা সত্তাবিশিষ্ট। সুতরাং জীবজগৎ ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য। অভেদ নয়। তাই নিত্য ভগবৎ-সামীপ্যই এঁদের কাম্য। এঁদের উপাস্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ।

রুদ্র সম্প্রদায় বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুস্বামী। এঁর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পাওয়া যায় না। তবে 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড' নামে গ্রন্থটি থেকে এঁর মত জানা যায়। মতবাদের দিক থেকে ইনি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ হলেও অভিন্ন। জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ অদ্বৈতভাবে মিলিত হয়—এই এঁদের মত। শ্রীবল্লভাচার্যের [জন্ম ১৫৩৭ সংবৎ বা ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ] অনুবর্তী, যাঁরা বল্লভী বা বল্লভাচারী বলে পরিচিত, তাঁরা রুদ্র বা বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়েরও অনুবর্তী। ইনি ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য' রচনা করে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদেরই প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের উপাস্য দেবতা শ্রীশ্রীবালগোপাল।

রুদ্র সম্প্রদায়ের এক শাখা পুষ্টিমার্গীয় বলে পরিচিত। বিষ্ণুসম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরায় কথা লিখতে গিয়ে ভক্তমালের উত্তরার্ধে ভারতেন্দুবাবু হরিশচন্দ্রজী জয়দেবকে রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্যদের মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করেছেন। এঁরা জয়দেবের বংশোদ্ভবদের একটি তালিকাও কোত্থেকে পেয়েছেন এবং রামরায়জী নামক উক্ত কথিত বংশাবতংসের গৃহে রাধামাধবমূর্তি দেখে ওঁদের গোঁসাই নাকি কবিতাও রচনা করেছিলেন। রামরায়জী বিঠ্ঠলনাথের বিদ্যাগুরু। বিঠ্ঠলনাথজীর চতুর্থ শিষ্য শ্রীগোকুলনাথজী 'ঘরুবার্তা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে বল্লভাচার্য যখন জগন্নাথপুরী প্রবেশ করেন তখন ঈশ্বর তাঁকে পুষ্টিমার্গে

'গীতগোবিন্দ' প্রচার করে গাইবার আদেশ দেন। এই জন্য পুষ্টিমার্গীয় গোস্বামী বালকের মন্দিরে মূর্তির শয়ন সময়ে 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর বেশম্।' এই পঞ্চম সর্গের অষ্টপদী এবং বাসন্তী দশহরাতেও অন্য অষ্টপদীর গান অবশ্যই হয়।[২৭]

চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম নিম্বার্ক বা সনক সম্প্রদায়। 'চতুঃসন' [সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার, এই চার শিষ্যের নামে] সম্প্রদায় বা হংস সম্প্রদায় রূপেও এই সম্প্রদায় আখ্যাত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনিম্বার্কাচার্য। ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য তিনি রচনা করেন তার নাম 'বেদান্ত পারিজাত কৌস্তুভ'। এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাষ্যকে কিছুটা বিস্তৃত করে নিম্বার্কের প্রত্যক্ষ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামে আর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থেই যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার নাম 'স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের মূলকথা ব্রহ্ম ও জীবজগৎ দুইয়ের মধ্যে অভেদ ও ভেদ উভয়ই সত্য। ঈশ্বর সগুণ, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।[২৮] এঁদের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এঁদের তত্ত্বানুসারে রাধাকৃষ্ণ একে অপর থেকে পৃথক্ নন। একই পরমতত্ত্ব আনন্দ ও আহ্লাদ এই দুই স্বরূপেই ক্রীড়ার্থে প্রকট হয়েছেন :

এক স্বরূপ সদাদ্বৈ নাম।
আনন্দকে আহ্লাদিনী শ্যামা আহ্লাদিনকে আনন্দ শ্যাম।[২৯]

এই চারটি সম্পদায়ের মতবাদের মধ্যে অবশ্যই নিম্বার্কীয় মতই রাধাকৃষ্ণকে আরাধ্য উপাস্য রূপে গ্রহণ জয়দেবীয় মতের নিকটবর্তী বলে প্রতীত হবে। তাছাড়া রামানুজাচার্য জয়দেবে পূর্ববর্তী হলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিষ্ণু-উপাসক। মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদে রাধাকৃষ্ণের স্বীকার-সম্ভাবনা থাকলেও মধ্বাচার্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর, অতএব দ্বাদশ শতকের জয়দেবের পরবর্তীকালের ব্যক্তি। আর তাছাড়া তিনি রাধাকৃষ্ণের বদলে লক্ষ্মীনারায়ণকে উপাস্য বলে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুস্বামী তো পরিষ্কারই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী। সেখানে শ্রীরাধিকার তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠার কথাই উঠতে পারে না। পুষ্টিমার্গীয় শাখায় বল্লভাচারীরা জয়দেবকে গ্রহণ করলেও পরিষ্কারভাবেই বহু পরবর্তীকালে, জয়দেবের ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জনের পরেই, তাঁকে গ্রহণ করেছেন। বাছাই ও বর্জনের পর যে মতবাদ বাকি থাকে তা নিম্বার্কীয় মতবাদ, এবং পূর্বেই বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণকে স্বীকার করেই তা জয়দেবের পূর্বাধিকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

২৭ দ্রষ্টব্য : 'ভক্তমাল', ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য সম্পাদিত, শ্রীনিকুঞ্জ, বৃন্দাবন।

২৮ এঁরা ঈশ্বরকে নির্গুণও মানেন। নির্গুণ, নির্বিশেষ, অবাঙ্মানসগোচর ইত্যাদি শব্দাবলীকে পরবর্তীকালের আচার্যরা প্রাকৃতিক হেয়গুণরাহিত্য, প্রাকৃতিক বিশেষগুণরাহিত্য ও ইয়ত্তানিষেধ পর বাক্য ও মনের সম্পূর্ণরূপে গোচরীভূত নয় এই ভাবেও ব্যাখ্যা করেন।

২৯ দ্রষ্টব্য : মহাবাণী, শ্রীহরিব্যাস দেবজী, সিদ্ধান্ত সুখ অংশ, বৃন্দাবন।

৩ ॥

নিম্বার্কীয় মতবাদের সঙ্গে এই উপাস্য গ্রহণের দিক থেকে জয়দেবের যে নৈকট্য তা ইতোপূর্বেই বহু সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।[৩০] কিন্তু নিম্বার্কের কাল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না থাকায় এঁরা অনেকেই জয়দেব ও নিম্বার্ক কোনও একই সূত্র থেকে উপাস্য সংগ্রহ করেছেন এই অভিমত পোষণ করেছেন। কাজেই নিম্বার্কের কাল সম্পর্কে ধারণা একটু স্পষ্ট ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। নিম্বার্ক যে জয়দেবের বহুপূর্বেই আবির্ভূত হয়ে ভাগবত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন এই চতুঃসন সম্প্রদায় স্থাপন ক'রে, রাধাকৃষ্ণকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ ক'রে, বিশিষ্ট এক সাধনতত্ত্ব প্রচার ক'রে গেছেন, সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে না পারলে এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। ভাগবত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে ব্যাপারে Monier Williams তাঁর 'Hinduism' বইটিতে, বলদেব উপাধ্যায় তাঁর 'ভাগবত সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে Grierson-Hastings সম্পাদিত Encyclopaedia of Religion & Ethics নামক বিশাল বিশ্ব-কোষ গ্রন্থে এবং বালগঙ্গাধর টিলক তাঁর বিখ্যাত 'গীতারহস্য' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। এঁরা কেউ কেউ তাঁকে শঙ্করাচার্যেরও পূর্ববর্তী মেনেছেন।

কিন্তু R. G. Bhandarkar তাঁর 'Vaisnavism, Saivism & Other minor religious cults' বইতে নিম্বার্ককে দ্বাদশ শতকের এবং রামানুজ-পরবর্তী ব'লে, প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁর 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' বইতে তাঁকে একাদশ শতকের এবং ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর 'Doctrines of Nimbarka and his followers' নামক বইতে তাঁকে ত্রয়োদশ শতকের এবং মধ্বাচার্যেরও পরবর্তীকালের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ভাণ্ডারকর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার তালিকা থেকে হিসাব করে নিম্বার্ককে দ্বাদশ শতকের অনুমান করেছিলেন। যদিও বংশ তালিকা বা পুরুষ-হিসাবের [অর্থাৎ তিন পুরুষে একশো কিংবা চার পুরুষে একশো এইভাবে কালের হিসাব করা] মতো গুরুপরম্পরার তালিকা বিচার করা কাল হিসাবের একটি উপায় হতে পারে কিন্তু তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তাছাড়া ভাণ্ডারকরের সংগৃহীত তালিকা খুব নির্ভুলও নয়।[৩১] তাতে নিম্বার্ক থেকে ৩২ পুরুষ অধস্তন গুরু হরিব্যাস দেবজীর সময় ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ হিসাব ধরা আছে। কিন্তু তিনি ১৫২৫ সংবতে [বা ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন তা জানা যাচ্ছে। হরিব্যাসদেবের গুরু শ্রীভট্ট। তিনি 'যুগলশতক' নামে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একশো পদ রচনা করেছিলেন। ব্রজভাষার আদিগ্রন্থ হিসাবে যুগলশতকের অন্য নাম ব্রজভাষা আদিবাণী। যুগলশতকের

---

৩০ দ্রষ্টব্য : (ক) 'কবিজয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ', ৪র্থ সংস্করণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন, পৃঃ ১২৪।
(খ) 'কবি জয়দেব', নানা নিবন্ধ—ডঃ সুশীলকুমার দে।

৩১ প্রবন্ধকার নিজে বৃন্দাবনের নিম্বার্কীয় আশ্রম থেকে নিম্বার্কীয় মূল আশ্রমের ঐতিহ্য-স্বীকৃত গুরুপরম্পরার তালিকা আনিয়ে দেখেছেন। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে ব্রজভাষার আদি বাণী 'যুগলশতক' নামক শ্রীভট্টদেবাচার্যকৃত গ্রন্থের শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকা 'শ্রীনিম্বার্ক সময়সমীক্ষা' অংশ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এ সব তালিকার তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

রচনাকাল ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দ।[৩২] হরিব্যাস দেবজীকে নিম্বার্কীয়গণ অত্যন্ত দীর্ঘজীবি মেনে থাকেন। তাঁর গুরুর গুরু কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্যের আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতক বলা হয়ে থাকে। তাঁর নামে লিখিত ১১৬১ খ্রীস্টাব্দের একটি পাট্টা-ই এ ব্যাপারে নিঃসংশয়িত প্রমাণ।[৩৩] বলা হয়েছে যে কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য যদি নিম্বার্ক থেকে ৩০ পুরুষ অধস্তন হন আর তিনিই যদি দ্বাদশ শতকের হন তাহলে নিম্বার্কের সময় কী করে দ্বাদশ শতকের হয়। অনুরূপ ভাবেই হরিব্যাস দেবা র্য, শ্রীভট্ট এঁদের থেকে হিসাব করেও, প্রতি দুই আচার্যের মধ্যে ব্যবধানকাল গড়ে ২০ বছর ধরে হিসাব করেও নিম্বার্ককে কেশব কাশ্মীরী থেকে ৩০×২০=৬০০ বছরের আগেকার অর্থাৎ প্রায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বলে ধরে নিতে হয়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে নিম্বার্ককে ভট্টভাস্কর বা ভাস্করাচার্যের পরবর্তী বলে ধরেছিলেন। ভাস্করাচার্য নবম শতাব্দীর 'সোপাধিক ভেদাভেদবাদী' দার্শনিক। কিন্তু ভাস্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।৩১ সূত্রের ভাষ্য দেখলে বোঝা যায় যে তিনি নিম্বার্কের প্রধান শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্যের ব্যাখ্যা অক্ষর ধরে উদ্ধৃত করে খণ্ডন করতে চেয়েছেন।[৩৪] বিচার খণ্ডনের প্রয়াস থেকেই প্রমাণিত হয় যে শ্রীনিবাসাচার্য ভাস্করাচার্য থেকে পূর্ববর্তী এবং তাঁর গুরু নিম্বার্কদেব তো বটেনই।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে নিম্বার্কের ন ম কিংবা শ্রীনিবাসাচার্যের নাম করেননি—এ থেকে যদি অনুমান করতে হয় যে তিনি শঙ্কর-পরবর্তী তাহলেও ভুল হবে। কেন না শঙ্কর নানা স্থানে নিম্বার্কীয় দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ উল্লেখ ও খণ্ডন করেছেন। শ্রীনিবাসাচার্যের 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' ভাষ্যের ভাষাকে পূর্বপক্ষ করে নিম্বার্ক-শ্রীনিবাসের সিদ্ধান্তপক্ষকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন যদিও তাঁদের নামতঃ উল্লেখ করেননি।[৩৫]

উল্টো পক্ষ নিম্বার্কভাষ্যেও শঙ্করের নাম তো নেই-ই, মতেরও খণ্ডন নেই। পূর্বাচার্যদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন না ক'রে আপন মতের প্রতিষ্ঠা হয় না—এইটিই ভারতীয় দর্শন-আলোচনার রীতি। আসলে নিম্বার্ককৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাচীন এবং বোধ হয় সেই জন্যই অত সরল ও সংক্ষিপ্ত। নিম্বার্কের নাম শঙ্কর যেমন করেননি,—তেমনই রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ শ্রীকণ্ঠও তাঁর নাম করেননি। আসলে নাম করা বা না করা কোনও ব্যাপারই নয়। বিচার খণ্ডনই আসল ব্যাপার। তা থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি শঙ্কর-পূর্ববর্তী। সুতরাং প্রাক্-শঙ্কর যুগের ব্যক্তি হওয়ার জন্য নিম্বার্কদেব ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীকণ্ঠ এঁদের সকলেরই পূর্ববর্তী।

---

৩২ নয়ন বাণ পুনি রাম শশি গণোঅঙ্কগতি বাম।
শ্রীভট্ট প্রগটিত যুগলশত যহ সম্বৎ অভিরাম॥
অর্থাৎ ১৩৫৩ সংবৎ=[১৩৫৩—৫৬]=১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৩৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ক) 'যুগলশতক'—শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য সম্পাদিত সংস্করণ, বৃন্দাবন ও (খ) 'শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন', তৃতীয় অধ্যায়,—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মহেশ লাইব্রেরী কলকাতা ১৯৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৪ দ্রঃ নিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৫।

৩৫ দ্রঃ শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৭-৯০।

কিন্তু যথেষ্ট পূর্ববর্তী বোধ হয় নন। কারণ নিম্বার্কের শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ আচার্য পুরুষোত্তমাচার্য 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা' গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের নানা মতবাদ খণ্ডন করেছেন। যদি নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস প্রাক্-শঙ্কর যুগের এবং চতুর্থ শিষ্য পুরুষোত্তম শঙ্করোত্তর যুগের হন, তাহলে তৃতীয় আচার্যের [শ্রীবিশ্বাচার্যের] সমসাময়িক হতে হয় শঙ্করকে। অর্থাৎ শঙ্করের দুই গুরু আগে নিম্বার্কের কাল। ব্যবধানটা আনুমানিক একশো বছরের কম তো হবেই!

তথাপি গুরু-পরম্পরা বিচার বিভ্রান্তিকর। শিষ্য গুরুর চাইতে অনেক বড়ো হতে পারেন—আশ্রম-গদীতে বসার সময়ের গড় হিসাব ধরে সর্বদা সত্যে পৌছানো যায় না।

নিম্বার্কাচার্য 'সুগতমতং নিরাকরোতি' বলে যে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করেছেন তা বিপ্রভিক্ষু ধর্মকীর্তির মত। ধর্মকীর্তি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর লোক হলে নিম্বার্ককে তার আগেকার লোক বলা সঙ্গত হয় না। এ সব থেকে সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্কর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর হ'লে, নিম্বার্ক ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের দার্শনিকের মত খণ্ডন করলেও তিনি প্রাক্-শঙ্কর যুগের হলে তাঁর আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী না হয়ে যায় না।[৩৬]

ডঃ রমা চৌধুরী নিম্বার্ককে মধ্বাচার্য-পরবর্তী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধরেছিলেন। এর পশ্চাতে যে ভ্রান্তি কার্যকর ছিল তা হল এই যে তিনি নিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থ বলে 'মধ্বমুখমর্দন' এবং 'সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ স্তবরাজ' নামে দুখানি রচনাকে গ্রহণ, স্বীকার ও আলোচনা করেছিলেন।[৩৭] কিন্তু মধ্ব ও শঙ্কর সমালোচনার ওই দুটি গ্রন্থ কখনই নিম্বার্কের রচনা হতে পারে না।[৩৮]

নিম্বার্কদেবকে শঙ্কর-পূর্ববর্তী অতএব জয়দেবের ঢের পূর্ববর্তী বলে না হয় প্রতিষ্ঠা করা গেল। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মধুর রসোপাসনার ধারা, রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বীকৃত ধারণা ও পূজা-উপাসনার পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিচার না করলে সিদ্ধান্তে পৌছনো অসম্ভব।

৪ ॥

'বেদান্তদশশ্লোকী'-তে নিম্বার্কাচার্য রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন :

স্বভাবতোঽপাস্ত সমস্তদোষমশেষকল্যাণ গুণৈকরাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং ধ্যায়েম্ কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥ ৪

৩৬ নিম্বার্কের কাল সম্পর্কে আরও বহু তথ্যের খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য নিম্নের বইগুলি দ্রষ্টব্য :
(ক) 'যুগলশতক'—ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য, বৃন্দাবন।
(খ) 'নিম্বার্ক সম্প্রদায় আওর উস্‌কে কৃষ্ণভক্ত হিন্দী কবি'—ডঃ নারায়ণ দত্তশর্মা, প্রিন্‌সিপাল, জহর ইণ্টার কলেজ, মথুরা।
(গ) শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

৩৭ নিম্বার্কীয় মতানুসারে নিম্বার্কদেব স্বয়ং যা রচনা করেন, তার তালিকা এই : (ক) বেদান্তপারিজাত কৌস্তুভ, (খ) বেদান্তদশশ্লোকী বা বেদান্ত কামধেনু, (গ) প্রপন্নকল্পবল্লী, (ঘ) মন্ত্ররহস্যষোড়শী, (ঙ) প্রপত্তি চিন্তামণি, (চ) গীতা-বাক্যার্থ, (ছ) সদাচারপ্রকাশ, (জ) রাধাষ্টকম, (ঝ) কৃষ্ণাষ্টকম্ ও (ঞ) প্রাতঃ স্মরণ স্তোত্রম্।—এর মধ্যে ঘ, ঙ, ও ছ সংখ্যক বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, বই পাওয়া যায়নি।

৩৮ এ ব্যাপারেও বিশদ আলোচনার জন্য 'নিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন', পৃঃ ৪২-৪৯ দ্রষ্টব্য।

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদাবিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেং দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥ ১ ॥

অশেষকল্যাণগুণরাশিময় ও সমস্ত দোষরহিত পরব্রহ্ম চতুর্ব্যূহ-
যুক্ত কমল নয়ন বরেণ্য হরিকৃষ্ণকে ধ্যান করি ॥ ৪ ॥

যাঁর বাম অঙ্গে বৃষভানুনন্দিনী অনুরূপ সৌভাগ্যযুক্তা
প্রফুল্লা সহস্রসখী পরিসেবিতা সকল ইষ্ট কামনাপূর্তি-
কারিণী দেবীকে স্মরণ করি ॥ ৫ ॥

কিংবা, নান্যাগতি কৃষ্ণ পদারবিন্দাং······ ॥ ৮ ॥

তাঁদের মধুর রসাত্মক লীলার ইঙ্গিত রয়েছে 'প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রে'।

প্রাতঃস্মরামি যুগকেলিরসাভিষিক্তং
বৃন্দাবনং সুরমণীয়মুদারবৃক্ষম্।

কিংবা, প্রাতর্ভজামি শয়নোত্থিত যুগ্মরূপং।

কিংবা, অন্যোন্য কেলিরসচিহ্ন সখীদৃগৌঘ
সংখ্যাবৃতং সুরতকামমনোহরম্ চ ॥ ৩ ॥

প্রাতর্ভজে সুরতপয়োধিচিহ্নং
গণ্ডস্থলেন নয়নেন চ সন্দধানৌ।
রত্যাস্থ শেষ শুভদৌ সমুপেত কামৌ
শ্রীরাধিকাবর পুরন্দরপুণ্যপুঞ্জৌ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকার অশেষ গুণাবলী স্তুত হয়েছে নিম্বার্কাচার্য রচিত 'রাধাষ্টক' স্তোত্রে :

দুরারাধ্যমারাধ্য কৃষ্ণং বশে তং
মহাপ্রেম পূরেণ রাধাঽভিধাঽভূঃ।
স্বয়ং নামকীর্ত্যা হরৌপ্রেম যচ্ছ
প্রপন্নায় মে কৃষ্ণরূপে সমক্ষম ॥ ৩ ॥

মুকুন্দস্ত্বয়া প্রেমডোরেণ বদ্ধ
পতঙ্গ যথা ত্বামনুভ্রাম্যমাণঃ।
উপক্রীড়য়ন্ হার্দমেবানুগচ্ছন্
কৃপাবর্ততে কারয়াতোময়ীষ্টম্ ॥৪॥

...

মুকুন্দানুরাগেণ রোমঞ্চিতাঙ্গৈ,
রহং ব্যাপ্নমানাং তনুস্বেদবিন্দুম্।
মহাহার্দবৃষ্ট্যা কৃপাপাঙ্গদৃষ্ট্যা
সমালোকয়ন্তীং কদা ত্বাং বিচক্ষে ॥৬॥

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই জাতীয় স্তোত্রের সঙ্গে কর্ম, গুরূপসত্তি বা গুরু শরণাগতিযোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ এই জাতীয় সাধনপ্রণালীর সঙ্গে ভক্তিযোগের অন্তর্গত মধুর বা কান্তাভাবে উপাসনাও প্রচলিত।[৩৯]

মধুরভাবে উপাসনা পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে। কিন্তু নিম্বার্কীয় মতে তার সমর্থন না থাকলে তা গড়েই উঠতে পারত না।

এই ধারার উপাসনার বিশেষ পুষ্টি ও প্রচার করেন শ্রীভট্টদেব, শ্রীহরিব্যাসদেব, স্বামী হরিদাস, রসিকদেব, ললিতকিশোরদেব প্রভৃতি আচার্যগণ।[৪০]

"এই মধুরভাব বা কান্তভাব প্রেমলক্ষণাভক্তির অন্তর্গত, ইহা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাতেই লাভ হয়। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে এই কথাই বলিয়াছেন—"কৃপাঽস্যদৈন্যাদি যুজিপ্রজায়তে যয়াভবেৎ প্রেমবিশেষ লক্ষণা" ইত্যাদি—শ্লোক ৯। পূর্বোক্ত নিম্বার্কীয় আচার্যগণের মতে অনুরাগাত্মিকা মধুরভাবের উপাসনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিয়া-প্রিয়তমরূপে আরাধ্য হইয়া থাকেন। এই মধুরভাবের সেবার স্থল গোলোকধাম। এই গোলোকধামেরই দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রজমণ্ডলে নিত্য বৃন্দাবনধাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার অগণ্য ভক্তই ইহার অনুভব বা সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। সর্বপ্রকারে পুরুষাভিমান বা দেহাভিমান বর্জিত হইলেই প্রেমিক সাধক দাসীভাবে বা সহচরীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবার অধিকারী হইতে পারেন। অনুরাগাত্মিকা সেবায় ভক্ত শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর অষ্টযাম বা অষ্টকালীন লীলার ধ্যান, চিন্তা, কীর্তন ও সেবাপূজা প্রভৃতিতে সর্বদাই তন্ময় থাকেন। নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীভট্টজী তাঁহার 'যুগলশতক' ও শ্রীহরিব্যাসদেবজী তাঁহার 'মহাবাণী'-তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন অষ্টপ্রহরের নিকুঞ্জ-লীলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তাঁহাদের পরবর্তী শ্রীরূপরসিকদেব তাঁহার পদাবলীতে, রসিকদেবজী তাঁহার 'রসিকদেবজী কী বাণী' গ্রন্থে শ্রীহরিদাসজী তাঁহার 'কেলিমাল' গ্রন্থে ও বিহারিণীদেব, ললিতকিশোরদেব প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁহাদের বাণীগ্রন্থে ও পদাবলীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলাবিহার ও মধুরভাবে উপাসনার কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব রসিক-গোবিন্দ কৃত 'যুগল-রসমাধুরী' এবং বাবা মাধবদাসজী রচিত 'নিকুঞ্জমাধুরী' গ্রন্থেও শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর নিত্যবিহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীরূপরসিকদেব তাঁহার 'লীলাবিংশতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সিদ্ধান্তমাধুরী' খণ্ডে এই নিত্যবিহার ও মধুরভাবের উপাসনাতত্ত্বের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।··· ··· এই নিত্যবিহারের চার অঙ্গ, (১) পরা পর পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, (২) তাঁহার আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা, (৩) জীবাত্মারূপ সহচরীবর্গ ও (৪) নিত্যবৃন্দাবন ধাম। এই সহচরীভাবের উপাসনায় স্ব-সুখিত্ব এবং তৎসুখিত্ব এক হইয়া যায়, তাদাত্ম্য হইয়া যায়। প্রেমী নিজ প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করে—ইহাই প্রেমের নিয়ম। এইরূপ প্রেমী অনুরাগী ভক্তের

৩৯ 'শ্রীনিম্বার্ক দর্শনে সাধন ও উপাসনাপ্রণালী—শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন'—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৫—৫০৯।

৪০ শ্রীভট্টের 'যুগলশতক', হরিব্যাসদেবের 'মহাবাণী', ও 'সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি,' স্বামী হরিদাসের 'কেলিমাল' এই বইগুলির নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

পক্ষে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিধিনিষেধ প্রেমের বাধক, রসোপাসনার বাধক। ['বিধিনিষেধকে জো ধর্ম তিনকে ত্যাগি রহে নিষ্কর্ম'—মহাবাণী, হরিব্যাসদেবজী কৃত, পৃঃ ১৮৭] তাই নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব শ্রীধ্রুবদাসজী তাঁহার 'ভক্ত নামাবলী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'সেবা হ্ তেঁ দূর কিয় বিধিনিষেধ জংজার' [পৃঃ ৮৮] এই সমস্ত তথ্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায় যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও মধুরভাবে বা কান্তভাবেও উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং উপরে বর্ণিত আচার্যগণের পরম্পরায় এখনও মধুরভাবের উপাসনার প্রচলন রহিয়াছে।"

[শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য]

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিই নিম্বার্কীয় দর্শনে রসোপাসনার পদ্ধতি প্রচলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব কিছুই প্রকাশ করছে। এই সম্প্রদায়ের গোপনীয় গ্রন্থ 'মন্ত্ররহস্যষোড়শী'-তেও আচার্য নিম্বার্কদেব স্বয়ং মধুরভাবে উপাসনার নির্দেশ দিয়েছেন :

দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতাঃ।
ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়বন্মিত্রবত্তথা ॥ ১৬ ॥

দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণের দ্বারা মায়াকে ত্যাগ করে সমাহিতাবস্থায়, ভৃত্যের মত, পুত্রের মত, সখার মত, প্রিয়ের সেবা করবে ॥ ১৬ ॥

হরিব্যাসদেবাচার্য তাঁর দশশ্লোকীর টীকা সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি ৪র্থ পরিচ্ছেদে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

শান্তং দাস্যং চ বাৎসল্যং সখ্যমুজ্জ্বলমেব চ।
অমীপঞ্চ রসামুখ্যা প্রোক্তাবৈ রসবেদিভিঃ ॥

বলা হয় যে হরিব্যাসদেবাচার্য কিছুতেই রূপসনাতনের আগের যুগের হতে পারেন না। তথাপি তাঁর ব্যাখ্যা উজ্জ্বল রসের স্বীকৃতিই প্রদান করছে।

সম্প্রদায়ের পণ্ডিতও লিখছেন :

'সখী সহচরী ভাব সে হী যুগল কী সেবা করনা। [মধুর উজ্জ্বল রস-উপাসনা] ইস সম্প্রদায় কী মুখ্য পদ্ধতি হ্যায়।[৪১]

ইনিই উল্লেখ করেছেন যে এঁদের আদি প্রধান আচার্যদের মধ্যে একজন, ঔদুম্বরাচার্য, তাঁর গুরুকে রাধাকৃষ্ণসহচরী সখীরূপে দেখতেন। [দ্রঃ নিম্বার্কবিক্রান্তি, ১৯৩-১৯৪] ও সব থেকে নিম্বার্কীয় ধারায় মধুর রসোপাসনার কথা জানা গেল। শৃঙ্গারভাবনাযুক্ত ভক্তি যদি নিম্বার্কীয় দর্শনের অনুগত হয় তাহলে নিম্বার্কীয় মতের অনুগত হয়ে, 'গীতগোবিন্দে'র মত কাব্য রচনা করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং কবি জয়দেবের পক্ষেও নিম্বার্কীয় দর্শন থেকে প্রেরণা আহরণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়।

৪১ দ্রষ্টব্য : 'উজ্জ্বল রস-উপাসনা আওর নিম্বার্ক সম্প্রদায়'—পণ্ডিত ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্যজী, পঞ্চতীর্থ—ভারতীয় সাহিত্য : ভাটনগর। অভিনন্দন সংখ্যা, পৃঃ ১৫৭। হিন্দী তথা ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যাপীঠ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আগ্রা।

তবু এই মত পুরোপুরি জানতে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যদিচ 'প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রে' 'যুগকেলিরসাভিষিক্তং', বৃন্দাবনের সুরমণীয় উদ্যান, শয়নোত্থিত যুগ্মরূপ, সুরতপয়োধিচিহ্নযুক্ত যুগ্ম দেবতার বন্দনা করা হয়েছে, যদিচ 'রাধাষ্টকে' যে রাধার নিকট পতঙ্গবৎ প্রেমডোরে কৃষ্ণ স্বয়ং আবদ্ধ তার গুণকীর্তন করা হয়েছে তথাপি কোথাও শ্রীরাধিকাকে পরকীয়া বলে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ পরকীয়া ছাড়া স্বকীয়াতে অভিসার, অভিসারকালীন সতর্কতা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। প্রেমের আত্যন্তিকতা পরকীয়া-র অভিসার গমন বা গোপন মিলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমধিক প্রকাশিত হয় ব'লেই গৌড়ীয়গণ শ্রীরাধিকার পরকীয়ত্ব মেনে ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে ঐ ব্যাপারে আমরা মিশ্র ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই।

প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে নন্দ যে রাধিকাকে আদেশ করছেন ভীত কৃষ্ণকে গৃহে পৌছে দেবার জন্য ['নক্তং ভীরুরয়ং তদেব তদীমং রাধে গৃহং প্রাপয়'] সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাসলীলা দর্শনে অভিমানিনী ও পরে অনুতপ্তা শ্রীরাধিকাকে সখীকর্তৃক অভিসার গমনের উপদেশও ['ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বন অনুসর তং হৃদয়েশম্'—গীত ১১] স্বকীয়াভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। আবার অন্য দিকে 'দম্পতী' শব্দ ও কৃষ্ণকে 'পতি' রূপে উল্লেখের[৪২] মধ্যে তথাকথিত স্বকীয়ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে। পরকীয়া নায়িকাদের অভিসারে বিঘ্ন জন্মাবার জন্য পাপের প্রতিফলস্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করেছে চাঁদ। আবার অসতী নারীর অভিসার গমনের মত ব্যাপারের কথাও যে তার জানা ছিল তার প্রমাণ পাই সপ্তম সর্গের প্রথম শ্লোকে, যেখানে চাঁদের বর্ণনা : 'কুলটাকুল বর্ত্মপাত সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুট লাঞ্ছনশ্রীঃ'। এই ধরনের মিশ্রভাবের উপস্থিতির ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে জয়দেবের কালে স্বকীয়া-পরকীয়া নিয়ে বিরোধ পরবর্তীকালের মত জমে ওঠেনি, এবং জয়দেব এ নিয়ে মাথাও ঘামাতেন না। আর এই দুধরনের মত ও ভাবের বিরোধ মিটে যায় অতি সহজে যদি মনে করা যায় গোপীদের মধ্যে ব্রজের যুবতী ও বধূগণ থাকলেও রাধিকার ক্ষেত্রে অবিবাহিতা বয়স্কা কোনও কন্যার চিত্রই জয়দেবের কল্পনায় সক্রিয় ছিল। এই কন্যকা অবস্থায় অভিসার অবশ্যই সম্ভব, অভিসারকালীন লজ্জাও স্বাভাবিক—এমন কি কন্যার ক্ষেত্রে তার প্রিয়তম দয়িতের বিশেষণ-রূপে 'পতি' ও উভয়ের ক্ষেত্রে 'দম্পতি' বিশেষণও অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ যেখানে তত্ত্বতঃ রাধা কৃষ্ণেরই শক্তি। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে অঙ্গের বামে স্থিতা 'সকলেষ্ট কামদা' কৃষ্ণভানুজা রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া বৈধী পত্নী হলেও কন্যা অবস্থায় তাঁর সমস্ত লীলাই সম্ভব।[৪৩] এভাবে দেখতে পারলে নিম্বার্কীয় মতবাদের সঙ্গে গীতগোবিন্দের মূল ভাবদর্শনের সামীপ্য অনুধাবন করা সহজতর হয় আর তাছাড়া বহু বিতর্কেরও অবসান ঘটে।

---

৪২ ...সম্ভাষণৈর্জানতোর্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ।। ৫।১৯। গীতগোবিন্দ।
এবং 'পত্যুর্মনঃ কীলিতম্'—১২।১৪। গীতগোবিন্দ।

৪৩ বস্তুত নিম্বার্কীয় পন্থীরা এইভাবেই কৃষ্ণরাধিকার অভিসার ইত্যাদি বহু প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকে স্বীকার ও ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য : 'রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ও জয়দেব' প্রবন্ধ—'শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য ও তাঁহার ধর্মমত'। লেখক শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীহট্ট।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে মেঘদর্শনে ভীত কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাধিকার প্রতি নন্দের আদেশ এবং সেই নন্দ-নির্দেশে চালিত রাধা-মাধবের নির্জন কেলি[৪৪]—সমস্ত ঘটনাটির পরিকল্পনার মধ্যে যে অসঙ্গতি তা ব্যাখ্যা করার বহু চেষ্টা হয়েছে। নন্দ যাকে পিতৃস্নেহবশে শিশু বলে মনে করেছে আসলে সেই কৃষ্ণ শিশুও নয়, ভীতও নয়, এ তাঁর এক ছলনা। এবং সেই সার্থক ছলনায় কৃষ্ণ-রাধিকার গোপন মিলনই জয়যুক্ত হয়েছে। যদি মনে করা যায় যে রাধা প্রৌঢ়াকুমারী, বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যা, তা হলে এ অসঙ্গতি খুব সহজেই ব্যাখ্যাত হয়। এই প্রসঙ্গে হালের 'গাথা সপ্তশতী'-তে কবি বিধিবিগ্রহের রচিত সেই শ্লোকটিও মনে পড়ে :

অজ্জুবি বাল দামোদরত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ
কণ্হ-মুহ পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ-বহূতি ॥ [বিধিবিগ্গহস্স]
'দামোদর আমার আজও বালক'—যশোদা এরূপ জল্পনা
করলে, কৃষ্ণমুখপানে চেয়ে গোপনে ব্রজবধূরা হাসল।

ব্রজবধূরা যা জানে যশোদার তো তা জানার কথা নয়। এমনি তো নন্দেরও জানার কথা নয় যে কৃষ্ণ শিশু নয়; অথবা মেঘ দেখে তমালকুঞ্জে ঘনায়মান অন্ধকার দেখে ভীত হবার অবস্থাও তার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বয়োজ্যেষ্ঠা রাধিকার সঙ্গে তাকে নিঃশঙ্কে সে পাঠিয়ে দিল। সুতরাং নন্দ অর্থে 'আনন্দ-দায়িনী সখী'[৪৫] অথবা নন্দ অর্থে বাঁশী[৪৬] এই রকম ব্যাখ্যা আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। এতে সহজ জিনিসই ঘোরালো হয়ে ওঠে। বস্তুত এইভাবে স্বকীয়া-পরকীয়া বিবাদের মীমাংসা নিম্বার্কীয়পন্থীদের মতানুবর্তী হলেও মূল নিম্বার্কীয় শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত নেই। তাই পণ্ডিতদের কাছে এই ব্যাখ্যা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়।

অবশ্য মনে রাখতে হবে নিম্বার্ক মতে রসোপাসনার অস্তিত্ব ও সমর্থন থাকলেও উত্তর ভারতে এই ধারায় কাব্যরচনার প্রথা বহু পরবর্তী কাল থেকে শুরু হয়েছে। ব্রজভাষা 'আদিবাণী', শ্রীভট্ট রচিত 'যুগলশতক'[৪৭]যার মধ্যে শরণযাচনা [মঙ্গলাচরণ] 'ব্রজলীলা'র অন্তর্গত মুরলীধ্বনি শ্রবণ, হরিদর্শনোৎকণ্ঠা, অধীরতা, কুঞ্জমেঁ দর্শনাভিলাষ, হরিদর্শন, যুগলবিহার বর্ণন, দম্পতীমিলন, 'সেবাসুখ'-অন্তর্গত শ্যাম শয্যারচন, 'সহজসুখ'-অন্তর্গত নিরন্তর দর্শন অভিলাষ, যুগলশোভা, যমুনার তটবিহার, যুগলকেলি ইত্যাকার বহুবিধ ভাব বিষয়ক পদ রয়েছে,—সেই গ্রন্থের রচনাকাল ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দ।[৪৮] শ্রীভট্টদেবাচার্যের শিষ্য হরিব্যাসদেবাচার্য 'মহাবাণী' আখ্যাত গ্রন্থ। অন্যান্য কবিদের মধ্যে শ্রীরূপরসিকদেবের

৪৪ ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১।১

৪৫ ইত্থমনেন প্রকারেণ নন্দয়তীতি নন্দঃ স চাসৌ নিদেশশ্চেতি সঃ নন্দনিদেশ শ্রীরাধিকায়াঃ সখীবচনং তস্মাচ্চলিতয়োঃ।—পূজারী গোস্বামীর টীকা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতগোবিন্দ দ্রষ্টব্য।

৪৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪-১৭৬ দ্রষ্টব্য।

৪৭ 'শ্রীযুগলশতক' রচয়িতা শ্রীভট্টদেবাচার্য। প্রকাশক শ্রীব্রজবিহারীশরণজী। সম্পাদক : শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য পঞ্চতীর্থ, বৃন্দাবন (মথুরা)। বি. স, ২০০৯।

৪৮ ৩২ সংখ্যক পদটীকা দ্রষ্টব্য।

পদাবলী, রসিকদেব রচিত 'রসিক দেবজী কী বাণী' ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থই পরবর্তী কালের রচিত। অর্থাৎ জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা ও নাম ছড়িয়ে পড়ার পরই মধুরভাবে উপাসনার ধারায় এই সব গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে।

আরও একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জয়দেব যে দশাবতার বন্দনা করেছেন তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কৃষ্ণকে অবতার নন অবতারী রূপে মেনেছেন। অবতারদের বৈশিষ্ট্য একে একে বর্ণনা করে তিনি লিখছেন :

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্য দারয়তে, বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

মীন অবতারে বেদোদ্ধার, কূর্মাবতারে মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড করে মন্থনকালে কূর্মরূপে দণ্ডধারণ, বরাহাবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দৈত্যবিদারণ, বামনাবতারে বলিছলনা, পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয় বধ, রামাবতারে রাবণজয়, বলরামাবতারে হলকর্ষণ, বুদ্ধাবতারে করুণাবিতরণ ও কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছবধ করেন যে দশবিধরূপধারী কৃষ্ণ, তাঁকে নমস্কার জানিয়েছেন তিনি।

অন্যত্র যে সব স্থানে অবতার বন্দনা পেয়েছি সেখানে হয় দশের চাইতে বেশি অবতার— অথবা দশাবতার স্বীকৃত হলে কৃষ্ণকেও অবতার রূপে স্বীকৃতিদান করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রেও নিম্বার্কীয়দের দাবী যে তাঁদের সম্প্রদায়েই দশাবতার বন্দনা চালু এবং তাঁরাই একমাত্র কৃষ্ণকে অবতারীরূপে মেনেছেন।—আসলে ভাগবত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিম্বার্কীয়-গণই রাধাকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ও জগৎ ব্যাপারের প্রতীক ও উপাস্যরূপে মেনেছেন বলে কৃষ্ণকে অবতারীরূপে দেখবার আগ্রহই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নিম্বার্কীয় গুরুপরম্পরায় নিম্বার্কদেবের মুখ্য শিষ্য শ্রীঔডুম্বর আচার্য তাঁর 'নিম্বার্ক-বিক্রান্তি' গ্রন্থে দশাবতার বন্দনা করেছেন। ঔডুম্বরাচার্যের অপর গ্রন্থ 'ঔডুম্বর-সংহিতা'। এর মধ্যে তিনি নিম্বার্কাচার্যের দশশ্লোকীতে রাধাকৃষ্ণের মধুর উপাসনার ধারার বর্ণনা করেছেন। সে যা-ই হোক, নিম্বার্কাচার্য যদি অতি প্রাচীনকালের আচার্য হন, তাহলে জয়দেবের পূর্বে কৃষ্ণকে অবতারী মেনে দশাবতার বন্দনার এই প্রচলন এই ইঙ্গিতই দেয় যে জয়দেব তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা হিসাবে অন্য সমস্ত উপাদান-উপকরণের সঙ্গে একটি বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয়কে গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

ঔডুম্বরাচার্য কৃত দশাবতার বন্দনাটি এই :

মৎস্যায় কূর্মায় বরাহভাসে
শ্রীনারসিংহায় চ বামনায়
আর্যায় রামায় রঘুত্তমায়
ভূয়োনমোস্তেব যদুত্তমায় ॥ ৫ ॥

বুদ্ধায় বৈ কল্কো এবমাদি
নানাবতারৌঘ ধরায় নিত্যং
সচ্চিত্ত্যশক্তি ও তিরুদ্ধধাম্নে
কৃষ্ণায় সর্বাদি নিধান ধাত্রে ।। ৬ ।।

রাধাপতেনন্দতনুজ কৃষ্ণে
গোবিন্দগোপাল মুকুন্দমিশ্র
গোপীশ বৃন্দাবন রাস লাসিন্
জিহ্বাং আর্তস্বরতঃ স্ফুরত্বং ॥ ৭ ॥

এখানে তাহলে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম যদুত্তম বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি এবম্প্রকার দশাবতার ধারণকারী, সর্বনিধানধাতা, রাধাপতি, নন্দতনুজ, গোবিন্দ, গোপাল, মুকুন্দ, গোপীশ, বৃন্দাবনরাসবিলাসী কৃষ্ণের প্রতি নমস্কার জানানো হয়েছে। জয়দেব কৃত দশাবতার বন্দনার সঙ্গে এই বন্দনার তাৎপর্যগত সাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। দ্বাদশ শতকে বাংলা দেশের প্রচলিত ধারায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যরচনা করে জয়দেব সমসাময়িক যুগরুচিকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তার জন্য একদিকে পুরাণাদি থেকে মূল কাহিনীর বীজ-আহরণ করেছেন, অন্যদিকে নিম্বার্ক-দর্শন সমর্থিত উপাস্য রাধাকৃষ্ণকে ধর্মীয় প্রত্যয়ের দিক থেকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই এই প্রত্যয় যে বিশেষভাবে নিম্বার্ক প্রচারিত দর্শনকে সর্বাংশে প্রকাশ করেছে এমন নয়। সেকথা দৃঢ়ভাবে বলার মত যথেষ্ট তথ্যও নেই। কিন্তু কাব্যরচনার পশ্চাতে রাধাকৃষ্ণকে ভক্তিভাবের আলম্বনরূপে গ্রহণ করার এই নিম্বার্কীয় রীতিটি সক্রিয় দার্শনিক আবহ-পরিমণ্ডল রচনা করে থাকবে। জয়দেব নিম্বার্কীয় হোন বা না হোন তাতে কাব্যের দিক থেকে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসুরা তাঁর এই আশ্চর্য, কাহিনী পরিকল্পনায় অভিনব, কাব্যের পশ্চাতে এইরকম একটি সুপ্রাচীন কালের দার্শনিক মতবাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেয়ে খুশিই হবেন।

একটি পুরনো মফঃস্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বৈদ্যবাটী নিবাসী শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তার পুরনো ফাইল দেখার সুযোগ হয়েছিল। এটির নাম 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা'।

কয়েকটি কারণে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত ফটোচিত্র দুটি বৈদ্যবাটী পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। পত্রিকার আকার ১৩"×৮"। প্রতি সংখ্যায় ছয়টি পৃষ্ঠা।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত নিয়মাবলী—'বৈদ্যবাটী পত্রিকা প্রতি রবিবারে বাহির হইবে। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক পয়সা—সডাক বার্ষিক মূল্য ১।০ সিকা—মোট ৪৮ সংখ্যায় বর্ষ পূর্ণ হইবে।'

শেষ পৃষ্ঠার নীচে মুদ্রাকরের লাইন—Printed and Published by Kanailal Mukherjee at the Karmisangha Press, Baidyabati.

পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সেবক শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়।

পত্রিকার শিরোদেশে মুদ্রিত—"বাংলার জনগণের মুখপত্র"। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (প্রথম সপ্তাহ) তারিখ—রবিবার ১১ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল। [১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর]

প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার motto.

> "উদ্দেশ্য কর 'কল্যাণ', উপায়—'সংস্কার'।
> 'সততা' অবলম্বনে উঠাও ঝঙ্কার ॥
> প্রীতি রাখ বিশ্বপ্রতি বিশ্বপতির আশীষ পাবে।
> সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার পানে তবেই ধাবে ॥"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয়। ইহার শিরোদেশে একটি শ্লোক মুদ্রিত :

> কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী :

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—সম্পাদকীয়। দেশসেবা (নিবন্ধ)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২।৩ পৃষ্ঠায় উদ্বোধন (কবিতা)—ক্ষেত্রকুমার দাশশর্মা। আহ্বান (নিবন্ধ)—সরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪র্থ পৃষ্ঠায়—পরাধীনতার পাষাণ (নিবন্ধ)—হেমন্তকুমার সরকার। ৪।৫ পৃষ্ঠায়—পূজার কাকলী (কবিতা)—নিত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আর্যস্বাস্থ্যবিধি—কবিরাজ সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। ধর্মবল (নিবন্ধ)—জনৈক। ৫।৬ পৃষ্ঠায়—অভিযান (কবিতা)—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। মায়ের আশীর্বাদ—(শুভেচ্ছাবাণী)—মৃণালিনী দেবী।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে 'কর্মীসংঘ' বৈদ্যবাটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'মটো' ও বিষয়সূচী থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায়, দেশসেবা এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণাস্থল।

কর্মীসংঘে ছিলেন সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেবক শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ রাজরোষকে অগ্রাহ্য করে সেদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কর্মীসংঘ প্রেস' বৈদ্যবাটী সিদ্ধেশ্বরীতলার এক বাড়িতে স্থাপিত ছোট ছাপাখানা। হাতে বোনা হরফে এটি মুদ্রিত। দুই লাইনের মাঝে তামার পাতের অভাবে পিজবোর্ড দেওয়া থাকত। হাতে ঠেলা মেশিনে পত্রিকা মুদ্রিত হত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছকু), ৺সুরেন্দ্রনাথ সাউ, বালক দাশরথি মুখোপাধ্যায় (তাঁর কাছ থেকে তথ্যাদি ও 'ফাইল' সংগৃহীত) পত্রিকার স্বেচ্ছাকর্মী। সম্পাদকের জ্যাঠাইমা ও দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের জননী শ্রীমতী প্রমোদা দেবী (বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধা) সম্পাদকের স্ত্রী ৺রেণুবালা মুখোপাধ্যায় এবং ৺বসন্তকুমারী দাসী গৃহকর্মের অবসরে টাইপ-কম্পোজ করতেন। শ্রীমতী প্রমোদা দেবী কর্মীসংঘের সেবকদের কাছে 'জ্যাঠাইমা' ও ৺বসন্তকুমারী দাসী 'বড় কাকিমা' নামে পরিচিতা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১ খ্রীঃ) পর বৈদ্যবাটীতে যে দেশসেবকগোষ্ঠী বৃটিশ রাজরোষ উপেক্ষা করে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচার করতেন, তাঁদেরই মুখপত্র এই পত্রিকা। পূর্ববর্তী অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে কর্মীসংঘের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কর্মীসংঘের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লবণ সত্যাগ্রহে যে স্বেচ্ছাসেবকরা দীঘার পথে আরামবাগ থেকে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁরাও ছিলেন। জাতীয় নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন নানাবিধ জনহিতকর কর্মে এঁরা যোগ দিয়েছিলেন। বৈদ্যবাটী পত্রিকায় তার পরিচয় পাই।

পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'দেশসেবা' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই সংখ্যাটি জরাজীর্ণ, পাতাগুলি বিবর্ণ। এই সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় স্তম্ভে মুদ্রিত এই নিবন্ধের যতটা পাঠযোগ্য, তা এখানে উদ্ধৃত হল:

> "[*] কথায় নয়, দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। স্বার্থগন্ধ থাকবে না, নামযশের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, আর দিকে তার দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভাল মন্দ, সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারবে দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।
>
> রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নাবতে হবে—দেশের স্বাধীনতার জন্য নারীপুরুষের সম্মিলিত সাধনা চাই, তা নইলে কিছু হবে না। আমি জানি ছেলেরা আর মেয়েরা যদি একসঙ্গে কাজে নামে, তাহলে দেশের লোকে নানা রকমের কুৎসা রটাবেই—তা রটাক। নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের কাজ বন্ধ রাখবো? দেশের জন্যে যে সুনামের প্রতিষ্ঠাই ত্যাগ কর্তে পারে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়?

দেশের স্বাধীনতা কেউ চায় না—সবাই চায় নাম প্রতিষ্ঠা, বড় বড় বচন ঝেড়ে নেতা হ'তে—সত্যিকার কটা লোক পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করে? দেশের কি দেখে আশান্বিত হব? আমাদের দেশের ছেলেরা ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরবে তবু দেশের জন্য মহিমাময় মৃত্যুবরণ কর্তে পারবে না। দেশের জন্য লাঞ্ছনা সওয়া, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সে কি সোজা সৌভাগ্য? দেশ উঠবে কি করে? দেশের জন্য কি কেউ প্রা [ণ দিতে চায়?] দেশের জন্য কি কেউ ত্যাগস্বীকার কর্তে চায়? [*] যেদিন দেশের নগরে স্বার্থত্যাগী [*] জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাজ সেই [দিন হবে।]"

প্রথম সংখ্যা চতুর্থ পৃষ্ঠায় হেমন্তকুমার সরকারের নিবন্ধ 'পরাধীনতার পাষাণ'। এ অংশটিও জরাজীর্ণ, তবে আজো পাঠোদ্ধার করা যায়। নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হল:

"গলায় কলসী বেঁধে দিয়ে নদী সাঁতরে পার হতে বলা যেমন একটা বদ্ ফরমাস, তেমনি অবিচারের জগদ্দল পাষাণ জাতির বুকে চাপিয়ে দিয়ে তাকে স্বরাজের জন্য অগ্রসর হতে বলাও তাই। জগতে এত দেশ থাকতে আমরাই বা পরাধীন কেন—আর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, তবু আমাদের বাঁধন খোলে না—এর মূলে কি আছে? কেউটে সাপের বাচ্চার লেজে পা ঠেক্‌লেই যেমন সে ছোবল মারবেই, কিন্তু ঢোঁড়ার লেজটা রগ্‌ড়ে দিলেও সে কেবল পালাবার পথ দেখবে। কিংবা বড় জোর একটা অহিংস কামড় দেবে। আমাদের জাতির স্বভাবটা ঢোঁড়া জাতীয় হ'য়ে পড়েছে। তবে বিষ নেই কুলোপানা চক্র আছে। জাতি মরেছে, জা'ত আছে। মানুষ নাই, দেশ আছে। বিদেশী শাসনে, সমাজের উচ্চবর্ণের অত্যাচারে, জমিদার, মহাজনের নির্মম শোষণে আমাদের মনটা ভোঁতা হয়ে পড়েছে—এবং ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যেমন দড়ি কাটা যায় না, তেমনি এই ভোঁতা মন দিয়ে পরাধীনতার বাঁধন কাটা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের বিজ্ঞগণ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলাদেশের সুখ সৌভাগ্যের কারণ। আমি বলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলার বুকের জগদ্দল পাষাণ। দু কোটি টাকা আদায়ের জন্য যে জাতি ১২ কোটি টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়—এত বড় অবিচার নির্বিবাদে সহ্য করে, সে স্বরাজ চাইবে কেন? আমাদের দেশে যে স্বরাজের কর্মসংকল্পে ভূমিস্বত্বের কথা নাই, সে স্বরাজ আন্দোলন কখনই সফল হ'বে না। নিরস্ত্র যুদ্ধেই যদি আমাদের জয়লাভ করতে হয়, তবে খাজনা বন্ধ করাই তার একমাত্র শেষ অস্ত্র। কিন্তু এখন সে অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে কার গায়ে লাগে? জমিদার সে আঘাতের ভাগী হবে। আমলাতন্ত্রের হাতে টাকা গুণে দিয়ে প্রজা যখন বিনিময়ে কিছুই পাবে না—তখন সে সচেতন হয়ে নিজের দাবী আদায় করতে পারে। এখন জমিদারের সে দাবী পূরণের ক্ষমতা নাই—কারণ রাষ্ট্র তার হাতে নয়, অথচ প্রজা জমিদারের অতিরিক্ত আর কিছু দেখতে পায় না। দু কোটি টাকা ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ১২ কোটি টাকা লয়—বিনিময়ে প্রজা অত্যাচার ভিন্ন কিছুই পায় না। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

*কীটদষ্ট। [ ] অনুমিত রচনাংশ।

‘বৈদ্যবাটী পত্রিকা’র আখ্যাপত্র

অবসান না হ'লে দেশের কল্যাণ নাই। এই জগদ্দল পাষাণ আগে সরাও—স্বাধীনতা-সংগ্রামে কোটি লোক আপনিই ছুটবে।"

শরৎচন্দ্র ও হেমন্তকুমার সরকারের রচনার সুতীক্ষ্ণ বাস্তব রাজনীতিবোধ, বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের স্বরূপ নির্ধারণ ও জাতীয় সংগ্রামের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন পত্রিকার সুর বেঁধে দিয়েছিল।

এবার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' লক্ষ্য করা যাক :

"দুর্গা দুর্গতিনাশিনী জগৎজননী আসিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ উৎসবের দিন। যাহার যেমন অবস্থাই হউক আনন্দময়ীর আগমনে সকলে আনন্দিত। এমন সময় এই শুভলগ্নে সহসা বৈদ্যবাটীর মত স্থান হইতে বিশ্বের কল্যাণসাধ লইয়া 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা' জন্মগ্রহণ করিবে কবির কল্পনাতেও তাহা কেহ ভাবেন নাই। সুতরাং এ সংবাদে সকলের—বিশেষত শিক্ষিত জনমণ্ডলীর বিশেষরূপে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবারই কথা। ভগবানের কোন্ আশীর্বাদে, কোন্ শুভেচ্ছায় আজ আমরা এখানে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম প্রবর্তকরূপে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি তাহা কে জানে! কে জানে তাঁহার কোন্ শক্তির বলে, কোন্ প্রেরণার বশে এই গুরুতর কার্যের ভার মাথায় লইতে সাহসী হইয়াছি। তবে এ যুগমহিমায় ভরসা করিতে পারি যে, দেশবাসী শিক্ষিত জনসাধারণ গ্রাহকগণের সহানুভূতি, জিতাত্মা মহাপুরুষগণের আন্তরিকতা, পরার্থপরতা ও তাঁহাদিগের ভগবদ্ভাবের আবেশ, লেখক লেখিকাগণের উৎসাহ, আনুকূল্য এবং সর্বোপরি সর্বপ্রাণ সর্বেশ্বরের শুভেচ্ছায় এই গুরুভার সহনীয় হইবে এবং সময়ে ইহা গ্রাম গ্রামান্তর ক্রমে সমুদায় বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারিবে।"

সম্পাদকীয়ের শেষভাগে লেখা হয়েছিল—"জনসাধারণ—ভাই ভগ্নী ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে সংবাদপত্র প্রচার বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।"

পত্রিকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ রাজরোষের কথা মনে রেখে আপাতনিরীহরূপে 'বৈদ্যবাটী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বৃটিশবিরোধী মনোভাব শরৎচন্দ্র ও হেমন্তকুমার সরকারের রচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম সংখ্যাতেই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিযান' কবিতায় তা ব্যক্ত :

যাত্রী ওগো যাত্রা তব
সুরু হ'ল আজ। দশদিক হতে যবে ছুটে আসে
দুরন্ত ক্রন্দন, প্রবলের ক্রুদ্ধ উৎপীড়নে দুর্বলের
ক্ষীণ কণ্ঠ চিরি, উদ্ধত অন্যায় যবে দৃপ্ত অহঙ্কারে
সত্যেরে বিদ্রূপ করে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রভায়, ভোগান্ধ
মানব যবে আপনার উন্মত্ত বিলাসে, ধ্বংস করি
সাধনার লীলাভূমি, কত শত তপস্যামন্দির, গড়ি

তোলে সযতনে সৌধমালা সারি সারি অতি ঘৃণ্য
কদর্য্যতা পূর্ণ যত সম্ভোগের তরে। সেই ক্ষণে পাপের
পূর্ণতা মাঝে—সত্যেরে বসাতে পুনঃ রাজসিংহাসনে—
হে যুগমানব! যুগান্তর স্রষ্টা ওগো হে মহাতাপস!
যাত্রা তব সুরু হল আজ।

এই কবিতার জাতীয়তা প্রেরণা-মন্ত্রটি পাঠকের শ্রুতিকে এড়িয়ে যায় না।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮ আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর 'টিপ্পনি' লিখেছেন শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। টিপ্পনির বিষয় —দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসমাপ্ত পল্লীসংগঠনব্রত, 'বিজলী'তে (পূজাসংখ্যা ১৩৩২) নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার প্রশংসা, মহাত্মা গান্ধীর চিরবাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমান-মিলনের পরিকল্পনার ক্ষীণপ্রাণতা সম্পর্কে কটাক্ষ।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা রাজনৈতিক কর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র দাসের 'বঙ্গে নষ্ট-রেশম ও পশমশিল্প', শ্রীসরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাবিবার কথা' (স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিম্নবর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কে প্রচারিত আবেদনের আলোচনা), শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জাতীয় শিক্ষা সংসদ' বিবরণী—হুগলির বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠান। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় বড়ো হরফে ঘোষণা :

"রাখি-বন্ধন

আগামী ৩০শে শুক্রবার রাখি-বন্ধন। এইদিন বঙ্গজননীর পুত্র কন্যাগণ জননী জন্মভূমির সেবার জন্য স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের হাতে প্রাণের মিলন-স্মৃতি রক্ষার জন্য এই পবিত্র রাখি-বন্ধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর জাগরণ ও মিলনের সেই পুণ্যস্মৃতি—এই রাখি-বন্ধন প্রথা বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়।"

প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'সেবক' শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকার দায়িত্বভার বর্জন ও বিদায় গ্রহণ, 'আমার কৈফিয়ৎ'এ তাঁর উক্তি—'আমি মুক্তিকামী, আমি চণ্ড, আমি বিপ্লবী।……শান্তির মন্ত্র, সংযমের সাধনা আমার জন্য নয়।" (১৬ অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ)

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা (রবিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) থেকে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী (সেনশর্মা)-র দীর্ঘ কবিতা 'মহাভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। এ এক নব মহাভারত —সূচনাংশ (আশা) :

চাষী ভাই তাঁতী ভাই আর ভাই যত।
ভারতের দুঃখ কথা শুন অবহিত॥
গাহিব ভারতকথা দুখময় বাণী।
বাজিবে হৃদয়বীণা বিষাদ রাগিণী॥

ভাঙ্গিবে মোহের বাধা নয়নের জলে।
মিলিত হইবে সবে গলি' দুখানলে ॥…
কোথায় সে দিন হায়, কোথায় সে দিন।
স্বরাজে যে দিন সব দুঃখ হবে লীন ॥
ভারতের দুঃখকথা দুঃখী জন গায়।
পায়ের শিকল যেন খসে গো ত্বরায় ॥

প্রথম বর্ষ উনবিংশ সংখ্যার (রবিবার ২ ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) পরবর্তী সংখ্যা দেখি নাই। বোধ হয় এর পর পত্রিকা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সংখ্যার পত্রিকার মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা (৫৫)। একটি পুরনো সংখ্যায় (১৯২৬ খ্রীঃ) আব্দুল হালিমের একটি প্রবন্ধ "মুক্তিপথ"—প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে: "কৃষক ও শ্রমিক দলকে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।" প্রবন্ধ সূচনায় লেখা আছে: "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"

কিছুকাল বিরতির পর শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বৈদ্যবাটী পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হয়। এবার প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক মূল্য দু টাকা। নব পর্যায় প্রথম সংখ্যাকে বলা হয়েছে—১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা। সোমবার ৫ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রী', ১৯ কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয়েছে বারো।

এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের (দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র) আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯·৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল সম্মিলন (The Fisrt All India Workers' and Peasants Party Cenference)-সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

নব পর্যায় প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়—'কি করা চাই'। জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন সম্পাদক। "আজ দেশের নেতৃত্ব নিতে হবে দেশের লোকের নিজের হাতে।……ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চাই গণআন্দোলন, Mass Movement। দেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্য দরকার অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, শোষকশ্রেণীর হীন শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম।……এ আন্দোলন পরিচালনা করবে দরিদ্র নগণ্য বুভুক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণ, যাদের নাম স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় দরিদ্রনারায়ণ। কার্ল মার্ক্সের ভাষায় প্রলিটারিয়েট।"

পত্রিকার চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত এখানে পাই। এই সংখ্যাতেই সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সম্প্রতি (অক্টোবর ১৯২৮ খ্রীঃ) রাজবন্দী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (চুঁচুঁড়া) ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) মুক্তিলাভ করেছেন। এ সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক নিবন্ধ 'আমাদের কর্তব্য'—প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে "সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে—স্বাবলম্বী হওয়া।" জেলার লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের আহ্বান তিনি দিয়েছেন।

এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'বাঙলার সভ্যতা-গৌরবের শুভ্রতম বিভা' শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে।

পত্রিকার (সোমবার ১২ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রীঃ), ২৬ কার্তিক ১৩৩৫-সংখ্যায় সম্পাদকীয় 'আমাদের কাম্য স্বাধীনতা' খুব স্পষ্ট ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নয়, পূর্ণ স্বরাজই কাম্য।

এই সংখ্যার শেষে পরবর্তী সংখ্যাগুলির লেখকদিগের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। এটি লক্ষণীয়:

নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কালীকুমার সেন, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কাজি নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সোমবার ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (১ম বর্ষ ৩৮-৩৯ যুগ্মসংখ্যা) তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় কাজি নজরুল ইসলামের 'নগদ কথা' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। তা এখানে উদ্ধার করি।

দুন্দুভি তোর বাজল অনেক
অনেক শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর।
মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে
মুখর আজি পূজার আসর,—
কুম্ভকর্ণ দেব্‌তা ঠাকুর
জাগবে কখন সেই ভরসায়
যুদ্ধ ভূমি ত্যাগ করে সব
ধন্না দিলি দেব-দরজায়।
দেবতাঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়ে ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোনে কি—কে
কাঁদছে নীচে গভীর দুখে!
হত্যা দিয়ে রইলি পড়ে
শত্রু হাতে হত্যা-ভয়ে,
করবি কি তুই ঠুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশীষ লয়ে!
দোহাই তোদের! রেহাই দে ভাই
উঁচুর ঠাকুর দেব্‌তাদেরে,
শিব চেয়েছিস শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে!

শিবের জটার গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরী
ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি !
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে হাত তোদের হল ঠুঁটো,
সে হাত এবার নীচু করে
টান না পায়ের শিকল দুটো !
ফুটো তোর ঐ ঢক্কা নিনাদ
পলিটিক্সের বারোয়ারীতে —
দোহাই থামা ! পারিস যদি
পড় নেমে ঐ লাল নদীতে
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই গেলি ক্রমে ।
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ না ভ্রমে !

বৈদ্যবাটী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (নব পর্যায় প্রথম বর্ষের) আর কোনো সংখ্যা দেখবার সুযোগ হয়নি। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক ১৯২৫-২৮-৩০ খ্রীস্টাব্দে হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে ও শহরে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। এর প্রকাশে দেশসেবী কর্মীদের উৎসাহ অবশ্যস্বীকার্য। সেই সঙ্গে স্মরণীয় অবরোধবাসিনী নারীদের সক্রিয় সহযোগিতা। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বেকার মফঃস্বল বাংলার এই সাপ্তাহিক পত্রিকার ইতিহাসমূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

শব্দ-সংগ্রহ

অমলেন্দু ঘোষ সংগৃহীত ও সংকলিত

(১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিতের পর)

[প্রসঙ্গকথা ॥ শব্দ-সংগ্রহ প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল চাষের ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি সংক্রান্ত শব্দাবলী ; দ্রঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ১-৪ সংখ্যা। বর্তমানে প্রকাশিত হলো—মৌখিক কথাবার্তায় ব্যবহৃত, কিন্তু অভিধানে সংকলনযোগ্য শব্দাবলী। প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে দিয়েছেন প্রাক্তন পত্রিকা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়—প্রকৃত শিক্ষকসুলভ সতর্কতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ; এজন্যে বর্তমান লেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ। যাই হোক, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে শব্দ-সংগ্রহ প্রথম পর্যায় প্রকাশের পর এই দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশে যথেষ্ট দেরি হওয়ায় ধারাবাহিকতায় যে ছেদ পড়েছে, একথা অনস্বীকার্য। সম্ভবত পত্রিকার স্থানাভাবই এজন্যে দায়ী। বর্তমান সংগ্রহ অকারাদিক্রমে সংকলিত। যথাসম্ভব কম, কিন্তু প্রয়োজনমতো ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সংগৃহীত শব্দার্থ স্পষ্টতর করার জন্যে। সংকলনে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ ও অর্থ, যথা—তুল° তুলনীয়, দ্র° দ্রষ্টব্য, প্র° প্রয়োগ, প্রবাদ, বিপ° বিপরীত, মূল° মূলত, ই° ইত্যাদি। শ্লোকচিহ্নসূচক দুই-দাঁড়ি (।।) ব্যবহার করা হয়েছে একাধিক প্রসঙ্গ পৃথক্‌ভাবে দেখানোর জন্যে।]

ক

কুক্— চিৎকার। কুক্ দিয়ে কান্না, ডুকরে কাঁদা ই°। তুল° ডাকাতের কুক্। প্র° ছেলেডারে এমন মার মারেছে যে এখনো সে কুক্ দিয়ে দিয়ে কাঁদতেছে (কাঁদিতেছে)।

কুদ্‌রোমো—ন্যাকামো। প্র° বুড়ো বয়েসে আর কুদ্‌রোমো করিস নে।

কাঁড়ি—গাদা। এক কাঁড়ি—এক গাদা। কাঁড়ি গেলা—প্রচুর পরিমাণে খাওয়া। তুচ্ছার্থে প্রযোজ্য। প্র° সংসারে তোমার দ্বারা এট্টা কুটো-গাছ ভাঙ্গার সাহায্য পাওয়া যায় না, অথচ চার বেলা কাঁড়ি গেলা আসে কোথাত্যে (কোথা থেকে) তার হিসেব রাখো ।। কিষেণডা (জনমজুরটা) নুন দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত খায়ে (খাইয়া) ফ্যালে।

কাঁড়ি-কাঁড়ি—গাদা গাদা। প্র° মেয়েডা বটে কাঁড়ি-কাঁড়ি শিল্প কাচতি (কাচিতে) পারে !

কাঁড়ো—মুষ্টিপ্রমাণ (handful)। প্র° ছেলেডা যে পথে বসে' কাঁড়ো কাঁড়ো ধুলো ঘাঁটতেছে ওরে কি দেখার কেউ নেই ।। ছেলেডা এমন চালাক যে ফ্যালা-ছড়া করে' তো চিড়ে-মুড়ি খাচ্ছে, আবার কাঁড়ো ভরে' পকেটে করে' নিয়ে যাচ্ছে।

কাড়া—প্রথম প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা। প্র° পুরনো হাঁড়ি ফেলে নতুন হাঁড়ি কাড়লাম। পা কাড়ানো, অর্থাৎ—কোথাও যাত্রা করা। প্র° ছেলেপিলেগুনোর জ্বালায় আমার আর

কোথাও পা কাড়ানোর জো নেই ॥ ছাখ্, এই ভর-দুপোর (ভর-দ্বিপ্রহর) বেলায় তুই আর কোথাও পা কাড়াইছিস কি আমি তোর ঠ্যাং এ্যাবারে (একেবারে) ভাঙে (ভাঙ্গিয়া) দেবো। [রা-কাড়া—শব্দমাত্র করা। প্র° ফের তুই রা' কাড়িছিস কি তোর মুখ আমি এ্যাবারে জম্মের (জন্মের) মতো বন্ধ করে' দেবো।]

কাতর—অসহায়। প্র° ছেলেডা জ্বরে বড্ডো কাতর হয়ে পড়েছে।

কাবার—খতম, শেষ। প্র° এস্তক বিন্‌তি কাবার॥ শেষ কাবারি, শেষ কাবার—শেষ পর্যায়। প্র° বাজার বয়েছে (বসেছে) কখন, আর তুমি আয়েছো (আসিয়াছ) এখন এই শেষ কাবারে বাজার করতি (করিতে)॥ তুল° 'শেষা' হাট, 'শেষা' বাজার।

কিতে—পালা, বিনিময়, পর্যায়ক্রম (by turn)। প্র° এ কিতেয় আমি তোমার বাগানের কাজ করে' দিচ্ছি, সামনের কিতেয় তুমি আমারে পোষায়ে দিবা কিন্তু॥ এক কিতেয় না হয় দু' কিতেয় শেষ করবা (করিবে); দু' কিতেয় না হয় পরে আবার কিতেয় কিতেয় করে' দেবা (দেবে)॥ তোমার কিতে শেষ হলি' (হইলে) আমি আবার কিতে ধরবো॥ তুল° গাঁতা।

কুযুতে—হিংসুক, হিংসুটে, কুচক্রী ই°। প্র° কুযুতে লোক, কুযুতে বুদ্ধি॥ তুল° দুষ্কুত্যে বুদ্ধি—দুষ্কৃতকারীর বুদ্ধি।

কুঁদো—পরিমাণ। খোরাক—তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত। প্র° খাটতি (খাটিতে) চাও না, অথচ চারবেলা চার কুঁদো আসে কোথাত্যে তা বোলো না ?

কৈঁতাকেতি—জড়াজড়ি, হুড়োহুড়ি, হৈ-হুল্লোড়। প্র° ভর-দুপোর বেলাডায় ছেলেপিলোগুনো এমন কৈঁতাকৈঁতি লাগায়ে (লাগাইয়া) দেছে, এট্টু যে নিশ্চিন্তি শোবা (শুইবে) তার জো নেই।

কোঁদা—রোখা। গোঁয়ার্তুমি অর্থে। প্র° তোর চোখ-কোঁদা/ঘাড়-কোঁদা লোকে দেখতি (দেখিতে) যাবে কোন্ হিসেবে। তারা তোর খায়, না পরে ?

কোঁস্তা—ঝাঁটা, সম্মার্জনী। ঝাঁটা-কোঁস্তা—বিশেষ অনাদর ও তুচ্ছার্থে গালি বিশেষ। প্র° দিনরাত সগুলির (সকলের) কাছে এত ঝাঁটা-কোঁস্তা খাস, তবু তোর লজ্জা হয় না॥ দ্র° ঝাঁটা কোস্তা, ঝাঁটা-লাথি।

খ

খোঁটা—কুড়ানো। মূল° খুঁটা। প্র° ছড়ানো চালগুলো খুঁটে খুঁটে তোল্ দিনি (দিকিনি) দেখি।

খোঁটা—আঘাত, গঞ্জনা। খোঁটা দেওয়া—আঘাত দিয়ে কথা বলা, গঞ্জনা দেওয়া। প্র° ফের তুই আমারে বাপের বাড়ির খোঁটা দিয়ে আর কথা বল্‌বিনে বলে' দেলাম॥ খোঁটা দিয়ে কথা বলার অভ্যেসটা তুই ছাড় দিনি—ওতে লোকে মনে মনে বড্ডো আঘাত পায়—ফলে, কেউ তোরে দেখতি পারবে না, বলে দেলাম এট্টা কথা।

থাল্—গর্ত। অসীম, অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত। প্র° থালে খাও, উমোন (আন্দাজ) পাও না, কতো ধানে কতো চাল ॥ অর্থাৎ, দায়-দায়িত্ব ও ভাবনা-চিন্তাহীন জীবন।

খাতির-মুরোদ—পারস্পরিক প্রীতি। তুল° দহরম্-মহরম্।

খালি—কেবল, শূন্য, অযথা ই°। প্র° খালি পেটে সারাদিন কাজ করাডা ভালো না, এট্টু কিছু পেটে দিয়ে নে ॥ তোর জন্যি (জন্যে) আমি সারাডা দিন খালি পথ চায়ে আছি, অথচ তোর দেখা নেই; এত দেরি হলো কেন তোর আসতি (আসিতে)?

খালি-খালি—কেবল-কেবল, অযথা, অনর্থক (for nothing) ই°। তুল° সুধু-সুধু। প্র° খালি-খালি ঝগড়া-ঝাঁটি করে' কোন লাভ আছে ॥ তুই পড়াশুনো করবিনে, অথচ তোর জন্যি মাস্টারের কাছে আমি খালি-খালি কথা শুনি ॥ পড়াশুনো না করিস তো সোজা বলে' দে, বই কিনে খালি-খালি পয়সা নষ্ট করি নে।

গ

গদ্—রুচি। প্র° গদ্ না থাকে তো এবেলা আর ভাত খাস্নে। 'গদের উপর গদ্, কতো লাগে স্বদ (স্বোয়াদ, স্বাদ)'—প্রবাদ ॥ অর্থাৎ, অরুচির মুখে কোন খাবার জিনিসের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না।

গণ্ডমুখ্যু—গণ্ডমূর্খ। তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত। তুল° হস্তীমুখ্যু—হস্তীমূর্খ। প্র° তোর মতো এমন গণ্ডমুখ্যু আমি আর দেখিনি।

গলাধাঁতা—বয়স্ক। প্র° ঘরে দু'-দুটো গলাধাঁতা মেয়ে। আমার কি আর গলাদে' (গলা দিয়ে) ভাত সরে, না নিশ্চিন্তি ঘুমনোর জো আছে ॥ তুল° ধাড়ি।

গা'—আগ্রহ, গরজ, উৎসাহ (initiative)। তুল° চাড়, উদ্সাহ। প্র° তুই নিজি যদি কোন কাজে গা' না করিস তালি (তা'হলে) কোনই ফায়দা হবে না ॥ 'গা তোল মা নন্দরাণী'—পাঁচালী ॥ চাড়—প্র° নিজের চাড় না থাকলি (থাকিলে) কোন কাজ হয়?

গাদি—বৃহদাকার বিশিষ্ট গাদা, বোঝাই। প্র° ধানের গাদি, পাটের গাদি।

গাঁড়ো—মুঠো। তুল° কাঁড়ো। প্র° দোকানেত্তে (দোকান থেকে) চিনি আন্তি না আন্তি তুই গাঁড়ো ভরে' খাচ্ছিস, একি লজ্জার কথা ॥ এক কাঁড়ো চাল/ডাল ই°। গাঁড়ো-গাঁড়ো—মুঠো-মুঠো। তুল° কাঁড়ো-কাঁড়ো। প্র° তুই গাঁড়ো-গাঁড়ো চাল নষ্ট কত্তিছিস, অথচ বুঝিসনে কোথাত্তে আসে!

গাঁতা—পর্যায়ক্রম, বিনিময়, পালা। তুল° কিতে। রস পাবার জন্য খেজুর গাছ কাটার সময় বিশেষ। প্র° এ গাঁতায় আমি তোমার কাজ করে' দিলাম, সামনের গাঁতায় তুমি আমারে দেবা (দিবে) ॥ গাঁতায় গাঁতায় ছেলেডার জর হচ্ছে, এতো ভালো কথা না, বড়ো ডাক্তার দেখাও ॥ আগের গাঁতায় আমার পাঁচটা খেজুর গাছে ভালো রস হইলো (হইয়াছিল), এ গাঁতায় ভালো হলো না।

গোটো—একত্র, জড়, উপরে তোলা ই°। গোটো করা—এক জায়গায় জমা করা। প্র° পার (পায়ের) কাপড়ডা আর এট্টু গোটো কর না বাপু, জলের মধ্যি দিয়ে কোঁচা দোলায়ে যাবার কি মানে হয় ? ॥ উঠোনডা ঝাঁট দিয়ে গাছের পাতাগুনো এক জাগায় (জায়গায়) গোটো করে' রাখো বাপু।

গেড়—অঞ্চল। গেড়দে'—অঞ্চল দিয়ে, অঞ্চলব্যাপী। প্র° এ গেড়দে' এমন এট্টা লোক পালাম (পাইলাম) না যে আমার হয়ে দুটো কথা বলে॥ আমার কালো গোরুডার মতো এট্টা দুধলো গোরু এ গেড়দে' আর কারুর (কারোর) নেই।

ঘ

ঘষ্টি-ঘষন—আলসেমী, গড়িমসি। তুল° হচ্ছে-হবে। প্র° সব কাজে তোর ঘষ্টি-ঘষন ভাব আমার ভালো লাগে না ; কাজডা করিস তো কর, না করিস তো সাফ বলে' দে পারবো না॥ এই সামান্য কাজে তোর হচ্ছে-হবে করার কি আছে, তাতো আমি বুঝিনে বাপু।

ঘাড়তেড়ি—ঘাঁড় বাঁকানো, ফুলনো। অশিষ্ট আচরণ, উদ্ধত স্বভাব। তুল° কোঁদা, রোখা। প্র° কথায় কথায় তোমার ওই ঘাড়তেড়ি ভাব আমার বাপু ভালো লাগে না।

ঘাপান—বেদম প্রহার। ঘাপানো—বেদম প্রহার করা। তুল° ঠ্যাঙ্গান, ঠ্যাঙ্গানো। গো-বাড়োন, গো-বাড়োনো। প্র° ঘাপানের কাছে সব জব্দ॥ 'ঘাপান খালি বোঝবা হরি কেমন ধন'—প্রবাদ।

ঘায়—জন্য, জ্বালায়, ক্ষত। প্র° তোর ঘায় (জন্য, জ্বালায়) আর পারিনে বাপু॥ 'মাথার ঘায় (ক্ষত জ্বালা) কুকুর পাগল'—প্রবাদ। অর্থাৎ, নিজের জ্বালায় নিজেই বিব্রত হওয়া।

চটা—বাঁশের বাখারি।

চাক[১]—গোলাকার পাতলা টুকরো। মূস° চক্র, চক্রাকার ই°। চাক-চাক—গোলাকার পাতলা টুকরো-টুকরো অবস্থা। তুল° ফালা-ফালা। প্র° আলু, কুমড়ো, বেগুন, শশা ই° চাক্-চাক্ করিয়া কাটা।

চাক[২]—বাসা। ভীমরুল বোলতা, মৌমাছি ই° চাক। প্র° এপাড়াডা হয়েছে যতো বদ-মায়েশদের বাসা, কিন্তু শিগগিরই চাকে ঘা পড়বে, তখন বাছাধনরা বোঝবেন ঠ্যালাডা॥ বোলতা ভীমরুল ই° চাকে ঘা পড়া/পড়লে আর রক্ষে নেই। আমার বাগানের বেলগাছে যে মৌমাছির চাক বাঁধেছে (বাঁধিয়াছে) তাত্যে (তাহা হইতে, থেকে) আমি তোমারে এট্টুখানি দেবো, খায়ে (খাইয়ে, খাইয়া) দেখো, কী জিনিস।

চাক[৩]—যন্ত্রবিশেষ। প্র° কুমোরের চাক (মাটির জিনিসপত্র তৈরির যন্ত্রবিশেষ)।

চাগানো[১]—উত্তোলন করা, ভার বহনের ক্ষমতা। প্র° আড়াই-মণি (মণি, মণ যুক্ত) বোঝা চাগানোর সাধ্যি আমার নেই। তুল° তাগুড়ানো।

চাগানো[২]—শখ, হঠাৎ খেয়াল চাপা। পুরনো কোন রোগ, অভ্যাস বা স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা। প্র° ওদের ছেলের দামী জামা-কাপড় দেখে তোর আবার তাই (ওই জিনিস) চাগায়ে (চাগাইয়া) উঠলো দেখি, কিন্তু আমার সে সাধ্যি নেই (কিনিয়া দেবার)॥ তোর আবার এ শখ চাগালো/চাগালো কবেত্যে (কবে থেকে)॥ কানাইর মার মিরগির (মৃগীর) ব্যারামডা/ব্যায়রামডা আজকাল আবার চাগাচ্ছে শোনলাম, তা' কেমন আছে সে এখন॥ আর থাকাথাকি, ভুগে ভুগে এখন রোগের দাঁড়া (গতি, ভাব-ভঙ্গি) এমন হয়েছে যে, ব্যায়রাম চাগালিই হলো, ওর আর কোন দিন-ক্ষণ (সময়-অসময়) নেই॥ তুল° চাংকানো, বাই (বাতিক, শখ) চাগানো —বাতিক চাপা।

চাংকানো—চাগানো দ্র°। প্র° যখন যার যে জিনিসটা তুই দেখিস তোর তখনি তাই চাংকায়ে ওঠে॥ তোর এই বাই-চাংকানো আদেখ্লে ভাব আমার মোট্টেই (মোটেই, আদৌ) ভালো লাগে না।

চাঁছা—পরিষ্কার করা। চাঁছা-ছোলা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, খোসা ছাড়ানো। সাফ্। প্র° ঝুনো নারকেলডা চাঁছে-ছুলে (চাঁছিয়া ছুলিয়া) পরিষ্কার করদিনি (দিকিনি, দেখিনি)॥ তল্লা বাঁশটা আমি কাটে (কটিয়া) রাখিছি (রাখিয়াছি) তুই এখন ওডারে চাঁছে-ছুলে পরিষ্কার করে' রাখপি (রাখবি)। আর শোন ওত্যে (ওর থেকে) পাঁচ খানা করে' (হিসাবে) চটা (বাখারি) বার করবি, ভালো করে, চাঁছে-ছুলে রাখপি॥ প্র° তোর কথাগুনো (-গুলো) বড্ডো চাঁছা-ছোলা (কাটা কাটা) এ্যাবারে রস-কষ ছাড়া (বিহীন)।

চাটাম্—বড়ো বড়ো কথা বলা, সবজান্তার ভাব দেখানো। প্র° সব ব্যাপারে তুই এমন চাটাম্ করিস মনে হয় যেন তুই কতো জানিস। অথচ পেটে তো ক-অক্ষর গো-মাংস নেই। তুল° চিট্‌গি, চিটগি-চাটাম্।

চিট্‌গি—ঢং, ভণিতা, লম্বা-লম্বা কথা বলা ও ওই জাতীয় ভাব দেখানো। প্র° দু'বেলা যে ভালো করে' (ভাবে) পেটপুরে খাতি (খাইতে) পায়না, তার আবার এ-খাবোনা ও-খাবোনা অতো চিট্‌গি আসে কোথাত্যে? তোর ওসব চিট্‌গি-চাটাম আমার ভালো লাগে না। মেয়ের আমার চিট্‌গি কতো, বলে পান্তা খাবো না!

চিট্‌গি-চাটাম্—অসহ্য, অতিরিক্ত ভণিতাপূর্ণ কথাবার্তা বলা ও সব-জান্তার ভাব দেখানো। তুল° চিট্‌গি ও চাটাম্। প্র° চিট্‌গি-চাটাম্ করে' আর কতদিন চালাবা (চালাইবা, চালাইবে)। এখনো সময় আছে বাপু, দিন থাকতি (থাকিতে) সভ্য-ভব্য হবার চেষ্টা করো, লাফা-কথা (ফালতু কথা) ছাড়ো।

চিরকুট—টুকরো, ময়লার চূড়ান্ত। চিরকুট কাগজ, চিরকুট কাপড় ই°। প্র° আমায়ে এক চিরকুট (টুকরো) কাগজ দে দিনি (দিকিনি), ঠিকানাডা লিখে নি॥ প্র° তুই এরাম (এরকম) চিরকুট জামা-কাপড় পরিস কি করে' (ভাবে), এট্টু সোডা-সাবান দিয়ে

কাচতি (কাচিতে) পারিস নে ? এই চিরকুট (ময়লা পোশাক-পরিচ্ছদ) পরে' তুই স্কুল-কলেজ/অফিস-আদালত/লোকালয়ে বারোস (বের হস, বেরোস) কি করে' (ভাবে) ? তোর লজ্জা করে না ?

চীগ্‌রোনো—চিৎকার করা। প্র° এখন এট্টু পড়তি (পড়িতে) বইছি (বসিয়াছি), কানের কাছে এখন তোর চিগরোনো আমার সহ্য হয় না/চিগরো-চিগরি (চিৎকার) ভালো লাগে না ॥ চীগ্‌রোতি-চীগ্‌রোতি--চিৎকার করিতে করিতে/চীগ্‌রোয়ে-চীগরোয়ে—চিৎকার করিয়া করিয়া। প্র° ভর-দুপোর (দুই প্রহর) বেলা তুই এখন ক'নে (কোনখানে) গিইলি (গিয়াছিলি) বল্‌দিনি। তোর জন্যি চীগ্‌রোয়ে-চীগরোয়ে/চীগ্‌রোতি চীগরোতি আমার গলা যে ফাটে' (ফাটিয়া) গেল।

ছ

ছড়া-ঝাঁটি—ফেলা-ছড়া, নষ্ট হওয়া। প্র° একা মানুষ, চারিদিকে জিনিসপত্র ছড়া-ঝাঁটি যাচ্ছে, অথচ এখনো কিছু গোছায়ে (গুছাইয়) উঠতি (উঠিতে) পারলাম না ॥ পয়সা হয়েছে, তাই তোমার বাড়ি আজকাল দেখি চারিদিকে জিনিসপত্তর সব ছড়া-ঝাঁটি যায়—তোমরা খেয়ালই করো না।

ছত্রখান—বিক্ষিপ্ত ; চারিদিকে ছড়াইয়া থাকা, ভাঙ্গিয়া টুকরো টুকরো হওয়া। প্র° জিনিসপত্তর চারিদিকে যেন ছত্রখান হয়ে আছে, কে সামলায় ॥ কাঁচের গেলাসটা ভাঙে' (ভাঙ্গিয়া) চারিদিকে এ্যাবারে ছত্রখান হয়ে পড়েছে।

ছতুন, ছোতন—মাতব্বর, ওস্তাদ, মস্তান। কদর্থে প্রয়োগ। প্র° তুমি কি এমন ছতুন/ছোতন হয়েছ যে গুরুজনের কথা শুনতি (শুনিতে) চাও না ; এর পরিণাম ভালো হবে না বলে' দেলাম।

ছয়কোট— আড্‌ডা। কদর্থে প্রয়োগ। প্র° এই অবর বেলায়/বেলা বায়োভায় আবার কোন্ ছয়কটে যাওয়া হচ্ছে শুনি ?

ছয়-বেছয়—আবোল-তাবোল, প্রলাপ। প্র° জ্বরের ঘোরে ছেলেডা বড্‌ডো ছয়-বেছয় বক্‌তেছে (বকিতেছে), এট্টু নজর রাখা দরকার।

ছয়লাপ—প্রচুর। ছয়লাপি—প্রাচুর্য। প্র° এবার তো দেখতিছি (দেখিতেছি) গাছে গাছে আম ছয়লাপ/আমের ছয়লাপি ॥ তিন-ছয়লাপ—প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। প্র° আম-কাঁটালে এবার তো দেখ্‌তিছি এ্যাবারে তিন-ছয়লাপ কাণ্ড/তিন-ছয়লাপি ব্যাপার।

ছাক্-ছেলাবাত—সন্দিগ্ধ ও অসন্তোষের সঙ্গে, খুঁত-খুঁত ভাব নিয়ে বাছ-বিচার। প্র° মেয়েমানুষির আবার এ-খাবোনা ও-খাবোনা বলে' অতো ছাক্-ছেলাবাত কিসির (কিসের, কেন) ?

ছাওত, ছাগোত্—শোধবোধ, হাসফিল (uptodate)। প্র° আমার কাছে তোমার যা পাওনা ছিলো এই স্যাও ছাওত করে' দেলাম/হয়ে গেল, আর কথা বাড়াতি (বাড়াইতে)

আসে' (আসিও এসো) না ॥ তোমার খাজনা তো আমি হালফিল ছাওত করে' দিছি, আবার চোখ-রাঙাও কেন ? দেনা-দায়িক (দায়িত্ব) ছাওত থাকাই ভালো।

ছাপানো—পরিপূর্ণভাবে ভর্তি। ছাপাইয়া যাওয়া—পরিপূর্ণভাবে, ভর্তি হওয়া। তুল° কানায় কানায় ও টই-টম্বুরভাবে ভর্তির অব্যবহিত পরের অবস্থা। উপ্‌চে পড়া অবস্থা। পরিপূর্ণভাবে ভর্তি হওয়া এবং অতিরিক্তটুকু পড়ো পড়ো হওয়া। প্র° বিষ্টির জলে পুকুরির (পুকুরের) জল কানায় কানায় ছাপায়ে উঠেছে।

ছাপ্‌পা—দোষ, ত্রুটি। পরনিন্দা, পরের দোষ ধরা অর্থে। মূল° ছাপ। প্র° পরের পিছনে ছাপ্‌পা দিতি (দিতে) পারলি (পারিলে) লোকে আর ডানি-বাঁয় (ডাইনে-বাঁয়, এদিক-ওদিক, নির্বিচারে) চায় না।

ছে—কোপ। এক-ছে—এক কোপ। প্র° দা/কুড়ুল হাতে পায়ে (পাইয়া) ফলন্ত গাছগুনো তুই এ্যব্যারে ছেয়ায়ে (ছে দিয়ে, কাটিয়া) রাখিছিস ; এট্টু বিচার-বিবেচনা কল্লিনে ॥ আখের গোড়ার দিক্‌তে/দিকিত্যে (দিক থেকে) এক-ছে আমারে ছ্যাও দিনি। তুল° কলম্‌ছে—কলমের মতো চোখা ও একপেশে করিয়া কাটা।

ছেয়ানো—ছে দেওয়া, কাটা, কাটিয়া শেষ করা। জঙ্গল, আগাছা ই° ছেয়ানো (কাটা), কাটিয়া সাফ করা। প্র° হাঁসো' (হাঁসুয়া) দিয়ে আমার বাগানের জঙ্গলগুলো এট্টু ছেয়ায়ে দেদিনি।

ছ্যাঁদোড়—অবশিষ্ট। প্র° ছ্যাঁদোড় রাখে' (রাখিয়া) কাজ করা আমি পছন্দ করি নে ॥ ছ্যাঁদোড় মারে' (মারিয়া, শেষ করিয়া) কাজ করাই ভালো।

ছাল্‌মাট্—হেস্তনেস্ত, মীমাংসা। প্র° তোমাদ্দের (তোমাদের) ঝগড়া-ঝাঁটি তো অনেকদিন ধরে' চল্‌তেছে (চলিতেছে) দেখ্‌তিছি, এবার এট্টা ছাল্‌মাট্ করে' ফ্যালো দিনি, তাতে তোমাদ্দের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না ; আর কিছু না-হোক শান্তি পাবা (পাইবা, পাইবে)।

ছিরকুট্টি, ছিরখুট্টি—অগোছালো। প্র° সংসারে চারিদিকি (চারিদিকে) ছিরকুট্টি/ছিরখুট্টি আমি আর দেখতি (দেখিতে) পারি নে।

ছুন্-ছান্—দারুণ বিশৃংখলা, ধ্বংস ই°। তুল° তিন-ছয়-নয়। প্র° এ মেয়ে যে সংসারে যাবে সে সংসারডারে এ্যবারে ছুন্-ছান করে' দেবে ॥ যে সংসারে মাথার উপরে লোক (বয়স্ক ও অভিভাবকস্থানীয়) নেই, সে সংসার দেখ্‌তি দেখ্‌তি (দেখিতে দেখিতে, অল্পকালের মধ্যে) ছুন্-ছান্ হয়ে যায়/হ'তি (হইতে) বেশিক্ষণ লাগে না। নেশায় পড়ে' লোকটা বাপ-ঠাকুদ্দার আমলের দামী দামী জিনিসপত্তরগুনো দেখ্‌তি দেখ্‌তি এ্যবারে ছুন্-ছান্ করে' ফ্যাল্লেরে।

ছোলা—পরিষ্কার করা। চাঁছা-ছোলা—নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা। খোসা, খোদা ই° ছাড়ানো। প্র° ঝুনো নারকেল ছোলা ॥ কুঁচে-ছোলা—কুঁচের মতো ছাল ছাড়ানো, অর্থাৎ, মাথা হইতে পা পর্যন্ত ছাল ছাড়ানো। কুঁচে একরকম মাছ, দেখিতে সাপের মতো। এই মাছ জেলে, মালো প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেদের প্রিয়। কুঁচে মাছ

খাইতে হইলে পুরোপুরিভাবে ছাল ছাড়াইয়া খাওয়াই প্রথা ।। কাহাকেও সমুচিত শিক্ষা দিবার অর্থে বা প্রাণান্ত করিবার অর্থে বলা হয়—'কুঁচে-ছোলা করা' অর্থাৎ কুঁচে মাছের মতো করিয়া ছাল ছাড়ানো ।

জ

জগবরাটে—জড়ভরতজাতীয় বুদ্ধিসম্পন্ন। অনাদরে ও তুচ্ছার্থে গালাগালি বিশেষ। প্র° ছেলেডা যেন দিন দিন জগবরাটে হয়ে/মারে' (মারিয়া, রূপান্তিত হইয়া) যাচ্ছে। তুল° অলম্বুস, আজবোজ, গজকচ্ছপ ই°।

জাব্‌দা—মজবুত, পাকা। মূল° জাবেদা। তুল° দোকানদারের জাবেদা খাতা। প্র° লোকটার চেহারা বেশ জাব্‌দারকমের দেখ্‌তিছি (দেখছি, দেখিতেছি)॥ ওরে, বোচ্‌কাটা জাব্‌দা করে' ধর্‌।

জুত—আরাম, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, কায়দা-কানুন ই°। জুত-বরাত—সুবিধা-অসুবিধা, সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য ই°। প্র° এ কাজ করতি করতি (করিতে করিতে) আমার চুল পাকলো, তুই আর আমারে এ কাজের জুত-বরাত শিখোতি (শিখাইতে) আসিস নে।

ঝ

ঝ্যাটা-কোঁস্তা—সম্মার্জনীর প্রকার বিশেষ। অনাদরে গালিবিশেষ। কোঁস্তা দ্র°।

ঝ্যাটা-লাথি—বিশেষ অনাদর, তুচ্ছতাচ্ছিল্য। ঝ্যাটা-কোঁস্তা দ্র°। প্র° দিনরাত এতো ঝ্যাটা-লাথি/ঝ্যাটা-কোঁস্তা খাস, তবু তোর লজ্জা হয় না ?

ট

টই-টই—টো টো। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করিয়া সময় কাটানো। প্র° এই ভর-দুপোর বেলায় টই-টই/টো-টো করে' ঘুরে বেড়াতি (বেড়াইতে) তোর ভালো লাগে॥ মা-বাপ মরা ছেলে-মেয়েগুনো সারা দুপোর টো-টো করে' ঘুরে বেড়ায়, দেখলিউ (দেখিলেও) মায়া লাগে॥ মূল° টইল।

টই-টম্বুর—কানায় কানায় (brimful), বিষ্টিতি (বৃষ্টিতে) পুকুরির (পুকুরের) জল যেন টই-টম্বুর করতেছে (করিতেছে)। রসে টইটম্বুর, ফুর্তিতে ডগমগ ভাব। প্র° তোমার ছেলে তো বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে দেখতিছি, কথাবাত্রা (কথাবার্তা) যেন রসে টই-টম্বুর করতেছে (করিতেছে)।

টঙ্ক—শক্ত, দড়, পোক্ত ই°। প্র° ছেলেডা আজকাল বাপের চেয়েও দড় হয়ে উঠেছে। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'—প্রবাদ।

টো-টো—টই-টই দ্র°।

টস্‌-টস্‌—ডগমগ ভাব। রসে টস্‌-টস্‌, টস্‌-টসে রস ই°। প্র° আজকাল তোমার কথায় তো

দেখি রস যেন টস-টস করতেছে ॥ কি ব্যাপার হে ! কথায় কথায় তোমার এতো টস্-টসে রস , ভাব-লাভ হয়েছে নাকি কোথাও ॥ তোমার সঙ্গে তুটো যে সুখ-তুঃখির কথা কবো, তার তো উপায় নেই ; কখন কোন্ তুঃখির কথাডা শোন্‌বা আর তুচোখ বায়ে (বাহিয়া) তোমার টস্-টস্ করে' জল গড়াবে ॥

ঠ

ঠিক—যেমন তেমন। ঠিক করা—যেমন ছিলো তেমন করা। রিপু করা, মেরামত করা। প্র° আমার এই ছেঁড়া শালডা (শীতবস্ত্র শাল) ঠিক করে' দিতি (দিতে) কতো নেবা (লইবা) কও (কহ, বলো) ॥ এইরকম—ছেঁড়া জুতো, বাল্‌তির তলা ই° ঠিক করা, অর্থাৎ মেরামত করা। তুল° সোর করা।

ঠেকা১—বেকায়দা। দায়ে ঠেকা—দায়ে পড়া, ঠেকায় পড়া। প্র° বড্ডো দায়ে ঠেকে তোমার কাছে আইছি, (আসিয়াছি), এট্টা উপায় করো। এমন ঠেকায় আমি আর কখনো পড়িনি। এতদিন আমার কথা মনে পড়েনি, এখন তুমি আমার কাছে আয়েছো (আসিয়াছ)—'ঠেকায় পড়ে হরি গুরু', কি বলো ?

ঠেকা২—মনে হওয়া। প্র° অবস্থা/গতিক কিন্তু সুবিধে ঠেক্‌তেছে (ঠেকিতেছে) না, তোমরা যাই বলো বাপু।

ঠেকা৩—কাজ চালানো, কোনরকমে, আপাতত, অস্থায়িভাবে ই°। ছোট-খাটো রকমের অস্থায়ি/ঠেক্‌নো ; ঘরবাড়ি, নৌকো ই° মেরামতের সময় কাঠের ঠেক্‌নো দ্বারা হেলান দিয়ে রাখা (support by slanting prop)। ঠেকো, ঠেকনো ই°। প্যালা দ্র°।

ঠ্যাকার—দেমাক (false vanity)। ঠ্যাকার দেখানো—দেমাক দেখানো। প্র° মেয়ে-মানুষির অতো ঠ্যাকার ভালো না ॥ ঠ্যাকারী—যে দেমাক দেখায়। 'ঠ্যাকারী লো ঠ্যাকারী, কতো ঢং দেখালি'—প্রবাদ।

ড

ডুমো—খণ্ড, টুকরো। ডুমো-ডুমো—খণ্ড খণ্ড, টুকরো-টুকরো। প্র° আলু, পটল, কুমড়ো ই° ও অন্যান্য কাঁচা তরিতরকারী খণ্ড খণ্ড করিয়া (ভাবে) কাটা।

ডাক-দোই—মূল° ডাক-দোহাই। প্র° ছেলেপিলেগুনোর মতিগতি আজকাল এমন হয়েছে যে বাপ-মার ডাক-দোই এস্তক (পর্যন্ত) মানে নারে বাপু, হলো কি !

ডাঙ্গর—উদ্ধত, বড়ো। 'চোরে খায় তুধ-কলা, আরো চোরের ডাঙ্গর গলা'—প্রবাদ।

ঢ

ঢেঁকি—ধানভানার (কুটার) যন্ত্রবিশেষ। অনাদরে, তুচ্ছার্থে গালি ; ঢেঁকি, অর্থাৎ অপরের তাড়না ব্যতীত যে নিজের চেষ্টায়/বুদ্ধিতে চলিতে অপারাগ। প্র° ঢেঁকি, গাবের ঢেঁকি ই°—নিতান্তই অকর্মা ॥ অকর্মার ঢেঁকি, নিষ্কর্মার ঢেঁকি ই°। তুল° ষাঁড়ের গোবর।

'গাবের ঢেঁকি' বলার অর্থ—গাব গাছ দেখিতে খুব সুন্দর, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না; জেলে-মালোরা তাদের জালের সুতো, দড়ি ইং পাকা করিতে ও মাজিতে (মাঞ্জা দিতে) এই গাছের কাঁচা ফলের রস ব্যবহার বরে; আবার পাকা ফল তাহারাই খায়; পাকা ফলের স্বাদ অনেকটা পাকা কেয়া ফলের মতো।

ঢেউ-ঢংকার—গড়াগড়ি, ফেলা-ছড়া; প্রাচুর্যজনিত অবস্থা। প্রং বড়ো মান্‌ষির (ধনীর) বাড়ির কথাই আলাদা; দুধ-ঘি ওদের বাড়ি ঢেউ-ঢংকার যাচ্ছে, অথচ ওর ছিটে-ফোটা জোগাড় কর‍্তি অন্যের মাথার ঘাম পায়ে পড়তেছে (পড়িতেছে)॥ জলের কল্‌সিডা (কলসীটা) ভাঙে' (ভাঙ্গিয়া) জলখানি (জলটুকু) যে ঢেউ-ঢংকার যাচ্ছে, তা' তোরা দেখ্‌তি পাসনি এখনো?

ঢেবি, ঢ্যাবা—অতিরিক্ত মোটা; যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ। তুলং মোট্‌কা, মুট্‌কি। বিপং শুট্‌কো, শুট্‌কী। প্রং ওদ্দের (ওদের) ছেলেমেয়েগুনো কি খায় বলো দিনি, দিন দিন যেন এটাট্টা (এক-একটা, প্রত্যেকটি) ঢ্যাবা/ঢেবি হচ্ছে। তুলং ঢ্যাপস-ঢ্যাপসা-ঢেপ্‌সি।

ঢ্যাপস, ঢ্যাপ্‌সা, ঢ্যাপ্‌সি—অতিরিক্ত মোটা ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। দ্রং ঢ্যাবা, ঢেবি ইং স্ত্রী-পুরুষ। তুচ্ছার্থে গালাগালি বিশেষ। তবু, ঢ্যাপস, ঢ্যাপ্‌সা—পুং, এবং ঢ্যাপ্‌সি বা ঢেপ্‌সি স্ত্রীলিঙ্গে। প্রং যেমন চেহারা, তেমন মাথা (ঘিলু, বুদ্ধি, brain)—এই ছেলেমেয়েগুনো যেন এক একটি ঢ্যাপস/ঢ্যাপ্‌সা/ঢ্যাপ্‌সি, ঢেপ্‌সি॥ ঢ্যাপ্‌সা লোকগুনো কোন কাজের না॥ এই মেয়েডা, তুই যা ঢেপ্‌সি হচ্ছিস দিন দিন তাতে তোরে দিয়ে কোন্ কাজডা হবে বল্‌দিনি—না হবে গতরের কাজ, না হবে মাথার কাজ॥ তুলং ধুম্‌সো, খোদার খাসি ইং।

ঢ্যারা-ঢ্যার—প্রচুর, প্রাচুর্য। তুলং ঢের-ঢের, অজস্র ইং। প্রং পাঁচজনের আশীব্বাদে (আশীর্বাদে) তোমার আছে ঢ্যারা-ঢ্যার, তুমি তো ইচ্ছে কল্লি দশজনেরে (দশজনকে, সাধারণকে) দিতি পারো দু'পয়সা।

ত

তল্লাট—অঞ্চল, পাল্লোট। তুলং গেড়দে। প্রং রামবাবুর মতো ভদ্দরলোক এ তল্লাটে দুজন দেখা যায় না॥ ফের যেন আর তোরে এ তল্লাটে দেখিনে।

তাড়ি—আঁটি (bundle) ছোট আকারের। বিপং গাদি, বৃহদাকারযুক্ত। প্রং এক তাড়ি খরবটি॥ বিপং ধানের গাদি।

তাংড়ানো—উত্তোলনের, ভারবহনের ক্ষমতা। তুলং চাগানো। প্রং এই বুড়ো বয়েসে আর দেড়-মনি বোঝা তাংড়াতি (তাংড়াইতে, বহন করিতে) পারি নে।

তেলচিটে, তেলচিট্‌কে—তেল ও ময়লা মিশ্রিত বিশ্রী রূপ। কলুর পরণের কাপড়-চোপড়ে স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ময়লা থাকে; তাহা হইতেই সম্ভবত এই কথাটির সৃষ্টি।

তুল° কলুর গ্যাতা, কলুর ত্যানা, চিরকুট ই°। প্র° তেলচিটে জামা/কাপড় পরে' তুই ভদ্দরলোকের সামনে যাস্ কি করে'?

ত্যানা, ট্যানা—টুকরো, জীর্ণ ও ময়লা কাপড়। তুল° তেলচিটে, তেলচিটকে, গ্যাতা ই°। প্র° পাগলাডা/ভিখিরিডা এমন একখানা ত্যানা পরে' ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দেখ্‌লিউ (দেখলিও, দেখিলেও) লজ্জা করে, অথচ আস্ত/নতুন কাপড় দেবার সাধ্যি নেই।

দ

দামড়া—অকর্মা ও বয়স্ক পুরুষ। দাম্‌ড়ি—বয়স্কা অকর্মা স্ত্রী। অনাদরে ও তুচ্ছার্থে গালিবিশেষ। প্র° বুড়ো দামড়া/দাম্‌ড়ি তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান এ জন্মে হবে না॥ বুড়ো দামড়া/দামড়ি হয়েছ কুটো-গাছ (কুটো গাছা, গাছা—খানি, খানা) ভাঙবার ক্ষমতা হয়নি, পেটের ভাত হবে কি করে' ভাবে' (ভাবিয়া) দেখেছো কোনদিন॥ তুল° বুড়ো ধাড়ি। মূল° দামড়া গোরু—প্রায় অকর্মা, কিন্তু নিয়মিত খাবার চাই।

দিনমান—দিনের বেলা, সারাদিন। প্র° সারা দিনমান তুমি কোথায় থাকো বলো দিনি; আজ এক মাস তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে' ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ধ

ধকল—কষ্ট। তুল° বোচ্। প্র° এ বয়েসে আর সারাদিন হৈ-চৈ করার ধকল সতি' (সহিতে, সইতে, সহ্য করিতে) পারি নে। বছরে দু'খোন (দুইখান, খানি) কাপড়ে চালাতি (চালাইতে) হয়, কতো আর বোচ্ (ধকল) সয়।

ধুলধাড়া—ছিঁড়িয়া টুকরো টুকরো ও ব্যবহারের অযোগ্য এমন জিনিস। প্র° তোর পরনের কাপড়খানা দেখিতছি একেবারে ধুলধাড়া হয়ে গেছে; নতুন একখানা কেনার ব্যবস্থা কর্, না পারিস্ তো বল্ চেষ্টা করে' দেখি একখান জোগাড় করতি পারি কিনা॥ তুল° হালি-হালি দড়ি-দড়ি, শতজীর্ণ অবস্থা।

ধুলিমঙ্গলি—ব্যবহারযোগ্য অবশিষ্ট। প্র° কাপড়খানারে তুই এমনভাবে ছিঁড়িছিস যে তার আর ধুলিমঙ্গলি রাখিস নি॥ তুল° ধুলধাড়া, হালি-হালি দড়ি-দড়ি ই°।

ন

নরম-তরিপাত, বা নরম তরিবাত—নম্র, বিনয়ী ও বিনীত স্বভাব। প্র° মেয়েডা বেশ, কেমন নরম-তরিপাত কথাবাত্রা আর ঠাণ্ডা চাল-চলন॥ বিপ° বেতরিপাত, বেতরো।

নিক্‌চোনো—বিশ্রীভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসা। দেঁতো হাসি। প্র° অতো লোকের মধ্যি (মধ্যে, মাঝে)/বাইরির (বাইরের, বাহিরের) লোকের সামনে কথায় কথায় তুই যে নিক্‌চোস, তোর লজ্জা করে না॥ নিক্‌চোনো-ভিক্‌চোনো—অভব্য অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসি-তামাসা করা।

নিরোধারা—একটানা, অবিরত (ceaselessly)।

ন্যাকা—যে ন্যাকামো করে। ন্যাকা-ন্যাকা, ন্যাকামো ভাব, ঢলানি। ন্যাকা-ন্যাকা থ্যাকা-থ্যাকা—ঢলাঢলি, একান্তই ন্যাকামো ভাব। প্র° বুড়ো মেয়ে, ছেলেদের সামনে ন্যাকা-ন্যাকা থ্যাকা-থ্যাকা করিস, তোর বাড়িল্লোক (বাড়ির লোক) সহ্য করে কি করে' তাতো বুঝিনে বাপু।

সৈরেকার—একাকার। সব শূন্য, ভেদাভেদ জ্ঞানহীন/অবস্থাশূন্য। মূল° নিরাকার। প্র° বারোয়ারী তলায় ভোজ হচ্ছে; ভদ্দরলোক-ছোটলোক সব একত্তর (একত্র) হয়ে এমনভাবে খাচ্ছে আর খাওয়ার জন্যি হাভাতের মতো এমন করতেছে যে মনে হয় জাত-পাত সব সৈরেকার/একাকার হয়ে গেল। এতে বোঝা যায়। খিদে সগুলির (সকলের) সমান; অতএব জাত-পাত নিয়ে অতো চিগ্‌রো-চিগ্‌রি (চেঁচামেচি) করার কোন মানে হয় না।

পয়, পয়া—লক্ষণ, লক্ষণযুক্ত। পয়মন্ত—সুলক্ষণযুক্ত।

পয়-পয়—পদে পদে, বারবার। প্র° পয়পয় করে' তোরে' যে আমি বললাম আমার কথামতো চল্‌বি, তা' তো শুনলি নে, এখন বেকায়দায় পড়িছিস তো, বোঝ্ এখন ঠ্যালা!

পয়মাল—সর্বনাশ, ভরাডুবি। প্র° ধানের খেতে গোরু ঢুকে এ্যবারে পয়মাল করে' দেলে (দিলে, দিল) রে!

পড়ন্ত বেলা—শেষ বেলা। তুল° অবর বেলা।

পাল্‌টানো—পরিবর্তিত, রূপান্তরিত করা। প্র° ফের বাজে কথা বল্‌বি তো মারে' এ্যবারে পাল্‌টায়ে দেবো।

পালোট্—অঞ্চল। তুল° তল্লাট, গেড়দে ইং°। প্র° এ পালোটে আর এট্টা লোক দেখা দিনি যে পষ্ট (স্পষ্ট) সত্যি কথা বলার সংসাহস রাখে?

পা'ল—অনুকূল, জুত। মূল° পাইল। প্র° তোমার এখন পাল (অনুকূল সময়) পড়েছে যা ইচ্ছে বলে' ন্যাও (নাও, লও), কিন্তু মনে রাখো' পা'ল আমিউ (আমিও) একদিন পাবো ॥ পাল মতো—কায়দামতো ॥ প্র° পা'ল মতো পালি' (পাইলে) সে তোমারে কিন্তু ছাড়ে' কথা কবে না, দেখে নেবে বলেছে ॥ পা'ল ফিরোনো মাছ—বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও যথেষ্ট ওজনবিশিষ্ট মাছ। যে মাছ পাশ ফিরাইয়া দেখিয়া কেনা যায়, খাওয়া যায় ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। প্র° বাজারেত্যে (বাজার থেকে) পা'ল ফিরোনো কই/ট্যাংরা/পার্শে মাছ যদি পাস তো আনিস দিনি সের খানেক; অনেকদিন আর ওসব জোটেনি।

পাই—হিসেব, গণ্ডা। প্র° সময় থাকতি নিজির (নিজের) পাই গোছায়ে ন্যাও (লও), তা' নালি (না হলি, নইলে) কেউ তোমার হাতে দেবে না মনে রাখো'। পাই গোছানো—হিসাব বুঝিয়া লওয়া। প্র° এ বাজারে নিজের পাই গোছাতি (গুছাইতে) না

পারো তো মুশকিলি (মুশকিলে) পড়বা (পড়িবে) বলে' দেলাম ॥ পাই তোলা—নির্দিষ্ট কাজ যথাসময়ে শেষ করা। প্র° পাই তোলো, পাই তোলো, সগুলির (সকলের) কাজ শেষ হলো, অথচ তোমার পাই এখনো উঠলো না ; এরাম (এরকম) কল্লি ভবিষ্যতে আর কোথাও কাজ পাবা (পাইবা, পাইবে) বলে' তো মনে হয় না।

পুই-পোনা—ছা' বাচ্চা, কাচ্চা-বাচ্চা। প্র° চাকরি না থাক্‌লি এ বাজারে পুই-পোনা নিয়ে এ্যবারে পথে বস্‌তি হবে, বুঝলে !

পোরা—ভর্তি। প্র° চালগুনো হাঁড়িতি (হাঁড়িতে) তোল্ ; ধানগুনো ধামায় তোল্। 'ধামা পোরা আশা, কুলোপোরা ছাই'—প্রবাদ।

পেল্লায়, পেল্লাই—প্রকাণ্ড, বিরাট। মূল° প্রলয়। তুল° মস্তমানে, দশাসই, শাঙেন্‌মানে ই°।

প্যালা—বড় রকমের ঠেক্‌নো (support), যাহা দীর্ঘকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোন কারণে ঘর-বাড়ি যখন পড়ো-পড়ো অবস্থা হয়, তখন মেরামত করা বা পরিবর্তন করিয়া নতুন ভাবে গড়িয়া তুলিবার অবসরে এই প্যালা ব্যবহৃত হয়। ছোট-খাটো এবং নিতান্তই অস্থায়ি ভাবে ব্যবহৃত প্যালা অর্থে ব্যবহৃত হয়—ঠেকা, ঠেকো. ঠেক্‌নো ই°। দ্র° ঠেকা।

ফ

ফক্‌কড়—ফাজিল, চ্যাংড়া। ফক্‌কড়-ফাজিল—চ্যাংড়া-ফাজিল। ফক্‌কড়ি—চ্যাংড়ামি, ফাজলামি। প্র° বেশি ফক্‌কড়ি করিস নে বুঝলি, তোর দাদা আমার এক ক্লাসের বন্ধু।

ফজুলতি, ফতুলতি—নির্ধনের নবাবী চাল, বিলাসিতা। প্র° বাপের হোটেলে খাচ্ছো, তাই অতো ফজুলতি/ফতুলতি ; খাটে' খাতি' (খাটিয়া খাইতে) হলে' আর অতো ফজুলতি থাক্‌তো (থাকিত, থাকিবে) না।

ফস্—হঠাৎ। প্র° ফস্ করে' কাথাডা মুখদে' বারোয়ে (বাহির হয়ে, হইয়া) গেল, এখন মনে হচ্ছে কথাডা ভালো বলি নি ॥ ফস্-কাগজ—টুকরো কাগজ। তুল° চিরকুট।

ফাল্—খণ্ড, ছিন্ন। ফাল্ করা—ছিন্ন, করা। তুল° ফাঁড়া। প্র° পরনের কাপড় খানারে এমনভাবে ফাল্ করিছিস যে তাদে' (তা দিয়ে, তাহা দিয়া) আর সেলাই করে' পরাও চলবে না ॥ আমগাছের মোটা গুঁড়ি ক'খান আপাতত ফাল্ করে' রাখ্, পরে ভালো করে, চলা (ভালোভাবে ফাল্ করা) করিস ॥ 'ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বেরনো'—প্রবাদ।

ফালা—ছেঁড়া। ফালা-ফালা—টুকরো টুকরো। প্র° কাপড়খান এমন ফালা-ফালা করে' ছিড়িছিস যে তাদে' (তা দিয়ে তাহা দিয়া) এখন আর সল্‌তে পাকানো ছাড়া আর কোনো কাজে আসপে (আসবে, আসিবে) না।

ফাঁড়া—ফাল্, খণ্ড করা। দ্র° ফাঁড়া। প্র° কাঠ ফাঁড়া। দেখ্‌তি (দেখিতে) এমন সুন্দর দরজাখান, কিন্তু এই ক দিনের (কয়দিনের) মধ্যিই দেখতিছি তাতে ফাঁড়া বারোয়েছে (বার হইয়াছে, বাহির হইয়াছে) ; এ নিশ্চই (নিশ্চয়) মিস্ত্রীবেটাই ফাঁকি দেছে।

ফালুক-ফুলুক—পিট পিট করা চাহনি, অশিষ্ট চাহনি। প্র° বাঁদরের মতো ফালুক-ফুলুক করে' এদিকি-ওদিকি (এদিকে ওদিকে) চাচ্ছিস (চাইতেছিস, নজর বা চাহনি দিতেছিস) কেনরে? কোনো বদ্ মতলব আছে নাকি তোর॥ রাস্তার বাঁকে (মোড়ে) দাঁড়ায়ে তুই ফালুক-ফুলুক করে' তাকাচ্ছিস, তোর তো মতলব ভালো ঠেক্‌তেছে না।

ফের, ফেরা—বিপাক, দুর্বিপাক, হয়রানি ই°। গ্রহের ফের। দাঁড়িপাল্লার দিক পরিবর্তন করা। প্র° এ আবার কোন্ ফেরে/ফেরায় পড়লাম রে বাবা॥ দশ সের চাল দ্যাও, পাঁচ সের করে' তুই ফেরায় দেবা।

ফেরা—কারবার। ফেরা খাটানো—কারবারে খাটানো। প্র° তোর কি আক্কেল বল্‌দিনি, আমারি (আমারই) টাকা নিয়ে তুই ফেরা খাটাচ্ছিস, আর আমার টাকাকড়া সময় মতো শোধ দিতি (দিতে) পারিস্ নে?

ফিচকুটি, ফিচখুটি—বিরক্তিকর ব্যাপার, পরিস্থিতি, হাঙ্গামা ই°। তুল° ভজগটো। প্র° চালিত্যে (চাল থেকে, চাল হইতে) ধান বাছা/শাকেত্যে (শাক থেকে, শাক হইতে) পোকা বাছা এমন ফিচকুটি/ফিচখুটি ব্যাপারে যে আমার মাথাডা এ্যবারে খারাপ হয়ে গেল।

ব

বাই—বাতিক। হঠাৎ খেয়াল। শুচিবাই—শুচিবায়ুগ্রস্ত। 'উঠলো বাই তো কটক যাই'—প্রবাদ।

বান্১—মাচা। তুল° টোং। বাঁশের/কঞ্চির/কাঠের তৈরি চারকোণে চারখুঁটির উপর চিৎ করা পাটাতন বিশেষ।

বান্২—বহুমুখবিশিষ্ট বড়ো উনুন। সাধারণত, ক্ষারসিদ্ধ, খেজুরের রস ইত্যাদি জ্বাল দেওয়া ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং এই উনুন থাকে ঘরের বারান্দায়, উঠানের এক পাশে।

বাথান—আড্ডা। পাল, গাদা, ভর্তি ই°। জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ ই° ক্ষেত্রে প্রয়োগ। যথা—মহিষের বাথান, শকুনের বাথান, ছারপোকার বাথান ই°। প্র° একি এট্টা (একটা) বিছ্না (বিছানা) নাকি, এ তো দেখি ছারপোকার বাথান (ছারপোকা ভর্তি)।

বাড়ি—আঘাত, প্রহার ই°। বাড়োন—প্রহার; বাড়োনো—প্রহার করা। তুল° ঠ্যাঙ্গান, ঠ্যাঙ্গানো। গো-বাড়োন—গোরুকে প্রহার করার মতো বেদম ও নির্দয় প্রহার; গো-বাড়োনো—গরুকে প্রহার করা। 'বাড়োন/ঠ্যাঙ্গান খালি (খাইলি, খাইলে) বুঝবা হরি কেমন ধন!'—প্রবাদ।

বিক্‌ছোনো, বিত্তেবিত্তে—ঘাঁটাঘাঁটি; ঘাঁটাঘাঁটি করা। তুল° ছ্যানা-চট্‌কা করা। প্র° তোর যদি ভাত খাবার ইচ্ছে না থাকে তো ভাতগুনো বিত্তেবিত্তে কত্তিছিস (করিতেছিস, করছিস) কেন? তোর ছ্যানা-চটকা ভাত কেডা খাবে?

বেতরিপাত— বেতরো, উদ্ধত, দুর্বিনীত ই°। বিপ° নরম-তরিপাত। প্র° কেমন বেতরিপাত ছেলে রে, বাপমার মুখির (মুখের) পরে (উপর, সামনে) কথা কয়॥ মেয়েডা এ্যবারে বেতরিপাত ; লজ্জাশরম বল্‌তি (বলিতে) কিছুমাত্তর (কিছুমাত্র) নেই !

বেল্‌, বেল্‌-বেলা—সারা বেলা, অবর বেলা। বেলা-বেলি—বেলা থাকিতে, বা থাকিতে থাকিতে। বেল্‌-বেলান্ত—শেষ বেলা পর্যন্ত। প্র° সকাল সাতটাত্যে (সাতটা থেকে) এই বেল্‌/বেল্‌-বেলা পর্যন্ত আমি তোর জন্যি বসে আছি, অথচ তোর দেখা নেই॥ ঘরে কিন্তু হেরিকেন (হারিকেন) জ্বালার মতো তেল নেই, কাজকম্ম যা করার (করবার, করিবার) তা বেলাবেলি করে' নিও, কথাডা আমি আগেই বলে' দেলাম মনে থাকে যেন॥ বাছা আমার বেলান্ত খায়নি, মুখখান্‌ (মুখখানা) এ্যবারে এট্টুস/ এট্টুখানি (একটুখানি) হয়ে গেছে ; আহারে, মরে' যাই !

ব্যাজার—মুখভার, অসম্মতি, আপত্তি, গররাজী ই°। প্র° সব সময়/সব তাতে (তাহাতে, ব্যাপারে) তোর মুখ ব্যাজার কেন রে, এ দোষ তোর এক রোগে দাঁড়ায়ে (দাঁড়াইয়া, দাঁড়িয়ে) গেল ; এতো ভালো কথা না॥ মুখ-ব্যাজার মেয়ে আমি দেখতি পারি নে॥ 'আগে ব্যাজার ভালো তো পাছে (পিছনে, পশ্চাতে, পরে) ব্যাজার ভালো না'।—প্রবাদ।

বোচ—ধকল, স্থায়িত্ব ই°। প্র° পুরনো কাপড়ে আর কত বোচ সয়॥ এ কাপড়ের বোচ কিন্তু বেশিদিন না, তা আমি আগেই বলে' দেলাম।

ভজগটো—তালগোল, হাঙ্গামা। তুল° ফিচকুটি, ফিচখুটি। প্র° তোমাদ্দের (তোমাদের, তোমারদের) ওসব ভজগটো ব্যাপারে/ব্যাপারের মধ্যি আমি নেই বাপু।

ভন্না, ভরুনা—মুষলধারে বৃষ্টি। বড়ো ভন্না—জোর বৃষ্টি। প্র° এট্টা ভন্না না হলি দেব্‌তার (আকাশের) এই গুমোট ভাব কাটপে (কাটবে, কাটিবে) না।

ভরখুল্য-খুল্ল—প্রাচুর্য, প্রচুর। তুল° ঢ্যারা-ঢ্যার। প্র° তোমার গাছে তো দেখতিছি এবার ভরখুল্য আম।

ভাঙ্গা—পুরনো কাপড়ের টুকরো। প্র° আমারে এট্টু সলতে পাকানোর মতো ভাঙ্গা দেদিনি।

ভানাচি—ঢং, ছিনালি, ন্যাকামি, ভণিতা ই°। তুল° ভিরকুটি। প্র° বেলা দুপোর (দুই প্রহর, দ্বিপ্রহর) সময় এখন আর ভানাচি মারিস নে।

ভিগ্‌মুশি—রুচিগত বাছ-বিচার, খুঁতখুঁতে ভাবের ঢং ই°। প্র° ডালির (ডাইলের) সঙ্গে ভাজা নালি (না হলি-হইলি-হইলে) খাতি পারি নে,—এসব ভিগ্‌মুশি তোর আসে কোথাত্যে ; দু'বেলা খাতি পাচ্ছিস এই যথেষ্ট মনে করিস।

ভিরকুটি—ঢং, ভণিতা ই°। তুল° ভানাচি, চিট্‌গি। প্র° খাটে' (খাটিয়া) খাতি হলি তার অতো ভিরকুটি আসে না। ভিরকুটির বিচি (আঁটি, শাঁস)—নবাবী, বিলাসিতা ই° মূল উৎস। ব্যঙ্গার্থে চাউল। প্র° ভিরকুটির বিচি ফুরোলি (ফুরাইলে, ফুরালি) আমি

দেখ্পো (দেখবো, দেখিব) তোমার এতো ফজুলতি (নবাবী, বিলাসিতা, ফোঁপরদালালি) কোথাত্যে আসে ॥ অর্থাৎ, যত রকম বিলাসিতা ও নবাবী ইং মূলই হলো নিশ্চিন্ত প্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন ঘরে থাকা।

ভোর—ব্যাপী, সমস্ত, সারা ইং। ভোরদিন—সারাদিন (ব্যাপী)। তুলং চৌপরদিন—চারপ্রহর দিন। প্রং ভোরদিন কনে (কোন্খানে, কোথায়) ছিলি বল্দিনি ; তোর উদ্দিশি, তোরে তালাস (তল্লাস) করতি আসে' লোকজন ফিরে যায় অথচ আমি তাদ্দের কিছু বল্তি পারিনে।

ম

মক্শো—হাত পাকানো, ক্যারিকেচার (caricature)। তুলং জাই/জায় দেওয়া। প্রং এই আমি তোরে 'অ-আ ক-খ' লিখে দিয়ে গেলাম, সারাদিন বসে' বসে' মক্শো করবি, লেখা ভালো না হলি খাতি পাবিনে ॥ বুড়ো লোকটার পিছনে এতক্ষণ ধরে' তুই মক্শো কত্তিছিস, আমি সব দেখিছি কিন্তু, চল্ তোর বাবারে বলে' আজ তোরে মার না খায়ায়ে (খাওয়ায়ে, খাওয়াইয়ে, খাওয়াইয়া) ছাড়তিছি (ছাড়িতেছি) নে।

মগ্ন—জীর্ণ। মগ্ন কাপড়। তুলং ভাঙ্গা। প্রং কাপড়খান বড্ডো মগ্ন হয়েছে, আর একখান না কিন্লি আর চলে না দেখ্তিছি।

মস্ত—প্রকাণ্ড, বিরাট। মস্তমানে—দশাসই। তুলং শাণ্ডেন্মানে।

মাগ্গি, মাগঘি—মহার্ঘ। তুলং আক্রা। প্রং মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে এখন দিন চালানো দায়।

মাঙ্গন, মাঙন—ভিক্ষা, যাচ্ঞা। সংকল্পপূর্বক বিগ্রহের পূজার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গৃহীর নিকট হইতে ভিক্ষা আদায়। মাঙ্গন মাঙ্গা—ভিক্ষা করা। প্রং শীতলার মাঙ্গন ছাওগো মা-ঠাকরুন (মা-ঠাকুরাণী) ॥ মাঙ্গন মাঙ্গা—ভিক্ষা মাঙ্গা, ভিক্ষা করা। প্রং মাগো, তোমাদ্দের দোরে দোরে মাঙ্গে (মাঙ্গিয়া, যাচ্ঞা করিয়া, ভিক্ষা করিয়া) বেড়াচ্ছি বলে' মনে করো না মাঙ্গন-মাঙ্গাই (ভিক্ষা করাই) আমার পেশা, আমারও একদিন তোমাদ্দের মতো স্বামী-পুত্তুর ঘর-সংসার সবই ছিলো ; কিন্তু ভগবান মারে' রাখেছে' (মারিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে অক্ষম হওয়া বা মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা-হারা হওয়া, বা কোনভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, বা ঘর-বাড়ি হইতে উচ্ছেদ হইয়া অসহায়ভাবে পথে বসা) তা' আর করবো কি, তোমরাই বা কি করে' আমার ব্যথা বুঝবা/বোঝবা (বুঝিবা, বুঝিবে)।

মাঙ্না—মুফত্, ফালতু। মুফতে অর্থাৎ বিনা আয়াসে বা শ্রমে পাওয়া। প্রং ভাত ভাত কত্যেছো (করিতেছ), ভাত কি মাঙ্গনা পাআ (পাওয়া) যায় ?

মুরোদ—সামর্থ্য, ক্ষমতা। শারীরিক ও মানসিক অর্থে। প্রং মুখি (মুখে) তো দেখি/দেখ্তিছি বেশ লম্বা লম্বা কথা, সময়কালে/কাজের বেলা/বেলায় দেখা যাবে মরদের (ব্যঙ্গার্থে, শক্তিমানের) মুরোদ কতো।

মেক্‌দার—পরিমাণ, বেগ। অজস্র, প্রাচুর্য অর্থে। প্র° যে মেক্‌দারে গাছে আম পাকেছে (পাকিতেছে) তাতে তো ঘরে জাগা (জায়গা) দিতি পারবা (পারিবা, পারিবে) না। কি মেক্‌দারে গাছে আম্‌ড়া না পাকেছে' ॥ যে মেক্‌দারে ও দৌড়চ্ছে/খাচ্ছে তাতে এট্টা বিপদ না ঘটায়ে ছাড়বে বলে' তো মনে হচ্ছে না।

রদ্‌-বল—শক্তি-সামর্থ্য। প্র° বয়েস হয়েছে, এখন আর আমার আগের মতো সে রদ্‌-বল নেই।

রমারম্—একের পর এক, ক্রমাগত। প্র° তোমার ফরমাজ (ফরমাস, ফরমায়েস) মতো রমারম্ টাকা-পয়সা জোগাবো, এমন সাধ্যি আমার নেই ॥ রসগোল্লা সন্দেশ তুই তো দেখতিছি রমারম্ খাচ্ছিস, এতো মিষ্টি খাসনে; শেষে যে তোর কিরমি (কৃমি) হবে, তখন ঠ্যালাড়া সামলাবে কেডা (কেটা, কে)?

শ

শাওেন্‌মানে—দশাসই। তুল° মস্তমানে, হাত্তে'র।

শানানো—পোষানো, মন ওঠা। প্র° এক থালা ভাতে ওর শানায় না, ওরে আর চারডে (চারিটি, কিছু) দে ॥ তোমার যে কিসি শানায়, তাতো আজ পয্যন্ত (পর্যন্ত) বুঝতি পাল্লাম না, তোমার মন পাআ (পাওয়া) ভার ॥ মূল° শান দেওয়া। দা, বটি, হাসুয়া, কাঁচি, ক্ষুর ইত্যাদি লোহার অস্ত্রে ধার (শান) দেওয়া। শানানো—ঐ, শান দেওয়া। এই রকম 'শান ওঠা' ধার ওঠা, অর্থাৎ অস্ত্রে কাটিবার উপযুক্ত ধার হওয়া। এইভাবে 'শান ওঠা' শব্দের সঙ্গে মন ওঠা অর্থে 'শানানো' কথার উৎপত্তি ও ব্যবহারগত সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক।

শুধু, সুধু—কেবল, খালি, শূন্য ই'। শুধু শুধু, সুধু সুধু—কেবল কেবল, খালি খালি, অযথা, অনর্থক (for nothing) ই°। খালি খালি। প্র° শুধু শুধু মান্‌ষির সঙ্গে ঝগড়া করা তোর এক রোগ দাঁড়ায়ে গেল দেখ্‌তিছি।

শেষা—মূল° শেষ। প্র° শেষা হাট/বাজার—হাট/বাজারের শেষ সময়। শেষানি—তলানি, অবশিষ্ট ই°। প্র° জোয়ার-ভাটার শেষানি।

স

সল্—টিলে॥ প্র° বোধে সল—বোধশক্তিতে/বুদ্ধিতে কম/খাটো। প্র° নেমন্তন্ন বাড়ি খায়ে (খাইয়ে, খাইয়া) পেট তো দেখ্‌তিছি দশ-নম্বরি ফুটবল করিছিস, এখন শিগ্‌গির পেটের কাপড় সল্ দে, তারপর এট্টু গড়ায়ে (শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে) নে, নালি (না হলি, না হইলে) যে দমবন্ধ হয়ে মরবি ॥ ওর দিকি নজর রাখিস, সল্ দিছিস কি ও তোরে পথে বসাবে।

সইদি—পরিপূর্ণ, প্রচুর। প্র° ছেলেডা দেখ্‌তি ওইডুক (ওইটুক, টুকু) কিন্তু সইদি এক থাল ভাত ও খালি (কেবলমাত্র) নুন তেল দেই (দিয়েই) সাবাড় (শেষ) করে দেলে, খায়ে ফেল্লে।

সজুত—সোজা, সিধা, ঠিকপথ। সজুত করা, হওয়া—সোজা, সিধা করা, হওয়া ই°। প্র° ও যে রকম ত্যাঁদড় ছেলে, তা' ঠ্যাঙ্গান না খালি (খাইলে) ও সজুত হবে না।

সাওগাড়—অবাঞ্ছিত, মাতব্বর, সর্দার। সাওগাড়ি—মাতব্বরি, সর্দারি। সাওগাড়ি করা, মাতব্বরি করা। সাওগাড় হওয়া - মাতব্বর হওয়া। প্র° তোমারে তো বলিছি, সব তাতে (তাহাতে, ব্যাপারে, বিষয়ে) তুমি সাওগাড়ি করতি আসে' না॥ তুমি এমন কিছু সাওগাড় হওনি যে তোমার কথামতো আমার চল্‌তি (চলিতে, কথা শুনিতে) হবে॥ দ্র° সারডাল।

সারডাল—দজ্জাল, মাতব্বর, মুখরা। তুল° সাওগাড়। প্র° এই বয়েসে তোর মতো সারডাল মেয়ে আমি আর দেখিনি বাবা!

সাঁদি, সাঁধি—অন্ধকারময় সরুগলি, জায়গা, কোণ। কোণা-খাজড়। মূল° সন্ধি। অন্ধি-সন্ধি—আঁধি, সাঁধি। প্র° আঁধি-সাঁধির মধ্যি জিনিসপত্তর সারে' (সারিয়া, লুকাইয়া) রাখা তোর এক বদভ্যেস; অথচ আমি খুঁজে মরি॥ সাঁদানো, সাঁধানো—অন্ধকারময় সরু গলির মধ্যে অতি কষ্টে প্রবেশ করা। প্র° তোর চ্যায়রা (চেহারা) পাতলা আছে, তুই ওই খাটের/বাক্সের পাশে সাঁধির মধ্যি ঢুকে দেখ্‌দিনি ওখেনে (ওখানে) আমার কডা (কয়টা) পয়সা পড়ে গেছে, তুলে দিতি পারিস কিনা?

সাঁই—সাঁজ, বেলা। প্র° দিনকাল যা পড়েছে, তাতে এই দশজনের সংসারে সাঁই ওঠা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়েছে।

সো'র—মেরামত। তুল° ঠিক করা। প্র° আমার ছাতিডে (ছাতিটা) ছিঁড়ে গেছে আজ কদিন হলো, বাড়িতে তোরা এতগুনো লোক, অথচ এট্টা ছাতিসারা (ছাতি মেরামতকারী) ডাকে' (ডাকিয়া) আমার ছাতিডা সো'র করে' রাখতি পারিসনি; আমি এখন এই জলের (বৃষ্টির) মধ্যি যাই কি করে' বল্‌দিনি।

হ

হচ্ছে-হবে—আলসেমি করা। হচ্ছে-হবেনে—হচ্ছে হবে'খন (হবে এখন)। তুল° যাচ্ছে-যাবে। 'গয়ংগচ্ছ' ভাব। তুল° ঘষ্টি-ঘষন।

হায়াংকে, হারাংখে—আদেখ্‌লে। হায়াংকেপনা—আদেখ্‌লেপনা। প্র° দশজনের মধ্যি তোর হায়াংকেপানা (—পনা) দেখে আমার যেন এ্যবারে মাথা কাটা যাচ্ছে।

হাল্‌কমি, হাল্‌খমি—আলসেমি, গড়িমসি ভাব। প্র° কোন কাজে তোর গা (চেষ্টা, উৎসাহ) নেই; নিজির (নিজের) হাল্‌কমির জন্যি আজ তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস।

হালুক-হালুক—ব্যগ্র, ব্যগ্রতা; আকুল, আকুলতা। প্র° যে কথাডা তোরে বল্‌তি যায়ণ

করবো সেই কথাডা বলার জন্যি প্রাণডা যেন তোর হালুক-ছালুক করে, তাই না ; তোর এই মেয়ে-মানষির মতো স্বভাব আমি মোট্টে (মোটে, আদৌ) দেখতি পারি নে।

হেড্ডা-বেড্ডা—অগোছালো। দ্র° হোগল-বোগল, অলভড্ডো। প্র° এইমাত্তর (এই মাত্র, একটু আগে) আমি বইগুনো গোছায়ে রাখে' গ্যালাম, এর মধ্যি আবার হোগল-বোগল করলো কেডা॥ বলিছি না, বই-খাতা পত্তর হেড্ডা-বেড্ডা করা আমি মোট্টেও (মোটেও, আদৌ) পছন্দ করিনে।

হেলটপ্পা—বিনাকাজে টো-টো/টই-টই করিয়া বেড়ানো। প্র° সংসারের এট্টা কাজের নামে তো খোঁজ নেই, অথচ সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় দিব্যি হেল্টপ্পা মারে' বেড়ানো হচ্ছে ; তোমার ভাত নিয়ে বসে' থাকে কেডা ? বাড়িতি (বাড়িতে) কি তোমার জন্যি দশটা ঝি-চাকর আছে ?

হান্নাৎ—অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। প্র° বড়ো (বয়সে) হয়ে সগুলির (সকলের) কাছে এতো হান্নাৎ আমার আর সহ্য হয় না।

হোগল-বোগল—অগোছালো। দ্র° হেড্ডা-বেড্ডা। প্র° গোছানো জিনিস-পত্তর হোগল-বোগল করা আমি একদম (একেবারে) পছন্দ করিনে।

হাতে' মুখ্যু—হাতির মতো মূর্খ। মূল° হস্তী মূর্খ। তুল° গণ্ডমূখ্যু।

হাতে'র—প্রকাণ্ড অস্বাভাবিক বিরাট আকৃতিবিশিষ্ট। তুল° দশাসই, শাণ্ডেনমানে।

হালি-হালি দড়ি-দড়ি—পুরনো, জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন। জামা, কাপড় ই° পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তুল° ধুলধাড়া, ত্যানা। প্র° কাপড়খানারে তুই এমনভাবে হালি-হালি দড়ি-দড়ি করিছিস যে, গিরো (গিঁট, knot) দিয়েও আর পরা যাবে না ; ওতে আর সল্তে পাকানোর কাজও হবে না।

হিজলদাগা—ডাকসাইটে, অস্বাভাবিক দজ্জাল, বেপরোয়া, অপ্রতিভ। তুল° রায়বাঘিনী। প্র° এমন হিজলদাগা মেয়েমানুষ আমি আর এ তল্লাটে দেখিনি॥ তুই মেয়েডা আজকাল দিন দিন বড্ডো হিজলদাগা হচ্ছিস ; স্বভাব এট্টু ভালো করার চেষ্টা কর্দিনি।

'বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প'

[আলোচনা]

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক লিখিত 'বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান আলোচনায় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব।

লেখক প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন 'বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প', কিন্তু মধ্যযুগ বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা কোথাও বলা হয় নাই। অথচ বলাটা অত্যাবশ্যক ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কয়টি ভাগে ভাগ করা সম্ভব, কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া যুগ নির্ধারিত হইবে, এক একটি ভাগের সময়-সীমাই বা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা চলিয়াছে ; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ইওরোপীয় ইতিহাসের যুগবিভাগের নাম ধরিয়া একদা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। বলা হইত, আর্যগণের আগমন হইতে শুরু করিয়া তুর্কী আক্রমণ পর্যন্ত (অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীঃ) প্রাচীন যুগের বিস্তার। তাহার পরেই আরম্ভ হইল মধ্যযুগ। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়া সূচনা হইল আধুনিক যুগের। বর্তমান পরিবেশে এবং যে ধারায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া গবেষণা ও আলোচনা চলিতেছে তাহাতে এইরূপ কোন যুগবিভাগের সার্থকতা যে নাই একথা তো প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ বলিয়া কিছু ছিল কি না, থাকিলে তাহার বিস্তারই বা কোথা হইতে কোন্ পর্যন্ত তাহা এখনও আলোচনার বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মধ্যযুগ বলিতে একটা সময়-সীমা নির্দেশ করিতে চাহিতেছেন। রচনাটি পাঠ করিয়া মনে হয় তুর্কী আক্রমণ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (অবশ্য এ দিকটা কখনই পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই) মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া লেখকের ধারণা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ লইয়া যখন গুরুতর মতভেদ রহিয়া গিয়াছে, তখন কোন একটা বিশেষ সময়কে মধ্যযুগ বলিয়া পরিচিত করিতে হইলে তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। কোন একটি শিল্পকলাকে মধ্যযুগীয় বলিতে হইলে তাহার আঙ্গিক, শৈলী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোথায় কিভাবে মধ্যযুগীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখানো প্রয়োজন। অন্যথায় শুধুমাত্র একটি বিশেষ নামের উল্লেখ নিরর্থক হইয়া ওঠে। বর্তমান রচনাটিতে এইরূপ কোন আলোচনার আভাসমাত্র নাই।

এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলি লইয়া আলোচনা করিলাম আপাততঃ সেগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া রচনাটির তথ্যগত দিকের প্রসঙ্গে আসিলে বহুক্ষেত্রেই ভুল-ভ্রান্তি অথবা গুরুতর ত্রুটি চোখে পড়িবে। প্রবন্ধের প্রথমদিকে লেখক বলিয়াছেন বাংলাদেশের তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী মৃৎ-ভাস্কর্য তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সামান্য কয়েকটি মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণেই তাঁহার আলোচনা কেন্দ্রীভূত। এই মন্দিরগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "মধ্যযুগের টেরাকোটা-অলঙ্কৃত কয়েকটি মন্দিরের নির্মাণকাল সঠিক জানা যায়।" (মধ্যযুগ বলিতে লেখক কোন্ সময় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।) লেখক সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিতেছেন। বর্তমান শতকের প্রথমদিকে প্রকাশিত *Bengal District Gazetteers,* ১৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের Census কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সঙ্কলিত পশ্চিমবঙ্গের *District Hand Book*গুলি, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ও অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাসসমূহ (এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা সুপ্রচুর) এবং 'সমকালীন' পত্রিকায় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ক্রমান্বয়ে কুড়িটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলার মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত (এবং তাহার পরেও) বাংলাদেশে টেরাকোটা অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ শত শত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল এবং উপর্যুক্ত সূত্রগুলি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইবে, বিদ্যমান মন্দিরগুলির প্রায় অর্ধেকের নির্মাণকাল সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। বর্তমান আলোচনাটির লেখক আড়াই সহস্রাধিক মন্দির সমীক্ষা করিয়া যে তথ্য পাইয়াছেন তাহা উপরের কথাগুলিকেই সমর্থন করিতেছে।

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ এই তিনটি শতাব্দী জুড়িয়া বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক পোড়া-মাটির ফলকে অলঙ্কৃত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নির্মিত এতগুলি মন্দিরের মধ্য হইতে মাত্র ৬১ বৎসরকালের মধ্যে নির্মিত ছয়টি মন্দিরকে লেখক আলোচনার জন্য বাছিয়া নিয়াছেন। ইহাদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"কালানুক্রমিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রধান মন্দির।" কিন্তু কেন যে এই স্বল্পসময়ের মধ্যে নির্মিত মন্দির ছয়টি প্রধান বলিয়া গণ্য হইবে তাহার কোন কারণ দেখান হয় নাই। বোধ করি, যথোপযুক্ত তথ্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার কারণ।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব বহুক্ষেত্রেই প্রতীয়মান হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। লেখক বলিতেছেন—"বৈষ্ণব ধর্মের সেবায় এই পর্যায়ের (তাঁহার মধ্যযুগের) মৃৎশিল্পের পূর্ণ বিকাশ" তবে "অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও কোনও শৈব ও শাক্তমন্দিরও টেরাকোটা-অলঙ্কৃত।" প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এবং লোকায়ত দেবদেবী সকলের উদ্দেশ্যেই উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শৈব ও শাক্ত মন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণ বিদ্যমান। সুতরাং কোনও কোনও শৈব ও শাক্ত মন্দিরে টেরাকোটার অলঙ্করণ

থাকিত এ তথ্যও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালের "নাগর-রীতিতে নির্মিত কয়েকটি মন্দিরেও টেরাকোটা-ভাস্কর্য দেখা যায়" এ উক্তিও অনুরূপভাবে ভ্রান্ত। ঐ সময়ের বহু নাগর মন্দিরে টেরাকোটা অলঙ্করণ রহিয়াছে, মাত্র কয়েকটিতে নহে।

লেখকের মতে—"সাধারণভাবে বলা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী কালের ভাস্কর্যে পূর্বের অপেক্ষা উচ্চতর রিলিফ দৃষ্ট হয় এবং মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। কিছু আঞ্চলিক বিভেদও আছে। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার শিল্পে গড়নের সম্পূর্ণতা, সুডৌলতা এবং মুখাবয়বে বাস্তবতা অধিকতর প্রকট। অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলী জেলার শিল্পেও এই লক্ষণগুলি কতকাংশে বর্তমান কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আকৃতিতে স্থূলতার আভাস বিদ্যমান।" সপ্তদশ শতকের মূর্তিগুলির তুলনায় অষ্টাদশ শতকের মূর্তিগুলি উচ্চতর রিলিফে গড়া ইহা সত্য। কিন্তু পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় অষ্টাদশ শতকের মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন যুক্তি বা তথ্য নাই ; বরং বিপরীত প্রমাণ উপস্থিত করান যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতকের মন্দিরগাত্রে ২" হইতে ৩" পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তির দৃষ্টান্ত প্রচুর, কিন্তু সপ্তদশ শতকের একটি মন্দিরের গাত্রেও অতটা ক্ষুদ্র আকারের কোন মূর্তির সাক্ষাৎ মিলিবে না।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার (এবং অংশত হুগলীর) পোড়ামাটি শিল্পে দেখা যায় বলিয়া যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ঐ জেলাগুলির শিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নহে, বাংলাদেশের সর্বত্রই মন্দিরগাত্রের মূর্তি-অলঙ্কারে ঐ বৈশিষ্টগুলির সাক্ষাৎ মিলিবে—সর্বত্রব্যাপী সাধারণ শিল্পধারার চরিত্রগত বিশিষ্টতা হিসাবে। বর্তমান প্রশ্নে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত শিল্পধারা হইতে বীরভূম-বাঁকুড়ার মূর্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। হুগলী জেলার মূর্তিতে যে স্থূলতার আভাস লেখক দেখিয়াছেন তাহা অষ্টাদশ শতকের শেষদিক হইতে বাংলাদেশের সর্বত্র পোড়ামাটি-শিল্পে সাধারণ প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়াছিল, শুধুমাত্র হুগলী জেলায় নহে।

"অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী মন্দিরে···অনেক সময় সুসমঞ্জস পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়। কিন্তু চাকদহের পালপাড়া মন্দিরের পরিমার্জিত অলঙ্করণ এবং এখানে শিল্পীগণ যে সংযম, সমতাজ্ঞান ও পরিণত শিল্পচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন" স্যর জন মার্শালের মতানুবর্তী হইয়া লেখক তাহার প্রশংসা করিতেছেন। অতঃপর মন্দিরটির অলঙ্করণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন "মন্দিরগাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের বিন্যাস আকর্ষণীয়। দ্বারের উপরিভাগে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিস্তৃত দৃশ্য উৎকীর্ণ দেখা যায়।" মন্দিরটির গাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের বিন্যাস আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধের যে দৃশ্য রহিয়াছে তাহার দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে যে দৃশ্য সংগঠনে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কোনটাই বেশি নহে। নির্দিষ্ট পরিসর যথোপযুক্ত-ভাবে ব্যবহার করিয়া মূর্তি ও ডিজাইনগুলিকে কোনভাবে কোথায় রাখিলে চিত্রটি সুসংগঠিত হইতে পারে তাহা শিল্পীর আয়ত্তের বাহিরে।

লেখক মন্দিরটির দ্বারশীর্ষে রাম-রাবণের যে যুদ্ধদৃশ্য রহিয়াছে তাহাকে 'বিস্তৃত' এই

বিশেষণের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বহু সংখ্যক মন্দিরে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য যেরূপ বিস্তারিত ভাবে দেখান হইয়া থাকে (অনেক সময় তিনটি খিলান শীর্ষের সবটুকু পরিসর লইয়া) তাহার তুলনায় আলোচ্য মন্দিরে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। আবার, লেখক যে বলিয়াছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মন্দিরে সুসমঞ্জস পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়—সুসমঞ্জস পরিকল্পনা বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চান তাহা তো কোথাও বলেন নাই, সুতরাং তাহার অভাব হইলে যে অবস্থাটা কি রূপ গ্রহণ করে তাহা অবোধ্য রহিয়া গেল।

তথ্যগত ভ্রান্তি ও অস্পষ্ট উক্তির আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ফিরোজ মিনারটি পাণ্ডুয়াতে অবস্থিত বলিয়া লেখকের ধারণা। কিন্তু মিনারটির অবস্থান গৌড়ে। অস্পষ্ট উক্তির দৃষ্টান্ত মিলিবে পোড়ামাটির ফলকগুলির আকার সম্পর্কে ক্ষুদ্র, বৃহৎ এই বিশেষণ দুইটির ব্যবহারে। বৃহৎ বলিতেই বা কতখানি আর ক্ষুদ্র বলিতেই বা কতটুকু তাহা কখনও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

এইবার লেখকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব। লেখক বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকে "এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপই অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত।" প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। পাল-সেন যুগের প্রস্তর ও পোড়ামাটির শিল্পকলা, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত মসজিদ সমূহে পোড়ামাটি ও পাথরের অঙ্গ-সজ্জা, ষোড়শ শতাব্দী হইতে নির্মিত মন্দিরসমূহে পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং কাঠ, মাটি ও রং এই তিনটি উপাদানে বাংলার লোকশিল্পের ধারা, এই কয়টিকে একত্রে মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ষোড়শ শতাব্দী হইতে মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির যে অলঙ্করণ দেখা যায় তাহা বিভিন্ন রীতি ও ভাবকল্পনার মিলনে-মিশ্রণে ক্রমশ রূপ লাভ করিতেছে, সপ্তদশ শতকে এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপ অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই।

সপ্তদশ শতকে পোড়ামাটির মন্দির-সজ্জা পূর্ণবিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া লেখকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাই ঐ সময় মিলন-মিশ্রণ চলিতেছে। রূপকল্পনা, শৈলী, সংগঠন, আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রেই চলিয়াছে সমন্বয়-প্রচেষ্টা। লেখক স্বয়ং যে তিন প্রকারের শৈলীভেদের কথা বলিয়াছেন শৈলীর ক্ষেত্রে সমন্বয় চলিয়াছিল ওই তিনটি রীতির মধ্যে। রীতি তিনটির মধ্যে লেখক অবশ্য কথঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়াছেন, কিন্তু পার্থক্য মৌলিক। এই পার্থক্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে ষোড়শ শতাব্দী হইতে নির্মিত মন্দিরগুলির পোড়ামাটির অলঙ্করণের জন্মকথা। সপ্তদশ শতকে শৈলী তিনটি পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে মন্দির অলঙ্করণে পোড়ামাটির শিল্পে এই তিনটি শৈলীর পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে, আর তাহার পরেই দেখিতেছি ওই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপ। লেখক যে বলিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের কতিপয় মন্দিরে শিল্পের উচ্চমান বজায় আছে, এইরূপ মন্তব্যের কোন অবকাশ নাই।

আঙ্গিকের প্রশ্ন আলোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন এই "ভাস্কর্য সম্পূর্ণরূপে ছাঁচে গড়া।" মন্তব্যটি বিস্ময়কর। ছাঁচে গড়া হইলে কোন শিল্পবস্তু ভাস্কর্যরূপে পরিচিত

হইতে পারে না—'ছাঁচে গড়া' বলিয়াই তাহার পরিচয়। ইংরেজীতে বলা হয় moulding। ভাস্কর্য্য হইল sculpture অর্থাৎ উপাদান কাটিয়া যে রূপের সৃষ্টি। এসব তো শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে একেবারে গোড়ার কথা।

বাংলাদেশের মন্দিরে পোড়ামাটির যে সজ্জা দেখা যায় তাহার আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রে এক নহে। ইহার কিছু ছাঁচে গড়া, আর কিছু কাটিয়া বাহির করা, অর্থাৎ সত্যকারের ভাস্কর্য। ফলকগুলি খুঁটাইয়া পরীক্ষা করিলে এই দ্বিবিধ আঙ্গিক যে একই সঙ্গে অনুসৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় মন্দিরে শিল্পের উচ্চমান বজায় আছে।...কিন্তু দেখা যায় ধীরে ধীরে প্রাণস্পন্দন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। হয়ত কালের অমোঘ নিয়মে শিল্পীগণ পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে নূতন সৃজনক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছিল। অলঙ্করণের প্রাচুর্যের দ্বারা সৃজনক্ষমতার দৈন্য পূরণ করিবার চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই আসে।" এই কথাগুলি বলিবার একটু আগেই লেখক বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের মন্দির অলঙ্করণে "শিল্প সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের আভাস সর্বত্র প্রকট। প্রাচুর্য অনেক সময় সূক্ষ্ম অনুভূতিকে পীড়া দেয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা চলে প্রাচুর্যের মাধ্যমেই সৌন্দর্যের প্রকাশ।" সপ্তদশ শতকে প্রাচুর্যের মাধমে সৌন্দর্য প্রকাশ পাইত আর অষ্টাদশ শতকে তাহার ব্যবহার শুধুমাত্র সৃজনক্ষমতার দৈন্য পূরণে, এরূপ ঘটনা ঘটিতে হয়তো পারে, কিন্তু এতবড় একটা পরিবর্তনের পটভূমি কি এবং একই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে বিপরীত ভাবের বাহক হইয়া উঠিল তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন ছিল। পটভূমি বিশ্লেষণ না করিয়া এইরূপ দুইটি উক্তি করিলে তাহা পরস্পর বিরোধী ও অর্থহীন হইয়া ওঠে।

পোড়ামাটির অলঙ্করণ শিল্পের অবনতি ও বিলুপ্তি প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন—"১১৭৬ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক জেলায় শিল্পীগোষ্ঠী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাও বিচারের বিষয়। ইহার পর কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের রুচি অনুযায়ী ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রভাবে দেশীয় শিল্প তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল।...উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলার এই পর্যায়ের মন্দির-টেরাকোটা শিল্প প্রায় অবলুপ্ত।" প্রথমে দুর্ভিক্ষের প্রভাবজনিত কারণের কথায় আসি। *Man In India* পত্রিকার XXXXVIII ও July-September, 1968 সংখ্যায় ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে দুর্ভিক্ষের প্রভাব শিল্পীদের উপর বিপর্যয়কর হইয়া উঠিয়াছিল এমন নহে। দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত হইয়াছিল ভূমিনির্ভর জমিদার ও কৃষকসম্প্রদায়। শিল্পদ্রব্য উৎপাদক (যেমন তাঁতি) ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের ফলে জমিদারগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে শূন্যতা পূরণ হইয়া গিয়াছিল শিল্পদ্রব্য-উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণের উদ্যোগে।

কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের রুচি অনুযায়ী ইওরোপীয় শিল্পকলার প্রভাবে

দেশীয় শিল্প তাহার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতেছিল এইরূপ বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই, লেখক নিজেও দেখান নাই। তাঁহার অপর উক্তি, উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে মন্দির সজ্জার পোড়ামাটি শিল্প প্রায় অবলুপ্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সজ্জিত মন্দির যথেষ্ট সংখ্যায় নির্মিত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এইরূপ মন্দিরের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিংশ শতকের তৃতীয়পাদ পর্যন্ত যে টেরাকোটার অলঙ্করণ দিয়া মন্দিরের গাত্রসজ্জা করা হইত তাহার প্রমাণ বিদ্যমান।

উপরে যে সমস্ত কথা বলিলাম তাহা ছাড়া সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তির দৃষ্টান্ত প্রচুর। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব প্রবন্ধটির প্রথম অংশের কথা। ঐতিহাসিক আলোচনায় পটভূমি বিশ্লেষণের জন্য, আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় সীমার পূর্ববর্তী ইতিহাস বলিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের সহিত আলোচ্য বিষয়বস্তুর যোগাযোগ কোথায় এবং পার্থক্য কি এবং কেন, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া দেখাইলে পটভূমিও সৃষ্টি হয় না—পূর্ববর্তী ঘটনার বিবরণ নিরর্থক হইয়া ওঠে। এখানে তাহাই হইয়াছে। অতি সাধারণ ও শিথিলভাবে বলা সামান্য দু'একটি কথা ছাড়া পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোন ব্যবহারই লেখক করেন নাই—বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বা দৃষ্টান্তের প্রশ্নে—কোথাও নহে।

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব যে ক্ষেত্রে এত অধিক, সেক্ষেত্রে লেখক যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেগুলি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। রচনাটি শিল্পের ইতিহাসরূপে লিখিত, সুতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রশ্নটি এখানে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অভাবে রচনাটির তথ্যগত দিকটিতে সর্বদাই গুরুতর ত্রুটি এবং বিচ্ছিন্নতা দোষ থাকিয়া গিয়াছে। এইরূপ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা যে যথার্থ হইবে না ইহাই স্বাভাবিক। দু'একটি ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য অংশত সত্য, যেমন, সপ্তদশ শতকে পোড়ামাটি শিল্পের শৈলীভেদ। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়া মনে হয় ঐ সব কথা নিতান্ত আকস্মিকভাবে সত্য ঘটনার কাছাকাছি চলিয়া গিয়াছে—পর্যালোচনা, চিন্তা বা গবেষণার ফলস্বরূপ নহে।

প্রকাশক সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

মুদ্রক জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মলাট ও ছবি মুদ্রক
রাধারাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮ নীরোদবিহারী মল্লিক রোড,
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫-৮৩২৩